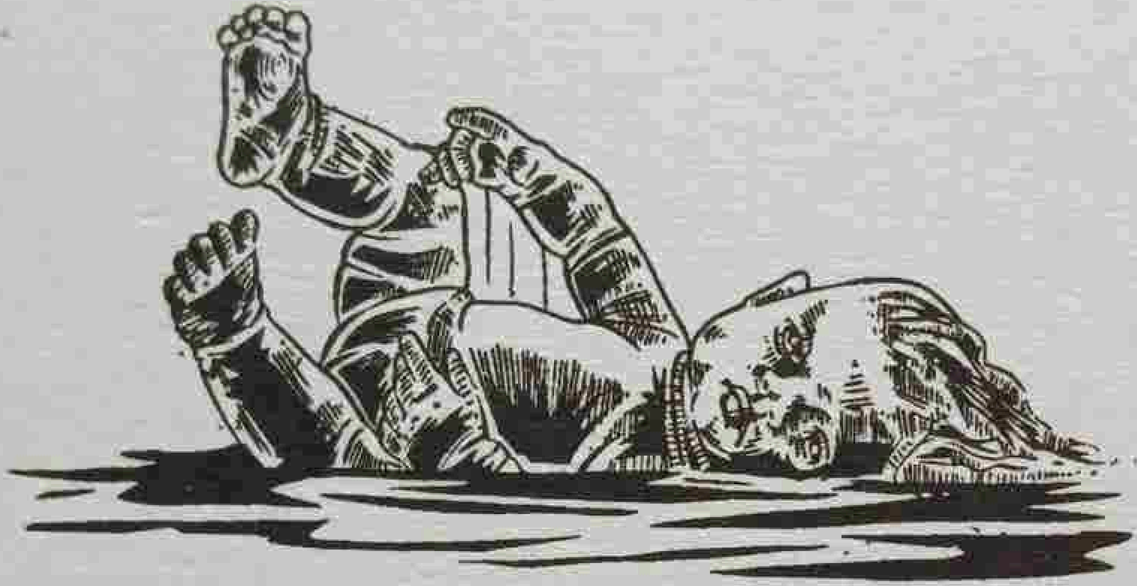
নয়টি রক্তাক্ত রবিবার



সায়ক আমান



নয়টি রক্তাক্ত রবিবার



নয়টি রক্তাক্ত রবিবার

সায়ক আমান



NOITI RAKTAKTA RABIBAR
by Sayak Aman
Published by Biva Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Roypara, Hatiara, Kolkata 700157
Phone : 9434343446
e-mail : biva.publications@gmail.com
follow us : facebook.com/BivaPublication
Website : www.bivapublication.com
Rs. 222.00

ISBN: 978-81-946323-3-7

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০, আষাঢ় ১৪২৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : অভিব্রত সরকার

২২২ টাকা

প্রকাশক: বিভা পাবলিকেশন

পরিবেশক
ভারতী বুক স্টল,
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

দে বুক স্টোর (দীপু দা),
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেখকের কথা

বিকেলে পাড়ার মাঠে ক্রিকেট খেলতাম সেই ছোট থেকে। কোনওদিন খেলা না হলে সারা সন্ধে মন খারাপ হয়ে থাকত। ইলেভেনে ওঠার পর থেকে কোনও এক অজানা ডাক-পিয়ন এসে জানিয়ে যেত, আস্তে আস্তে খেলার বয়স চলে যাচ্ছে। ছেলেবেলার বন্ধুরা এবার হারাতে থাকবে এক এক করে।

জুন মাসের সেই বিকেলেও কী যেন কারণে খেলা হয়নি। আমি মন খারাপ করে বসে আছি জানলার পাশে। রেডিয়োটা নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলাম, 'এখন রেডিয়োতে বই পড়ার মজা...'

সেই লোকটার গলায় কী যেন ছিল, 'বই'-এর অদৃশ্য ও-কারের টানটা চোখের সামনে একটা মোটাসোটা হার্ডবাউন্ড গল্পের বই এনে দিল আর 'পড়া'র বলিষ্ঠ ড-এ শূন্য র-এর উচ্চারণ কী এক ম্যাজিকে থামিয়ে দিল আমায়। আমাদের কাছে হগোয়ার্ডের চিঠি আসেনি, ওয়ার্ড্রোব খুলে কেবল জামাকাপড়ই পেয়েছি, সাদা পেঁচা তো চোখেই দেখিনি, কিন্তু জুন মাসের সেই বিকেলে মন খারাপ নিয়ে প্রথমবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমাদের King's Cross Station Platform /¾ -এ — 'সানডে সাসপেন্স'।

তারপর কত কী ঘটে গেল জীবনে। কৈশোর হারানোর যন্ত্রণা, ফেলে আসা স্কুলের স্মৃতি, পড়াশোনা, কেরিয়ার, চাকরি, প্রেম... সব কিছু ছাপিয়ে আজ দশবছর ধরে একটানা সেই এক শব্দবন্ধ আমাদের ঘ্যানঘ্যানে জীবন থেকে, ডিপ্রেশন থেকে, একাকীত্ব থেকে, কয়েক পলকের জন্য উধাও করে দিয়েছে, — বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন...

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার লেখা গল্প প্রথম পড়ে শোনানো হয় সানডে সাসপেন্স-এ। সেদিনটা ঠিক কেমন কেটেছিল তা বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা, তবে সেদিন থেকেই আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যে কোনও স্বপ্ন দেখার ছাড়পত্র নিয়েই জন্মায়।

আপাতত আমার মোট ন'টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে সানডে সাসপেন্স-এ। এর মধ্যে আটখানা গল্প দীপদা তাড়া (আর সামান্য একটু গালিগালাজ) না দিলে লেখা হত না। তবে শুধু গল্প লেখা না, এই লোকটার কাছে যে নানাভাবে আমি কতটা কৃতজ্ঞ তা লিখে বোঝাতে আর একটা বইয়ের অবতারণা করতে হবে।

এই গল্পগুলো আপনি নিশ্চয়ই আগে শুনেছেন। তবে ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে রাখতে চাইলে এই বইখানাই ভরসা। তাছাড়া আমার শোনা সেই প্রথম দিনের বাক্যটাকে উলটে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ আছে এই বইতে — 'এখন বইতে রেডিয়ো শোনার মজা...'

সায়ক আমান

কলকাতা

সূচিপত্র



রাত তিনটের পর



হাত বাড়িয়ে রেডিয়োটা বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলাম। বিছানার পাশে রাখা

হাত ঘড়িটায় রাত ঠিক তিনটে বাজে। একটু আগেই ঝড় হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি পড়েছে কি না জানি না। মাথার কাছের জানলাটায় আম গাছের ছায়াটা দুলে উঠছে বারবার। খানিকটা দূরে একটা কুকুর কয়েকবার ডেকে চুপ করে গেল। অন্যদিন হলে এসব ভাবনা মাথাতেই আসত না। আমার ছোট থেকেই রাত বারোটার আগে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস। মাঝে মাঝে দু-একটা দিন ছাড়া সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি বললেই চলে। অথচ দিন-তিনেক হল কিছুতেই আমার ঘুম আসছে না। প্রথমদিন ঘুম হয়নি বলে একটা ঘুমের ওষুধও খেয়েছিলাম। তাতে কোনও কাজ হয়নি। আজ ওষুধের মাত্রাটা বেশি হয়েছে। আশা করেছিলাম তাতে কাজ দেবে, তবুও এই রাত তিনটে পর্যন্ত আমি দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

আমার শরীর খারাপ নেই একেবারেই। এই ক-দিনে সেরকম পরিশ্রমও করিনি, শুধু রাতে শুতে এলেই এই সমস্যা। ঘুম আসছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাতে আমার সেরকম অসুবিধাও হচ্ছে না। রাতে ঘুম না হলে যেরকম চোখ লাল বা মাথা ব্যথা হওয়ার কথা তার বিন্দুমাত্র লক্ষণও নেই। এই ক-দিনে কীরকম যেন পরিবর্তন হয়েছে আমার। একা থাকার জন্য কি না জানি না, চারপাশ সম্পর্কে আমার ইন্দ্রিয়গুলো বেশি সজাগ হয়ে পড়েছে।

একা অবশ্য আমি আগে থাকিনি, তা নয়। আগের বছর বসন্ত উৎসবের সময় সুপর্ণা শান্তিনিকেতন চলে যাওয়ায় আমি একাই ছিলাম। তখন দিব্যি কেটেছে, দিনে অফিস, রাতে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে লম্বা ঘুম। দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যেত খেয়ালই হত না। এবার কিন্তু তেমন হচ্ছে না।

দিন কতক হল আমার চিকেন পক্স হয়েছে। এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি তবু বুকে পিঠে মিলিয়ে প্রায় গোটা তিরিশেক ফোঁড়া ইতিমধ্যে গজিয়েছে। সুপর্ণার এর আগে পক্স হয়নি, তাই রোগটা শরীরে ঢুকেছে বুঝেই আমি তাকে একরকম জোর করেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রথমটা গাঁই-গুঁই করলেও পরে গায়ে ফোঁড়া বেরোনোর ভয়ে কি না জানি না, সে যেতে রাজি হয়েছে। তারপর থেকে আমি একা, তার সঙ্গে এই অনিদ্রা।

এ তো আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল! চিরকাল আমি একটু ঘুমকাতুরে, তিন দিন না ঘুমিয়ে কী করে যে সুস্থ আছি সেটাই আশ্চর্যের। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘুম যখন হবে না, তখন ঘরের আলোটা জ্বালানো যাক। আমাদের ঘরটা ছোটখাটো, আসবাবপত্র সেরকম কিছু নেই। দুটো মানুষের দিন চলে যাওয়ার মতো যতটা দরকার, তার বেশি কিছু নেই। চেয়ার-টেবিল ছাড়া আছে একটা আলমারি, একটা দেরাজ, একটা বিছানা আর একটা পুরোনো স্টিলের বাক্স— লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, চওড়ায় ফুট দুয়েক।

বিয়ের আগে সুপর্ণার বাবার কলকাতায় একটা শাড়ির দোকান ছিল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর সে দোকানটি বেচে দিয়ে তিনি বিধবা বোনের কাছে চলে যান। তো এই দোকানের অবশিষ্ট শাড়ি আর গয়নাগাটি তিনি জমা রেখে যান সুপর্ণার কাছে। সেগুলো জমা না দান তা আমি বলতে পারি না। মোটকথা সেগুলোর স্থান হয়েছে ওই প্রমাণ সাইজের বাক্সের ভিতরে। ভিতরে কিছু গয়নাগাটি ও শাড়ি আছে বলে চাবি সুপর্ণা যখের ধনের মতো আগলে রাখে, কখনও কাছ-ছাড়া করে না। এই ক-বছরে ওর ভিতরে চোখ দেবার সুযোগ আমার হয়েছে প্রায় বার দশেক।

যাই হোক, ও-ছাড়া ঘরে আর আসবাব নেই বললেই চলে। কলসি থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে একটু গলায় ঢাললাম। খানিকটা মাথাতেও দিলাম। অস্বস্তিটা কমল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। একটু ছাদে গেলে হয়, ঘরের ভিতরটা কেমন যেন গুমোট হয়ে রয়েছে। জানলাগুলো খুলে দেওয়া যায়, কিন্তু খোলা জানলার দিকে বারবার চোখ চলে যায় আমার। মনে হয়, এই বুঝি কেউ এসে দাঁড়াবে। সত্যি বলতে কী এই ভূতের ভয়টা আমার এখনও এই বয়সে পৌঁছেও যায়নি।

টেপ রেকর্ডারটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে এলাম। চারপাশ জমাট অন্ধকারে ভরে আছে। আকাশে একদম বুড়ো আঙুলের নখের মতো চাঁদ উঠেছে। হালকা মায়াবি আলোয় ঢেকে আছে চারপাশটা। ফিনফিনে ঠান্ডা একটা হাওয়া দিচ্ছে। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। টেপটা পাঁচিলের উপরে রেখে চালিয়ে দিলাম। শীতের হাওয়ায় গাছে গাছে ঘষা লেগে ঝর্‌ঝর্‌ করে

একটা আওয়াজ হচ্ছে। তার সঙ্গে রুপোলি জ্যোৎস্না। মনে হল, ঘুম না-এসে ভালোই হয়েছে। এমন একটা মায়াবি রাত ঘুমিয়ে কাটানো অর্থহীন। গান শোনার একটা বাতিক থাকলেও আমার নিজের গানের গলাটা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। ছোটবেলায় গানের ইস্কুলে কী এক বেয়াদবি করেছিলাম বলে মাস্টার গোপীবাবু বেত্রাঘাত সমেত বিতারণ করেছিলেন। তারপর থেকে এখন অবধি শুধু শোনা নিয়েই আছি। কারও সামনে গাইবার সাহস হয়নি। এখানে অবশ্য কেউ নেই, চারপাশের বাড়িগুলোও অন্ধকার জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে গাইলে কেউ শুনতে পাবে না কিন্তু তা-ও গান গাইবার ভরসা পেলাম না। গানের গুঁতোয় ক-টা ভূত এসে যদি উপস্থিত হয়! হঠাৎ মনে হল এক কাজ করলে কেমন হয়? টেপ রেকর্ডারটা যখন সঙ্গেই এনেছি, তখন কবিতা রেকর্ড করলে কেমন হয়? তার তো আর বেসুরো হবার জো নেই। খাসা আইডিয়া। একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট ঢুকিয়ে রেকর্ডিয়ের বাটানটা টিপে দিলাম।

আমার কবিতা শেষ হওার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ঠিক নীচ থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল। সেটাও বোধহয় রেকর্ড হয়েছে, যা-ই হোক ক্যাসেটটা আবার ব্যাক রিল করে চালিয়ে দিলাম। আমার দুর্ভাগ্য সেটা থেকে কবিতা দূরে থাক শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরল না। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিলাম। কালই সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। নামি কোম্পানির জিনিস হলেও বেশিদিন চলে না। ধুর... মনটা খিঁচড়ে গেল। আবার নীচে নেমে যাব কি না ভাবছি এমন সময় মনে হল, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে দুমদুম করে যেন আওয়াজ আসছে। কেউ যেন খালি ছাদের উপর লোহার হাতুড়ি পিটছে।

আওয়াজটা সন্দেহজনক। কয়েকদিন হল এ পাড়ায় চোরের উপদ্রব হয়েছে। জানলা দিয়ে হাতের সামনে কিছু পেলেই তুলে নিচ্ছে। তবে এমন অদ্ভুত শব্দ করে কেউ চুরি করবে বলে মনে হয় না। আমার একটু কৌতূহল হল। আওয়াজটা ছাদ থেকে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরো ছাদটাই তো আমি হালকা চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, কোথাও কেউ নেই। অন্তত এমন বিকট আওয়াজ করার মতো কেউ নেই। ভাবলাম, একবার নিজেই

গিয়ে দেখা যাক। চুরি ছাড়া অন্য অপরাধ হতে বাধা কোথায়?

আমাদের ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ছাদটা বেশি দূরে নয়। মোটামুটি মিটার খানেকের দূরত্ব। আমি পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে কার্নিশের উপরে নামলাম। ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। রাত-বিরেতে নানারকম শব্দ হতেই পারে, তা ছাড়া নিজের বাড়ির ছাদ হলেও কথা ছিল, আমাকেই আবার কেউ চোর না ভেবে বসে। ভেবে দেখলাম নীচে গিয়েও আমার করার কিছু নেই। ঘুম তো আসবে না, অগত্যা বিছানার উপর পড়ে থেকে একঘেয়েমি লেগে যাবে। তার থেকে এইরকম অ্যাডভেঞ্চার ভালো। সামনের দিকে তাকিয়ে অবশ্য একটু দমে গেলাম। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ির কার্নিশে যেতে হলে বেশ বড়সড়ো একটা লাফ দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা সেটা না। লাফানোর জন্য আমার শরীরে যে মোমেন্টাম তৈরি হবে, তাতে দেওয়ালে একটা ছোটখাটো ধাক্কা খাব। ভারটা যদি কার্নিশের ওপরে না-রাখতে পারি তাহলে সোজা নীচে এসে পড়ব। দোতলা থেকে পড়ে হয়তো বেশি চোট লাগবে না, কিন্তু তাতে লোক জেগে যাবার ভয় আছে। সাত-পাঁচ না-ভেবে আমি লাফানোই ঠিক করলাম। পকেটে ঘরের চাবিটা আছে, পড়ে গেলে আবার সামনে দিয়ে এসে ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হবে না।

মনে মনে ইষ্টনাম জপ করে আমি লাফ মারলাম। যেটা ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক সেইটাই হল। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে আমার শরীরটা বেশ খানিকটা পিছিয়ে এল। দেওয়ালের ঠিক গায়েই বেরিয়ে ছিল একটা লোহার রড। সেটা ধরে অর্ধেক ঝুলে রইলাম। আমার একটা পা কার্নিশে, একটা হাওয়ায়। আমি আর একটা হাত দিয়ে রডটা চেপে ধরলাম। বাঁ পা-টা এমনভাবে ঝুলছে যে সেটাকে উপরে নিয়ে আসা এক কথায় অসম্ভব। অথচ সেটা না-করতে পারলেও চলবে না। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আধঝোলা হয়ে থাকতে থাকতে ল্যাম্প পোস্টের আলোটা আমার চোখে পড়ল। হলুদ উজ্জ্বল আলো। এতক্ষণে অন্ধকারটা চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তীব্র আলোটা চোখে পড়তেই আমার মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। আমি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কার্নিশে যে পাশে আমি ঝুলে আছি তার

কাছেই একটা বক্স জানলা। মনে হয়, দোতলার ভাড়াটেদের। কার্নিশ থেকে ডান পা-টাও আমি নীচে নামিয়ে নিলাম। দু-হাতে রড ধরে কয়েকবার দোল খেয়ে নিতেই জানালাটা হাতের কাছে চলে এল। আমি একটা হাত দিয়ে জানলার গ্রিলটা ধরলাম। রীতিমতো অভিজ্ঞ চোরের ন্যায় যখন পাশের বাড়ির ছাদে এসে পৌঁছোলাম তখন আমার শরীরে নানা জায়গায় কাটা-ছড়ার দাগ। ছাদে পা রেখে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। এদিক-ওদিক তাকাতে চোখ পড়ল ছাদের উলটো দিকের কোণায় কী যেন একটা সাদা মতো জিনিস পড়ে আছে। আমি সেদিকে এগিয়ে যেতেই সেটা হঠাৎ এক লাফে জীবন্ত হয়ে উঠে আমার দিকে সরে এল। একটা মোটা বিড়াল। আরাম করে ছাদে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমাকে দেখে খুব-একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। দু-বার রাগে ফোঁসফোঁস করে অন্যদিকে সরে পড়ল। কিন্তু আওয়াজটা আসছিল কোথা থেকে? এখনই বা আসছে না কেন? ছাদের লাগোয়া একটা ঘর আছে। দোতলা থেকে উঠেই সেটা ডান দিকে পড়ে। যতদূর জানি সেখানে কেউ থাকে না। আগে এক বুড়ো ভাড়াটে থাকত, গত মাসে তিনি রক্তবমি করে মারা যাবার পর থেকে ঘরটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ওখান থেকেই কি আসছিল আওয়াজটা? ঘরের জানলা খোলা ছিল, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ভিতরটা কুপকুপে অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গ্রিলটা ধরে আমি মুখটা কাছে নিয়ে গেলাম। ভালো করে কান পেতে শুনতে পেলাম ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে, যেটাকে দাঁত দিয়ে কোনও শক্ত খাবার ছেঁড়ার আওয়াজ বলা যেতে পারে। তবে এত জোরে শব্দ করে কোনও মানুষ খায় বলে তো আমার জানা ছিল না। শব্দটা বোঝার উপায় নেই, কী আশ্চর্য! এত জোরে শব্দ হচ্ছে অথচ বাড়ির কারও ঘুম ভাঙার নাম নেই, কি ঘুম রে বাবা!

আমি জানলার কাছ থেকে সরে এলাম। বেড়ালটা ছাদ পেরিয়ে কোথায় গেল কে জানে। আমি এসে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে। ক-টা বাজে জানি না। সাড়ে তিনটে তো নিশ্চয়ই বেজেছে। ভাবলাম, এবার ঘরে ফিরে যাই। আর ব্যাপারটা মাথায় আসতেই আমার হাসি পেল।

এই গভীর রাতে আমি নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের ছাদে লাফিয়ে জানালার ভিতর উঁকি দিচ্ছি, কেউ দেখতে পেলে নিশ্চয়ই চোর ভাবত। নাহ, নিজের পাগলামিতে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ক-দিন থেকেই মনে হচ্ছে আমার নার্ভগুলো হঠাৎ বেশি সজাগ হয়ে পড়েছে। সে জন্যই বোধহয় রাতে ঘুম হয় না। এর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। কালই... আমার যে চিকেন পক্স হয়ছে সেটা এখনি বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই তবুও রাস্তায় বেরোতে আমার ইচ্ছা করে না। ফোন করে বাড়িতে ডেকে নেওয়াই ভালো। এরকম না-ঘুমিয়ে অন্যের বাড়িতে উঁকি দিয়ে আর কতদিন চালাব? দেখতে দেখতে একেবারে চোর না হয়ে যাই। আমি জানলাটা ছেড়ে সবে পাঁচিলের দিকে সরে আসতে যাচ্ছি, এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, — "কে? কে ওখানে?"

এই সেরেছে! ঘরে বোধহয় লোক ছিল। আমার হাত লেগে জানলায় একটু শব্দ হয়েছে, আর তাতেই জেগে উঠেছে লোকটা। গলা শুনে অবশ্য চেনা কেউ বলে মনে হল না। এখন কী করা যায়? ধরতে পারলে নিশ্চয়ই চোর ভাববে। দৌড়ে পালানোর উপায় নেই। পাঁচিল থেকে কার্নিশটা অনেকটা নীচে। ধীরে-সুস্থে নামতে হবে। অতএব লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে আসলে ছাদেই কোথাও গা আড়াল করা ছাড়া উপায় নেই। কোথায় লুকোই? সেরকম কোনও জায়গাও তো নেই। দরজায় খশ্‌খশ্‌ শব্দ শুনেই বুঝেছি, লোকটা ছিটকানি খুলছে। হঠাৎ মনে পড়ল, ছাদের ঘরটার পিছনের দিকে একটা ছোট খুপরি আছে। একটা মানুষের ঢুকে দাঁড়ানোর মতো জায়গা। দিনেরবেলা হলে সেখানে লুকানোর কথা ভাবতেও পারতাম না, কিন্তু রাতের অন্ধকার এখনও কাটেনি এবং চাঁদটাও আকাশের এদিকে নেই তাই খুপরিটার ভিতরের দিকে ঢুকে দাঁড়ালে লোকটার খেয়াল না করার একটা আশা আছে। ব্যাপারটা নিজের পছন্দ না-হলেও আর কোনও উপায় নেই দেখে তা-ই করলাম। বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। লোকটা আমাকে দেখতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে। শুধু আজকের নয়, এ পাড়ায় ইদানিং যত চুরি হয়ছে তার সব দায় আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। সুপর্ণা ফিরলে তাকেই বা কী করে

বোঝাব যে মাঝরাতে কীসের তাড়নায় পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্যের ছাদে ঘোরাঘুরি করছিলাম!

আমার নাকে একটা বিশ্রী গন্ধ এল। খুব ক্ষীণ, তবু কেমন যেন চেনা লাগল গন্ধটা। এদিকে লোকটা ছাদের চারপাশটা ঘুরে দেখছে। সিমেন্টের মেঝের ওপরে খশ্‌খশ্‌ পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ... এবার আস্তে আস্তে বাড়ছে। মানে সে এদিকেই আসছে। আমি নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম। আর একটু ভিতরে ঘেঁষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু জায়গা নেই। খুপরিটা এতটাই ছোট যে আমার একটা হাত আড়াআড়ি বেরিয়ে আছে। লোকটা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আমার দুটো হাঁটু কাঁপছে। কোনওরকমে পিছনের দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছি। সে কিন্তু এখনও দেখতে পায়নি আমাকে। ভাগ্যিস হাতে টর্চ নেই, এই অন্ধকারের চাদরটাই আমার একমাত্র সম্বল।

— "নাহ, এ পাড়াটা চোরের আখড়া হয়ে উঠেছে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

নীচুস্বরে বিড়বিড় করতে করতে লোকটা ফিরে গেল। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর সারল। ওফফ...! এমন বদনামের ভয় জীবনে পাইনি। খুব শিক্ষা হয়েছে, এবার থেকে পাশের বাড়িতে বোম পড়লেও বাইরে বেরব না। পা টিপে টিপে খুপরি থেকে বেরিয়ে এলাম। টেনশনটা কেটে যেতে খেয়াল করলাম, গন্ধটা আগের থেকে বেড়েছে। খানিকটা দূর থেকে আসছে তাই বোধহয় তীব্রতাটা একটু কম। কোথাও ইঁদুর মরল নাকি? আমি আবার কার্নিশ ডিঙিয়ে এদিকে ছাদে চলে এলাম। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। নিজের ছাদ, যত খুশি ঘুরি না-কেন কেউ কিচ্ছু বলার নেই। কিন্তু আমার আর বেশিক্ষণ ওপরে থাকতে ইচ্ছা করল না। টেপ রেকর্ডারটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। গন্ধটা কিন্তু ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এখনি সেটার উৎস খুঁজে বের করতে না-পারলে ঘুম কেন, কাল সারাদিন বাড়িতে টিকতেই পারব না।

ঘরের চারপাশটা খুঁজে দেখলাম। নাহ, কোথাও কিচ্ছু নেই। হঠাৎ একটা ব্যাপার চোখে পড়তেই আমার গলার কাছটা শুকিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। ছাদে

যাওয়ার সময় ঘরে হাওয়া ঢুকবে বলে জানলার একটা পাল্লা খুলে রেখেছিলাম। এখন সেটা বন্ধ। শুধু বন্ধই নয়। রীতিমতো ছিটকানি দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করা। কে বন্ধ করল? ঘরে তো কেউ ছিল না। বাইরে থেকে কারোর ঢোকা সম্ভব নয়। একমাত্র যদি না কেউ ছাদ দিয়ে ঢুকে থাকে, কিন্তু তাই বা কী করে... ব্যাপারটা মনে হতেই আমার ভয়টা আরও বেড়ে গেল। আমি পাশের বাড়ির ছাদে ছিলাম সেই সময়ে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে এবং যদি ঢুকে থাকে তাহলে সে এখনও বেরিয়েছে কি না আমি জানি না। যদি চোর হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। কারণ আমার ঘরে মহামূল্য তেমন কিছু নেই। ওই বাক্সের ভিতরে গয়নাগুলো ছাড়া। কিন্তু সেটার চাবিও তো আমার কাছে নেই। সুপর্ণার ব্যাগেই থাকে সেটা। আমি লাইট জ্বালালাম না। চোর অস্ত্রধারী কি না আমি জানি না। অতএব সম্মুখ-সমরে গিয়ে আমার লাভ নেই। আগের মতোই বিছানার ওপর শুয়ে গভীর ঘুমের ভান করলাম।

হঠাৎ একটা চেনা গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম। সুপর্ণা! এত রাতে সে পাশের ঘরে কী করছে? তার তো এখানে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া সে যদি এখানে আসেই, আমাকে জানাবে না কেন। মাঝ রাতে ছাদ ডিঙিয়ে... ধুর, আমার মনের ভুল। একটু পরেই বুঝলাম আমার মনের ভুল নয়। সে ধীরে ধীরে এই ঘরে এসে ঢুকল। একটা কালো শাড়িতে গোটা শরীরটা ঢাকা। আঁচলটা মাথার পিছন দিয়ে ঘোরানো। যাতে দরকার পড়লেই সেটা দিয়ে মুখ ঢাকা যায়। আমি উঠলাম না। কেমন যেন খটকা লাগছে আমার। কী একটা ব্যাপার যেন আমি ভুলে যাচ্ছি। সব কিছুই আমার জানা অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না। সুপর্ণা কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে বাক্সের চাবি বের করছে। আমার এই অবস্থাতেও হাসি পেল। নিজের জিনিস নিজেই রাত দুপুরে এসেছে চুরি করতে। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হতেই আমার হৃদপিণ্ডটা প্রায় আধ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। মনে পড়েছে, খুব অস্পষ্ট ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবির মতো কয়েকটা দৃশ্য, না দৃশ্য নয়-অনুভূতি। দৃশ্যগুলো সব আমার কল্পনা। আমি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে উঠে পড়লাম। এক-পা এক-পা করে হেঁটে চলে এলাম পাশের ঘরে। সুপর্ণা

এখনও বাক্স খোলায় মশগুল। আমি ঘরের টেবিলের উপর টেপটা রেখে অন করলাম। তারপর যে ব্ল্যাংক ক্যাসেটটায় একটু আগে কবিতা রেকর্ড করেছিলাম সেটা ঢুকিয়ে প্লে-বাটনটা টিপে দিলাম। আবার আগের মতোই শোঁ-শোঁ শব্দ। কিচ্ছু রেকর্ড হয়নি। কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি অপেক্ষা করে আছি শেষটার জন্য। শব্দটা কিছুক্ষণ চলার পর অদ্ভুতভাবে খারাপ হয়ে-যাওয়া টেপ রেকর্ডারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সেই কুকুরের ডাকটা। তার মানে? সব রেকর্ড হয়েছে, হয়নি খালি আমার গলাটা। কেন?

আমি আর অবাক হলাম না। চলে এলাম পাশের ঘরে। এতক্ষণে বাক্সটা খুলে ফেলেছে সুপর্ণা। আমার অনিদ্রা, আমার নার্ভগুলোর অতিসক্রিয়তা, আমার অন্ধকারে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা, আমার গলা রেকর্ড না হওয়া – সব প্রশ্নের উত্তর ওই বাক্সটার ভিতরে। ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটা সরিয়ে ফেলল সুপর্ণা। শাড়ি নয়, গয়না নয়, ওর ভিতরে হাত-পা মোড়া অবস্থায় একটু কুঁকড়ে শুয়ে আছে একটা লাশ, আমার লাশ। তিন দিনের বাসি মরা। পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। স্থানে স্থানে পচন ধরা শুরু হয়েছে। সে গন্ধ অবশ্য অন্য কারও পাওয়ার কথা নয়, অন্তত দু-এক দিনের মধ্যে নয়। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা কালো কাপড়ে মৃতদেহটাকে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে সাবধানে ঘরের চাবিটা খুলছে সুপর্ণা। আমি কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না, সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে আমি এক দৌড়ে ছাদে চলে এলাম, কালো কাপড়ে জড়ানো দেহটাকে একটা গাড়ির পিছনে তুলল সে। আমি ছাদের পাঁচিল ধরে একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার চিন্তাভাবনাগুলো ছোট হয়ে আসতে লাগল। আমার গলন্ত মনের কোনও এক গহ্বর থেকে অদ্ভুত আঁধার এসে গ্রাস করছে আমাকে, নিয়ে যাচ্ছে অন্তহীন সময়ে...



উইন্ডচাইম



সারাদিন সাইট সিয়িং-এর পর বাড়ি ফিরে ক্লান্তিতে দু-জনেরই চোখ আর খোলা থাকতে চাইছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত দুটো নাগাদ অলকার খোঁচাখুঁচিতে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। হলটা কী মেয়েটার? এইমাত্র তো ঘুমোল।

— "কী ব্যাপার? ঘুম আসছে না?"

— "আমি ঘুমোইনি।"

অলকার গলায় ক্লান্তির ছাপ। যেন চেষ্টা করেও ঘুম আসেনি তার। আমি পরের প্রশ্ন করার আগে সে নিজে থেকেই উত্তর দিল, "কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে, ওই উইন্ডচাইমটা..."

কটেজে এসে থেকেই উইন্ডচাইমটার শব্দ কানে আসছে আমার। সকালের দিকে একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন চোখেও পড়েছিল জিনিসটা। টুং টুং করে হাওয়ার দোলায় বেজে চলেছে। শুনতে মন্দ লাগে না। রাতে শুতে যাওয়ার সময়ও বারান্দা থেকে টুং টুং ভেসে আসছিল। ঘুমের ঘোরেও বোধহয় কানে ভাসছিল আওয়াজটা। খেয়াল করতে এখনও শুনতে পেলাম।

— "ওটা আবার কী করল? বেশ তো বাজছে।"

— "শুধু বাজছে না... একটু খেয়াল করো..."

অলকার বয়স ছাব্বিশ পেরিয়েছে। তবে এই বয়সে পৌঁছেও ছেলেমানুষির ভূত তার ঘাড় থেকে নামেনি। আমি শুনলাম না, তবে শোনার ভান করে বললাম, "কই, আলাদা কিছু তো বুঝছি না।"

কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনতে শুনতে আঙুল দিয়ে কিছু হিসেব করার চেষ্টা করল অলকা, "এলোমেলো আওয়াজ নয়, মনে হচ্ছে, একটা সুরে বাজছে।"

— "সুর! উইন্ডচাইম হাওয়ার ঠেলায় বাজে। সুর-টুর থাকে না তাতে।"

— "তুমি সত্যি বুঝতে পারছ না?"

অলকার মুখের দিকে দেখে একটু মায়া লাগল আমার। বাইরে জঙ্গলের ভিতর থেকে ঝিঁঝি আর পোকামাকড়ের ডাক ভেসে আসছে একটানা। থেকে থেকে একটা প্যাঁচা আর তাকে সঙ্গ দিয়ে একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠছে। তার সঙ্গে মিহি পিয়ানোর মতো বেজে চলেছে উইন্ডচাইম—টুং-টাং-টুং...

ভালো করে শুনতে একটু ধাঁধায় পড়লাম আমি। যে আওয়াজটা আসছে, সেটাকে সুর বলে ভেবেই নেওয়া যায়, কিন্তু তাতে মনের ভুল হওয়ার একটা বড়োসড়ো সম্ভাবনা থেকে যায়। একবার সুরটা বাজার পর সেটা রিপিট হওয়ার এক বিট আগে এসেই হারিয়ে যাচ্ছে ছন্দ।

এমনিতেই ঘুমটা জাঁকিয়ে বসেছে, অত মাথা ঘামাতে আর মন চাইল না, অলকার মাথায় একটা হাত রেখে বললাম, "তো সুরই যদি বাজে তো বাজুক না, সাইরেন যখন নয় তো ঘুমিয়ে পড়ো।"

— "কিন্তু সুর কী করে বাজবে?" তার মুখ থেকে অসন্তোষ যায় না।

— "আমার কিন্তু ভারী ঘুম পাচ্ছে।" আমি হাই তুললাম।

— "একবার গিয়ে দেখে আসবে?" দ্বিধা কাটিয়ে বলল অলকা। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বুঝলাম, যতক্ষণ না ব্যাপারটা মিটছে, ততক্ষণ আমাকে ঘুমোতে দেবে না সে। বিছানা থেকে নামতে নামতে তা-ও বিরক্তিটা হিসেব করে খরচ করলাম, "উফ... ভীমরতি বটে!"

বেডরুমটা পেরিয়ে ছোটো বসার ঘর। সেটার সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা। বারান্দায় একটা ছোটো হলদে শেডের ল্যাম্প জ্বলে। রাতে নিবিয়ে ঘুমোতে হয়। বসার ঘরে সুইচবোর্ডটা খুঁজে নিয়ে আলোটা জ্বাললাম। তারপর বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

আমাদের কটেজটা দোতলা। কটেজটাকে ঘিরে একটা মিটার দশেক লম্বা টেরেস করা আছে। সেটা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকেই শুরু জঙ্গলের সীমানা। ঘন গাছের জঙ্গল। রাতবিরেতে সে জঙ্গলের অন্ধকারের ভিতরে চোখ পড়লেই গা-টা ছমছম করে ওঠে। এখন অবশ্য গোটা জঙ্গলটাই অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়েছে। তার ভিতর থেকে জঙ্গুলে হাওয়া ভেসে এসে বসার ঘরের পর্দা উড়িয়ে দিচ্ছে বারবার।

আমি বারান্দার ভিতরে মন দিলাম। লোহার কোমরসমান উঁচু রেলিং থেকে ফুট দুয়েক উপরে দুলছে উইন্ডচাইমটা। একদিকের দেওয়াল থেকে বের হয়ে থাকা একটা কাঠের কঞ্চি থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে।

একই সুরে বেজে চলেছে। টুং-টাং-টুং...

মোট চারটে পাইপ। তার মাঝে একটা বড়ো গোল রিং। ভালো করে একবার দেখালাম জিনিসটাকে। আমাদের কলকাতার বাড়িতেও একসময় উইন্ডচাইম ছিল। এটা কিন্তু বেশ অন্যরকম দেখতে। পাইপগুলোর কয়েকটা জায়গা তোবড়ানো। সুতোগুলোও পলকা। মাঝের রিংটাও কেমন নোংরাটে। এমন সুন্দর কটেজে কি শেষে কারও ফেলে-দেওয়া জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে?

কঞ্চি থেকে খুলে নিলাম চাইমটা। বারান্দার এককোণে একটা জঞ্জাল ফেলার বাক্স রাখা ছিল। আমরা এসে থেকে ব্যবহার করিনি। তার ভিতরে সেটা ফেলে রেখে ভিতরদিকে পা বাড়ালাম।

ফিরে আসতেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় জঙ্গলের দিক থেকে একটা শব্দ শুনে ঘুরে তাকালাম। ঠিক কী যে দেখলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না। একটা ছায়া কি? মনে হল, আকাশছোঁয়া গাছগুলোর ফাঁক থেকে একটা দানবিক ছায়া যেন জঙ্গলের ভিতরের দিকে সরে গেল। খেয়াল করলাম, আমার অজান্তেই পোকামাকড়ের ডাক কখন যেন থেমে গেছে। তার বদলে হালকা বাঁশির সুর ভেসে আসছে দূর থেকে। গ্রামের দিক থেকে নয়, জঙ্গলের প্রান্ত থেকে। কিন্তু তা কী করে হবে?

নাঃ, হয়তো হাওয়ার শব্দ, কিংবা কোনও জঙ্গুলে প্রাণীর ডাক। যা-ই হোক-না কেন, তাতে অলকার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। ফলে আমারও আরামের ঘুম হবে। আলোটা নিবিয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ঘুম ঠিকঠাক হল না। সারাক্ষণ মনে হতে লাগল, বারান্দার দিক থেকে কে যেন ডেকে চলেছে আমাকে। সেই বাঁশির সুরটা বেড়ে উঠছে। বাঁশি বাজাতে বাজাতে জঙ্গলের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে সেই বাঁশিওয়ালা...

(দুই)

— "এই জঙ্গলের ধারের কটেজে রাত কাটানো কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স।" অলকা টোস্টে কামড় বসাতে বসাতে বলল।

আমাদের উলটোদিকেই গীতেশবাবু বসে ছিলেন। ভদ্রলোকের বেশ বড়োসড়ো চেহারা, বাজখাঁই গলার আওয়াজ। এই কটেজটা নাকি তাঁর নিজেরই তৈরি। জঙ্গলের ধারে প্রকৃতির কোলে এমন আরামে থাকার একটা জায়গা তৈরি করে বেশ পয়সা কামাচ্ছেন তা এসে থেকেই বুঝছি। জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামেই নাকি নিজের বাড়ি আছে তাঁর। মাঝে মাঝে এখানে এসে খবর নিয়ে যান। আমরা বাঙালি বলে কটেজের ভাড়ায় নাকি বড়োসড়ো ডিসকাউন্ট রেখেছেন, তবে সেটা ধাপ্পাবাজি। তিন দিনে সাড়ে পনেরো হাজার টাকা গছিয়ে নিয়েছেন।

লক্ষ করেছি, কথা বলতে বলতে কেবলই হাতের তালু দিয়ে টেবিলের উপরে তাল ঠোকেন ভদ্রলোক। অলকার কথা শুনে একগাল হেসে বললেন, "প্রথম রাত যখন, ঘুম-টুম ঠিক করে হয়নি, তা-ই তো?"

— "আপনি কেমন করে জানলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— "সবারই তাই হয়। আসলে আপনারা কলকাতায় থাকেন, রাতে জন্তুজানোয়ারের ডাক শুনে ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাস নেই তো..."

— "এখানে কোনও ভয়ানক জানোয়ার টানোয়ার আছে?" আমি জলের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বড়ো জাতের?"

— "বড়ো বলতে? হাতি-টাতি নেই, শিয়াল আছে বটে তবে তারা তেমন ভয়ংকর নয়। মানুষ দেখলে এড়িয়েই চলে।"

আমার কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে দেখা সেই ছায়াটার কথা মনে পড়ে গেল। সেটা মন থেকে সরাতে মুখ তুলে প্রশ্ন করলাম, "ঘুম না-হওয়াটা বড়ো কথা নয়, কিন্তু এই কটেজ নিয়ে অন্য একটা অভিযোগ আছে আমার।"

— "সে কী! কী বলুন তো?"

— "এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন কটেজটা কিন্তু কুড়িয়ে-পাওয়া একটা উইন্ডচাইম ঝুলিয়েছেন বারান্দায়?"

গীতেশবাবুর ভুরু দুটো একবারের জন্য কুঁচকে গেল, পরমুহূর্তেই সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি— "ওঃ ওটা! আরে না মশাই, ওটা কুড়িয়ে পাওয়া নয়, বলতে পারেন ওটাই এখানকার আদি বাসিন্দা, বাকি কটেজের সব কিছুই পরে এসেছে। তাছাড়া ওটা না-ফেলার অন্য একটা কারণ আছে।"

— "কীরকম কারণ?" অলকার মুখ একটা চাপা কৌতূহল লক্ষ করলাম।

গীতেশবাবু একবার হাতঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "এই কটেজগুলো তৈরি হয়েছে ধরুন বছর পাঁচেক আগে, তার আগে এখানে একটা ছোটো কুটির ছিল, তাতে কাসিমা নামে এক কিম্ভূত মহিলা থাকত। তিনি দেহ রাখতে কটেজটা বানানো হয়।"

— "কাসিমা! সেটা কে আবার?"

— "ওই যে বললাম কিম্ভূত মহিলা। স্থানীয় গুজব, সে নাকি কুটিরের ভিতর নিজেকে বন্দি করে উইচ্‌ক্র্যাফট-তন্ত্রমন্ত্র এইসব করত।"

— "আরে বাঃ! গথিক ব্যাপার-স্যাপার। এইটারই অভাব ছিল এসে থেকে।" আমি হাসতে হাসতে বললাম।

গীতেশবাবু দেখলাম আমার হাসিতে খুব একটা বিচলিত হলেন না, আগের মতোই বলতে থাকলেন, "জঙ্গলের এই ধারটায় স্থানীয় লোকজন খুব একটা আসতে চায় না। এলাকাটা খুব একটা উন্নত হয়নি বলে ট্যুরিস্টও খুব একটা আসত না। শোনা যায়, কাসিমা যখন ছোটো ছিল তখন ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। তারপর থেকে সে এই জঙ্গলের ধারে বাসা বাঁধে। কারও সাতে-পাঁচে থাকত না, ছেলেপুলে দেখলে তাড়া করত না। জঙ্গল আলাদা কোনও গ্রামের আওতায়ও পড়ে না। ফলে তাকে তাড়ানোরও ইচ্ছা ছিল না কারও। মনের সুখে তন্ত্রমন্ত্র করত সে।"

— "উইন্ডচাইমটা তাহলে তারই, তা-ই না?" অলকা জিজ্ঞেস করল।

— "আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচ বছর আগে শীতের এক সন্ধ্যায় গ্রামের কিছু বাচ্চা ছেলে সাহস করে জঙ্গলের ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিতে এসে কাসিমার কুঁড়ে ঘরটা দেখতে পায়। সেই সঙ্গে বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে আসে। তারাই ছুটে গ্রামে এসে খবর দেয়, ডাইনি তার ঘরের একেবারে মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে। আমরাই এসে তার সৎকারের বন্দোবস্ত করি। কুটিরটাও ভেঙে ফেলা হয়। সেখান থেকেই কেউ তুলে নিয়ে যায় উইন্ডচাইমটা।" একটু থেমে দম নিয়ে গীতেশবাবু বলেন, "আপনারা চাইলে ওটা সরিয়ে নেব আমরা। আসলে জঙ্গলের ধারের এই জায়গাটা কাসিমার, এতগুলো বছর এখানে সে ছাড়া আর কেউ থাকত না। ফলে শেষ একটা চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখা আর কী... বাকি সবই তো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া লোকে বলে, উইন্ডচাইম নাকি খারাপ শক্তিকে দূরে রাখে... তাই আর কী..."

— "আচ্ছা, এই কাসিমা কি সত্যিই ডাইনি ছিলেন?"

গীতেশবাবু কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, — "হ্যাঁ, একেবারে। ঝাঁটায় করে হাওয়া খেতে বের হত আর কেউ দুষ্টুমি করলেই ধুলো ছিটিয়ে কালো বিড়াল বানিয়ে দিত। তোমারও চিন্তাভাবনা বলিহারি।"

— "ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন মহিলা।"

— "বাঁশি!" আমার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। চমকে উঠলাম।

— "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে গভীর রাতের দিকে গ্রামের কেউ কেউ শুনতে পেত সে বাঁশির আওয়াজ। আমিও শুনেছিলাম একবার।"

একবার ভাবলাম কাল রাতের ঘটনাটা খুলে বলি, পরক্ষণেই মনে হল এমনিতেই এখানে এসে থেকে অলকার মাথার পোকাগুলো নড়ে উঠেছে। এসব কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না।

— "ভাবছি, বেলা করে একবার জঙ্গলটা দেখে আসব।"

— "হ্যাঁ আসুন-না, এ জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। চারদিকেই রাস্তা আছে। উলটোমুখে সোজা হাঁটতে থাকলেই বেরিয়ে আসবেন।"

— "আপনিও চলুন-না।" অলকা টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল।

গীতেশবাবু ঘাড় নাড়লেন, "আমার আবার গ্রামের দিকে কিছু কাজ আছে, বরঞ্চ মুকুন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শিক্ষিত ছেলে, জঙ্গলটাও ভালো চেনে, আপনাদের সমস্ত দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে।"

গীতেশবাবু বিদায় নিতে আমরা কটেজের ভিতরে ঢুকে জামাকাপড় পালটে নিলাম। সকালে উঠে থেকেই মেজাজটা বেশ ফুরফুরে আছে আমার। এখানে বাতাসে গাড়ির ধোঁয়া নেই। মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্ক নেই। আছে শুধু নাম-না-জানা পাখির ডাক আর আদিম বৃক্ষের পাতা ছুঁয়ে ভেসে-আসা এলোমেলো হাওয়ার শব্দ। বাইরেটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে একবার তাকালেই চোখ ভরে যায়। আজ থেকে লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের খবরদারি শুরু হয়নি তখন হয়তো গোটা পৃথিবী জুড়ে এমনই বৃক্ষের সার আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত শতাব্দীর পর শতাব্দী। পাতার নড়াচড়া ছাড়া আর কোনও প্রাণীর আসা যাওয়া ছিল না তখন, কিংবা ছিল হয়তো, আমরাই জানি না।

মুকুন্দ বলে ছেলেটা আমরা কটেজ থেকে বেরোনোর আগেই এসে হাজির হয়েছে। দু-একটা কথাবার্তা বলে বুঝলাম, গীতেশবাবু তাকে আগে থেকে তালিম দিয়েই পাঠিয়েছেন। তালিমে সবার আগে বুঝিয়েছেন যে আমাদের থেকে কোনোওভাবেই যেন বকশিশ না চেয়ে বসে। অলকা দেখলাম, খুশিই হয়েছে তাকে পেয়ে।

কটেজের সামনের দিকে আধ কিলোমিটার হাঁটলে গ্রাম। পিছনদিকে কিছুটা গেলেই জঙ্গলের সীমারেখা। আমরা যখন সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছাড়িয়েছে। গীতেশবাবু আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন দিনের আলো থাকতে জঙ্গল যতটা নিরাপদ, রাত নামলে ততটাই ভয়ংকর। এখন শীতকাল নয়, ফলে সাপের

উপদ্রবের আশঙ্কা প্রবল। অন্ধকারে সাপের গায়ে পা পড়ে গেলে একটা কাণ্ড ঘটবে।

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে মুকুন্দ আমাদের থেকে হাত পাঁচেক এগিয়ে হাঁটতে লাগল। তার হাতে একটা ফুট দুয়েকের শক্ত লাঠি। পথের উপরে এসে পড়া লতানে গাছপালা সরিয়ে দিচ্ছে। গুনগুন করে একটা গানও গাইছে বুঝি।

— "হ্যাঁ রে, কাসিমাকে তুই দেখেছিলি?" অলকা ডাইনির ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

থেমে পিছন ফিরে একবার আমাদের দিকে তাকায় মুকুন্দ, তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে বলে, — "বেঁচে থাকতে দেখিনি। মরে গিয়েছিল যখন তখন দেখেছি।"

— "মানে ডেডবডিটা দেখেছে।" আমি বিড়বিড় করলাম।

— "ডেডবডিটা তোরাই দেখেছিলি আগে?"

মুকুন্দ কী উত্তর দিল বোঝা গেল না, গাছের উপরে লাঠির আছড়ে পড়ার শব্দে হারিয়ে গেল।

— "উইন্ডচাইমটা দেখেছিলি তখন?"

— "কী?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

এবার আমি বললাম, "উইন্ডচাইম, ওই যে বারান্দায় ঝোলানো আছে যেটা, টুং টুং করে আওয়াজ হয় হাওয়া দিলে?"

— "হ্যাঁ, ওটা ওর ঘরের বাইরে ঝুলছিল। ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার আগে মানিক একটা গাছে ঝুলিয়ে দেয় ওটা।"

— "মানিক কে? তোর বন্ধু?"

আবার লাঠি পেটার শব্দে কথা হারিয়ে যায়। আমরা আর প্রশ্ন না করে সামনে হাঁটতে থাকি।

জঙ্গলটা খুব একটা ঘন নয়। বেশির ভাগই শাল গাছ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে বুনো ফার্ন আর শ্যাওলার ঝোপ জমাট বেঁধেছে। সেই ঝোপের

উপর কোথাও গাছের শুকনো পাতা পড়ে আছে। মিহি ধুলোর মতো কিছু একটা উড়ছে বাতাসে। আমাদের তিনজনের পায়ের আওয়াজ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা জঙ্গল জুড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ হল লক্ষ করেছি, থেকে থেকে পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে অলকা। যেন দেখার চেষ্টা করছে কাউকে। এবার সামনে ফিরতে গিয়ে আমার চোখে চোখ পড়ে গেল তার। আমি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে বলো তো? পিছনে কাকে দেখছ?”

— “কী জানি...” একটু উদ্‌বিগ্ন দেখাল তাকে, “মনে হচ্ছে কিছু একটা সরে যাচ্ছে বারবার।”

— “কী সরে যাচ্ছে?”

— “একটা ছায়া।”

— “ছায়া! কেমন ছায়া?”

— “ঠিক...” বাকি কথাটা গিলে নেয় অলকা, “ঠিক বুঝতে পারছি না।”

সামনে তাকিয়ে দেখলাম, জঙ্গলের একটা বিশেষ জায়গায় এসে পড়েছি আমরা। এখানে জঙ্গলের রং কিছুটা খয়েরি। যেন বেছে বেছে এই জায়গার কয়েকটা গাছে মড়ক লেগেছে। কোনও কারণে পাতা শুকিয়ে গেছে তাদের। গাছের ফাঁকে একটা বেশ বড়ো জায়গার মাটি ধসে গিয়ে খাদের মতো হয়ে আছে। তবে ফুট দশেকের বেশি গভীর নয়।

— “এখানে আগুন লেগেছিল নাকি?” আমি মুকুন্দর মাথার পিছনে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মুকুন্দ কাঁধ ঝাঁকাল, বুঝলাম, আগুন লেগেছিল কি না সে তথ্য তার কাছেও নেই। এগোতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পা আটকে গেল। পাশ ফিরতেই খেয়াল করেছি অলকা আমার পাশে নেই। এতক্ষণে সামনের জায়গাটা দেখতে গিয়ে তার কথা মনেই ছিল না। চকিতে পিছন ফিরলাম, আমাদের ফেলে-আসা রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। অলকা নেই।

একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। অনেকটা যেন মিহি বাঁশির আওয়াজ। কাল রাতের সেই বাঁশিটা এখন কাছেই কোথাও বাজছে। আমি একঝলক দেখে নিলাম মুকুন্দের মুখটা, হ্যাঁ সে-ও শুনতে পেয়েছে। সতর্ক চোখে জঙ্গলের চারপাশটা লক্ষ করছে সে।

— "অলকা..." আমি গলা তুলে ডেকে উঠলাম, "কোথায় তুমি?"

কোনও উত্তর এল না। জঙ্গলের অন্য শব্দ যেন ম্যাজিকের মতো থেমে গেছে, শুধু অচেনা একটা হাওয়া ভেসে আসছে গাছের ফাঁক থেকে। অলকার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমি পিছন দিকে দৌড়োতে লাগলাম। চোখ রাখলাম দু-পাশে যত দূর দেখা যায়। ভেসে আসা হাওয়াটা বাঁশির সুরের সঙ্গেই কম্পিত হচ্ছে।

— "অলকা..." আমার মাথার শিরাগুলো দপদপ করে উঠল। মনে হল, জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা গুল্মলতা আমার পা চেপে ধরতে চাইছে।

এলোপাতাড়ি ছুটতে যাচ্ছিলাম বাঁশির আওয়াজ লক্ষ্য করে, কিন্তু তার আগেই পিঠে একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে পিছন ফিরে দেখলাম মুকুন্দ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে, চাপা কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, — "ওদিকে পাবেন না, আমার সঙ্গে আসুন।"

— "কোথায়?"

— "আসুন।"

আমার কথার উত্তর দিল না সে। হাতের উপর চাপটা একটু বাড়িয়ে জঙ্গলের গাছের ফাঁক দিয়ে একটা দিকে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। খানিক হেঁটে কিছুটা দৌড়োনোর পরে অলকার নেভি ব্লু রঙের শার্ট চোখে পড়ল আমার। ছুটে গেলাম তার শরীর লক্ষ্য করে। সামনে গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জঙ্গলের ফাঁকা একটা জায়গার দিকে একমনে তাকিয়ে কী যেন দেখছে সে, হাত, পা চোখের মণি আশ্চর্যরকম স্থির। ঠিক যেন একটা জীবন্ত পুতুলে পরিণত হয়েছে সে।

— "এই অলকা..."

তার কাঁধের কাছে ঠেলা দিলাম আমি, “এখানে কী করে এলে।” পরপর দুবার ধাক্কা দিতে তার দেহে প্রাণের সঞ্চার হল, সে থতোমতো খেয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, “অ্যাঁ? এখানে...”

— “কী করে এলে এখানে? আমার সঙ্গে চলছিলে তো...” আমি তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম।

— “তুমি ডাকলে...”

— “আমি!”

— “আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম... তুমি বললে কী একটা দেখাবে...” একহাত দিয়ে তার মুখের উপরে এসে পড়া-চুলগুলো আমি সরিয়ে দিলাম, সে অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, “তারপর কোথায় গেলে বলতো?”

— “ধুর... কী সব বলছ... আমি তো মুকুন্দর সঙ্গে এগোচ্ছিলাম, ও-ই তো আমাকে পথ দেখিয়ে... কী বলো না...”

মুকুন্দর দিকে চেয়ে শেষ-কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি, থেমে গেলাম। আমার হাতটা একটু আগেই ছেড়ে দিয়েছে মুকুন্দ। এখন আমার পাশে আর অস্তিত্ব নেই তার। ঝোপের উপরে পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যেন আমি একাই এসেছি এখানে। গেল কোথায় ছেলেটা? এখানেই তো ছিল...

অলকা যেদিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে লক্ষ করলাম আমি। জঙ্গলের গাছগুলো যেন একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেখানে। ভিতরটা ঘন অন্ধকার। এ জঙ্গলটা এমনিতে পাতলা, বেশির ভাগ জায়গাতেই সূর্যের রোদ আলোছায়া বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমাদের থেকে বিশ হাত দূরে ওই বিশেষ জায়গাটা যেন একবুক রহস্য আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল গাছ না কেটে ওখানে মানুষের ঢোকার কোনও উপায় নেই।

— “কী আছে বল তো ওখানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অলকা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। আমাদের পিছনদিক

থেকে মাটির উপরে পায়ের আওয়াজ ভেসে এসেছে, সতর্ক হয়ে তাকাতে একটা মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল সেখানে— মুকুন্দ। আমাদেরকে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল,

— "আপনারা এখানে! আর আমি খুঁজে মরছি।"

অলকাকে ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "ইয়ারকি হচ্ছে? আমাকে তো তুমিই এখানে নিয়ে এলে।"

— "আমি!"

সে হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে আমাদের আপাদমস্তক দেখল। মুখের উপরে একবার বুলিয়ে নিল হাতটা। তারপর আর কিছু না বলে আমাদের পাশ দিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমি আর অলকা। তারপর মুকুন্দর পিছু নিলাম দু-জনেই।

— "জঙ্গলে আর সেরকম কিছু নেই দেখার মতো। আপনারা ছবি তুলে নিন।"

ছবি তোলার ইচ্ছা আর ছিল না আমাদের। ক্যামেরাটা বেরই করা হয়নি ব্যাগ থেকে। কপাল ঘষতে ঘষতে বললাম, "তুমি সত্যি বলছ আমাকে ওখানে নিয়ে যাওনি?"

— "না, আমি চিৎকার করছিলাম। আপনারা সাড়া দিচ্ছিলেন না।"

অলকা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "সাড়া যদি না-ই দিয়ে থাকি তাহলে তুই বুঝলি কী করে, আমরা ওখানে আছি?"

এইবার একটু অস্বস্তিতে পড়ল মুকুন্দ। মুখ দেখে মনে হল কিছু একটা কথা লুকোতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। ঢোক গিলে বলল, — "আমি জানতাম, আপনারা ওখানে থাকবেন।"

— "কী করে?" আমরা দু-জনে প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নেয় মুকুন্দ, তার মুখে ছায়া

ঘনিয়ে আসে,

— "আগে আমরা এই জঙ্গলের ভিতরে খেলতে আসতাম। তো একবার খুব ঝড় হচ্ছিল, আমরা সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, মানিক আমাদের সঙ্গে বেরোয়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আবিষ্কার করি, সে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে। সেবার আমরা অত কিছু ভাবিনি। কিন্তু ঘটনাটা আরও বার তিনেক ঘটে। প্রতিবার কেউ না কেউ হারিয়ে যায়। তারপর ওইরকম জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর থেকে ভয়ে আর আসি না।

যতবারই ঝড় ওঠে, ওই বাঁশিটা বাজতে থাকে, স্যার..." থেমে থেমে পরের কথাগুলো উচ্চারণ করে সে, "বাঁশিটা ভালো নয়, স্যার। কাসিমা ডাইনি ছিল, তার অভিশাপ এখনও এই জায়গাটা ছেড়ে যায়নি।"

— "কীসের অভিশাপ?"

বুঝলাম, ইচ্ছা করেই উত্তর এড়িয়ে গেল মুকুন্দ। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, — "আজ আর জঙ্গল ঘুরে কাজ নেই। তুমি আমাদের বেরোনোর ব্যবস্থা করো।"

কিছুটা এদিক-ওদিক ঘুরে জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে বেরোলাম যখন তখন দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। বেরোনোর আগে পিছন ফিরে জঙ্গলটার দিকে আর-একবার তাকালাম। কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে গাছগুলোকে। যেন একসময় অনেক মানুষ বাস করত এই জঙ্গলের ভিতরে, তারপর কিছু একটা ঘটায় রাতারাতি পরিত্যক্ত হয়েছে জঙ্গলটা। গোটা জঙ্গলটা ঠিক একটা হানাবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে বেরিয়ে মুকুন্দ গ্রামের দিকে চলে গেল। আমরা কটেজের দিকে এগোলাম। লক্ষ করলাম অলকা একটু বেশি আমার দিকে ঘেঁষে হাঁটছে। চোখমুখ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তার। আমার নিজেরও শরীর ভালো লাগছিল না। অলকা বলল, "বাঁশিটা কে বাজাচ্ছিল বলো তো? জঙ্গলে অন্য কেউ তো ছিল না।"

— "থাকতে পারে, আমরা জানব কী করে, তবে..."

— "তবে কী?" সে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকাল।

— "কাল রাতেও বাঁশিটা শুনেছিলাম আমি।"

— "কাল রাতে! কখন?"

— "উইন্ডচাইমটা নামিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম যখন, মনে হল, একটা ছায়া যেন সরে যাচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে। আর ওই বাঁশিটা..."

গার্ডেন গেটটার সামনে এসে পড়েছিলাম আমরা, অলকা পিছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে বলল, "জায়গাটা আমার একদম ভালো লাগছে না। আচ্ছা, ডাইনিদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে বলে শুনেছি, যদি সত্যি কোনও অভিশাপ থাকে জায়গাটাকে ঘিরে?"

— "ধুর, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আর অভিশাপ যদি থাকেই, সেটার তো একটা কারণ থাকবে। কাসিমাকে তো গ্রামবাসীরা মারেনি। খামোখা সে অভিশাপ দিতে যাবে কেন?"

— "তুমি কী করে জানলে, মারেনি? গীতেশবাবু বললেন, তার ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখেছিল ছেলেরা। সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু না-ও হতে পারে। পোস্টমর্টেম কিছু হয়েছিল বলে তো মনে হয় না।"

— "হুম... ব্যাপারটা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। কোথাও কিছু গোলমাল তো নিশ্চয়ই আছে।"

দু-জনে কটেজের ভিতরে ঢুকে আসি। জানি না কেন, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হল কোথা থেকে একটা গন্ধ আসছে। ঠিক যেন কটেজের কোনও ঘরে কেরোসিন ছড়িয়েছে কেউ। ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে গন্ধটা।

— "কী হল? দাঁড়িয়ে গেলে যে।"

অলকার কথায় চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

হাওয়ায় আর-একবার শুঁকলাম গন্ধটা। নাঃ, আর আসছে না। কিন্তু গন্ধ তো এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবার নয়, তাহলে? মনের ভুলই হবে।

(তিন)

কটেজের ভিতরে একটা ছোটো রান্নাঘর আছে। সেখানেই আজকের মতো রান্নার ব্যবস্থা করে নিলাম আমরা। দু-জনে মিলে রান্নাবান্না শেষ করতে করতে কিছুটা দেরি হল। কিছুতেই মন বসছে না। থেকে থেকে দুপুরের ঘটনাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সব কিছু কেমন গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে অলকার হারিয়ে যাওয়াটা।

সন্ধে পেরোতেই খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানা নিলাম দু-জনে। আজ আর উইন্ডচাইমের শব্দ আসছে না। বাইরে জঙ্গলে কাল রাতের প্যাঁচাটা ডাকছে বটে কিন্তু রাতচরা পাখিটা নেই আজ।

বারান্দার আলোটা আজ জ্বেলেই শুয়েছি। সেটা এখন বসার ঘর পেরিয়ে আমাদের উল্টোদিকের দেওয়ালে এসে পড়েছে। বারান্দার গাছের এগিয়ে-আসা ডালপালা আঙুলের মতো ছায়া তৈরি করেছে। ছায়াগুলো দুলছে।

— "ধরো যদি সত্যি কোনও অভিশাপ থাকে, সেটা আমাদের উপরে লাগবে কী?" অলকা উলটো হয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করল।

— "তুমি ওসব সরাও এখন মাথা থেকে। কাল সকাল হলেই এখান থেকে চলে যাব। রাতটা একবার কাটাতে পারলে অভিশাপ নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে।"

আমার শেষ কথাটায় একটু ধমকের সুর ছিল। তাতে কাজ দিল। লেপে মাথা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল অলকা। আমিও পাশ ফিরে শুলাম। কিন্তু মন উশখুশ করতে লাগল। কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না মনটা। এই জঙ্গুলে জায়গাটার ভিতরে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। ঠিক যেন একটা জীবন্ত কুয়াশা আড়াল থেকে নজর রাখছে আমাদের উপর।

তবে কি সত্যি কাসিমার আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় এই কটেজকে ঘিরে? এখানে থাকতে আসা মানুষকে বিভ্রান্ত করে? কিন্তু কেন?

একটা সম্ভাবনা মাথায় এল আমার। হয়তো তার ঘরের ভিতরে এমন

কিছু ছিল, যা পুড়ে যায়নি। এমন কিছু, যাকে অবলম্বন করে এখনও এখানে টিকে আছে সে। কী হতে পারে?

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ে গেল, উইন্ডচাইম। তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন, সেটা বারান্দা থেকে সরিয়ে নিতেই সেই ছায়াটাকে লক্ষ করেছিলাম জঙ্গলের ভিতরে।

অলকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে চটিটা গলালাম না। আবার একটা মিহি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ... তবে বাঁশির নয়, খুব হালকা চাপা স্বরে যেন শিস দিচ্ছে কেউ। ছোটো ফাটলের ভিতর থেকে সজোরে হাওয়া দিলে যেমন শব্দ হয়—সেইরকম।

বেশ বুঝতে পারলাম আওয়াজটা প্রাকৃতিক না, কারও মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে সেটা। সেই আওয়াজেই সম্মোহিতের মতো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল মাথার উপরে জ্বলতে-থাকা হলদে আলোটা একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বারান্দার আউটলাইন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। দূরে জঙ্গলের গাছের মাথার দিকগুলো দেখা যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ায় দুলে উঠছে তারা। এলোপাতাড়ি নয়, কোনও নির্দিষ্ট ছন্দে।

খেয়াল করলাম, বারান্দার কাঠের রেলিং-এর গায়ে একটা হাত রেখে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। তার সমস্ত শরীর কালো আলখাল্লার মতো কাপড়ে ঢাকা। মাথার চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে নীচে।

— "অলকা..." কাঁপা-কাঁপা স্বরে উচ্চারণ করলাম আমি। যদিও মন বলছে, আমার ঠিক সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে অলকা নয়। অন্য কেউ।

শিসের শব্দ থেমে গেল। নারীমূর্তির রেলিং-এর উপরে রাখা হাতদুটো নেমে এল কোমরের দু'পাশে।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। একটা হাত রাখলাম তার পিঠে, ঠিক যেন ঠান্ডা গাছের কান্ডে হাত রেখেছি। প্রাণ আছে, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে উদ্ভিদের মতো প্রাণ। সে আস্তে আস্তে ফিরে তাকাতে লাগল আমার দিকে। এইবার... তার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার চোখের সামনে...

কিন্তু মুখ কোথায়? আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নারীমূর্তির মুখমণ্ডল যেন ছুরি দিয়ে ধার থেকে কেটে সরিয়ে নিয়েছে কেউ। গোটা মুখ জুড়ে একটা গাছের অন্ধকার কোটর।

এতক্ষণ আমার চারপাশের সমস্ত শব্দ থেমে গিয়েছিল, এবার আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে কোটর থেকে আবার বেরিয়ে এল সেই ভয়াবহ শিসের শব্দ। আমি ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে খেয়াল করলাম আমার হাত খালি, কিচ্ছু নেই সেখানে।

— "কী চাও তুমি?" চিৎকার করে উঠলাম।

পিছন ফিরে দৌড়ে ঘরের ভিতর আসতে গিয়ে আমি মাটির উপরেই বসে পড়লাম। আমার মুখের ঠিক সামনে এখন অলকার মুখ। তবে সোজা নয়, উলটো। ঘরের উপরের দেওয়াল থেকে তার পা বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। তার সাদা চোখের মণি দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সে হাসছে। সশব্দে হাসছে।

দু-হাতে চোখ ঢেকে ফেললাম। পরক্ষণে চোখ খুলতেই হাসির আওয়াজ মিলিয়ে গেল। দেখলাম, অলকা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আমার দিকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এল সে, — "এ কী! তুমি এখানে বসে আছ কেন?"

সে একটা হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। আমি জামার হাতায় মুখটা মুছে পিছন দিকটা দেখে নিলাম। বারান্দাটা এখনও আগের মতোই পড়ে আছে। একটুও হাওয়া দিচ্ছে না বাইরে।

— "একটা কথা মনে আছে তোমার?"

— "কী কথা?" সে ঘুম-জড়ানো চোখে চাইল আমার দিকে।

— "কাল আমরা জঙ্গলের ঢুকেছিলাম যখন তখন জোরে হাওয়া দিচ্ছিল?"

ভাবতে মিনিট দুয়েক সময় নেয় অলকা, বলে, "না তো, বরঞ্চ বেশ গুমোট হয়ে ছিল।"

— "অথচ মুকুন্দ বলল, একমাত্র ঝড় উঠলেই জঙ্গলের মধ্যে গণ্ডগোলটা ঘটে থাকে।"

— "আমারও সেটা মনে হচ্ছিল... কিন্তু..."

— "আমরা একটা বড় ভুল করে ফেলেছি, উইন্ড চাইমটা সরিয়ে নেওয়া উচিৎ হয়নি আমাদের।"

— "কিন্তু কেন?"

আমি দ্রুত বারান্দার দিকে সরে আসি, "ওটা কোনও সাধারণ উইন্ডচাইম না, এই জঙ্গলের ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যে বাঁশির মতো শব্দ করে বাতাসে কোনও হ্যালুসিনোজেন ছড়াতে পারে। সে বাঁশির শব্দ যে শুনতে পাবে—সে-ই ভয়ংকর কিছু একটা দেখতে পাবে। তাকে নিস্তেজ করে রাখার একটাই উপায় আছে। ওই উইন্ডচাইমের সুরটা। ওটা শুনিয়েই এত বছর তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল কাসিমা। কাল আমি ওটা খুলে নেওয়ার পর সে আবার জেগে উঠেছে।"

অলকাকে বিভ্রান্ত দেখাল। আমার কথাগুলো মাথায় ঢোকেনি তার। কিছুটা এগিয়ে এসে বলল, "এসব তুমি কী করে জানলে?"

— "ভেবে দেখো, একমাত্র ঝড় হলেই বাঁশির শব্দ শোনা যায়, অর্থাৎ হাওয়ার ঝাপটায় যখন উইন্ডচাইমের শব্দ-পালটে যায় তখনই জেগে ওঠে সে।"

— "কিন্তু কালকে তো আমি ভয় পাইনি।"

আমি জঞ্জালের বাক্সের ভিতরে পড়ে থাকা উইন্ডচাইমটা হাতে তুলে নিলাম। সেটা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে-থাকা কঞ্চিতে ঝোলাতে ঝোলাতে

বললাম, "কাল আমাদের ভয় দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না তার। সে মানুষকে জানতে চায়, মানুষ কীসে ভয় পায়, সেটা বুঝতে চায়। কাল তুমি হতবাক হয়ে জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকার একটা জায়গায় তাকিয়ে ছিলে। আমার মনে হয়, সেই অন্ধকারের ভিতরেই সে থাকে।"

টুং টুং শব্দে আবার বাজতে শুরু করেছে উইন্ডচাইমটা। হাওয়ার দোলা নয়, বিশেষ একটা সুর তুলে বেজে চলেছে সে। মৃদু ধাতব আওয়াজটা যেন ভেসে এসে প্রবেশ করছে আমাদের শরীরের ভিতরে।

— "কাসিমা ডাইনি ছিল কি না আমি জানি না, কিন্তু কোনওভাবে জঙ্গলের প্রাণীটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার শব্দটা সে নিজেই তৈরি করেছিল। তা না করলে এই জায়গাটায় সে টিকতে পারত না।"

— "কিন্তু সে এল কোথা থেকে?"

আমি একহাতে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে বললাম, "বলা যায় না। হয়তো পৃথিবীতেই ছিল। এখনও আদিম বন-বনানী কিংবা সমুদ্রের গভীরে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের হদিস মানুষ এখনও পায়নি। এ-ও হয়তো তেমন কিছুই।"

ক্রমশ পিয়ানোর মতো সুরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সম্মোহিনী বাঁশির সুর। মনে হল, আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসছে আমাদের চারপাশে, বুঝতে পারলাম, অলকার একটা হাত আমার জামার হাতা খামচে ধরেছে। একদৃষ্টে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এই প্রাণীটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না?"

— "পারে হয়তো। তবে এখনও আসেনি যখন তার মানে আপাতত আর আসার সম্ভাবনা নেই।" ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মাথায় একটা হাত রাখলাম আমি— "অত চিন্তার কিছু নেই। চলো, ঘুমিয়ে পড়ি। এবার আর গণ্ডগোল হবে না।"

(চার)

সকালে ব্যাগপত্র নিয়ে বাগানের গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গীতেশবাবু একটু আগেই এসে পৌঁছেছেন। আমাদেরকে গাড়িতে করে স্টেশন অবধি দিয়ে আসবেন তিনি। সকালের দিকে মুকুন্দও এসে ঘুরে গেছে একবার। কালকের কথা যে আমি গীতেশবাবুকে বলিনি, সেটার জন্য বাড়তি ধন্যবাদ দিয়ে গেল আমাকে।

চারপাশটা এখন রোদে ঝলমল করছে। জঙ্গলের সবুজ গাছের উপরে সেই রোদ এসে পড়ে ঠিক রূপকথার জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে। যেন এইমাত্র ভিতর থেকে একটা সোনালি হরিণ বেরিয়ে আসবে।

সেদিক থেকে চোখ নামিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। গীতেশবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পিছন ফিরে বললাম, "কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?"

গীতেশবাবু উত্তর দিলেন না। পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি। নীচের দিকে মুখ নামিয়ে মাটিতে কী যেন দেখছেন। অথচ কিছুই পড়ে নেই মাটিতে।

— "কী হল? গীতেশবাবু... শুনছেন?"

আমি তার দিকে এগিয়েই যাচ্ছিলাম। তার আগেই তিনি মাথা তুললেন। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতরটা এক পলকের জন্যে ছ্যাঁত করে উঠল। গীতেশবাবুর ঠোঁট দুটো মুখের দু-দিকে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ সে মুখে ফুটে উঠছে একটা অমানুষিক, নারকীয় হাসি। যেন কিছু একটা কারণে আমাকে ব্যঙ্গ করতে চাইছেন তিনি।

একটু একটু করে সেই হাসি মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে। সেই সঙ্গে চোখ, নাক, কপাল, গাল মুছে গিয়ে তৈরি হল একটা অন্ধকার শূন্য, কাল রাতের নারীমূর্তির মতো ধীরে ধীরে উলটো হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগলেন তিনি।

— "কী হচ্ছে এসব... আমি... আমি..."

দিনের আলো নিভে এল একনিমেষে। আমার চারপাশের সবকিছু পালটে গিয়ে মুহূর্তে অনুভব করলাম, আবার এসে দাঁড়িয়েছি কাল রাতের সেই ভৌতিক মুহূর্তে। কানে এল অলকার অসহায় গলার স্বর, "কী হল, খুঁজে পাচ্ছ না? কোথায় ওটা?"

বুঝলাম, জঞ্জালের বাক্সে উইন্ডচাইমটা খুঁজে চলেছি আমি। এতক্ষণ কি তবে হ্যালুসিনেট করছিলাম? কালকের সকাল আসেনি এখনও? তাহলে... না হোক, উইন্ডচাইমটা একবার ঝুলিয়ে দিতে পারলেই...

ঠান্ডা পাইপের ছোঁয়া হাতে লাগতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, "পেয়েছি... পেয়েছি..."

. — "ওঃ গড..." অলকার গলায় খুশি ঝরে পড়ল, "দাও আমাকে... কুইক।"

পাইপটা ধরে একটা টান দিয়ে উইন্ডচাইমটা অলকার হাতে ধরিয়ে দিলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে একটা শব্দ করে খসে পড়ল সেটা। আমি হতবাক চোখে তাকিয়ে দেখলাম পাইপের সুতোগুলো গোড়া থেকে ছিঁড়ে রেখেছে কেউ। কিন্তু কে ছিঁড়বে? আমি তো প্রথমদিন রাতে...

স্পষ্ট হয়ে গেল উত্তরটা। সেদিন উইন্ডচাইমটা খুলে নেওয়ার পরেই বাঁশি বাজতে শুরু করেছিল। সম্মোহিত অবস্থায় আমি নিজেই হয়তো... এবার আর কাজ করবে না ওটা...

— "কী করেছ তুমি এটা!" সে গলা চিরে চিৎকার করে উঠল।

— "আমি! কে আমাকে বলেছিল উইন্ডচাইমটা..."

একটা আতঙ্কিত চিৎকার করে আমার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল অলকা, কিন্তু তার চিৎকার ছাপিয়ে আর একটা শব্দ এসে পড়েছে আমাদের কানে। না, আর জঙ্গলের দিক থেকে না, ভিতরের ঘর থেকে... তীব্র বাঁশির শব্দ ভেসে আসছে আমাদের শোবার ঘর থেকে... সেখান থেকে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে কেউ...

রাইম



মাঝরাস্তায় আচমকাই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। অভিজিতের পাশের সিটে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভূমি। সে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল। চারপাশটা একবার ঠাওর করে বড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী হল গো? কিছু বিগড়োল নাকি?"

অভিজিৎ ঠোঁট ওল্টাল। পিছনের সিটে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। চোখ বুজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে পাপড়ি। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভাঙেনি। দ্রুতহাতে গাড়ির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অভিজিৎ। সেটা বন্ধ না করেই একছুটে গাড়ির সামনে গিয়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে কী যেন দেখে নিয়ে একটু আশ্বস্ত হল। কবজির উলটোদিক দিয়ে কপালের ঘাম মুছল একবার।

দশ বছরের মেয়ে আর স্ত্রী-কে নিয়ে এক অফিস কলিগের পার্টি অ্যাটেন্ড করতে গেছিল অভিজিৎ। জায়গাটা চেনা নয়, তা-ও ম্যাপ দেখে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল। ফিরতে যে এতটা রাত হয়ে যাবে, সেটা আগে আন্দাজ করতে পারেনি।

ভূমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, গাড়িটা একটা ফাঁকা মাঠের বুক-চেরা রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে আছে। মাঠের দূর প্রান্তের দিকে তাকালে কয়েকটা প্রাচীন দৈত্যাকৃতি গাছের আউটলাইন চোখে পড়ে। তার উপর তুলিতে টানা রঙের মতো কালচে-লাল আকাশ চোখে পড়ছে। ঘড়িতে সময় দ্যাখে সে, রাত সাড়ে বারোটা বাজতে চলেছে। নাঃ, যতটা ভেবেছিল ততটা রাত হয়নি। কিন্তু অভিজিৎ এখনও গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে করছেটা কী? জানলার কাচ নামিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সে, — "কী দেখছ বলো তো?"

— "একটা বাচ্চা মেয়ে..." গালে হাত রেখে চাপাস্বরে উত্তর দেয় অভিজিৎ।

— "এখানে বাচ্চা মেয়ে কোথা থেকে আসবে?" ভূমি অবাক হয়।

গাড়ির বাইরেটা আর-একবার ভালো করে দেখে নিয়ে আবার ভিতরে এসে বসে অভিজিৎ। ঘাড়ের পিছনে একটা হাত রেখে বলে, "সেটাই ভাবছি, গাড়ি চালাতে চালাতে চোখটা লেগে গিয়েছিল হঠাৎ মনে হল, গাড়ির সামনে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে পড়েছে। তাতেই ব্রেক মারলাম।"

— "তাহলে তো বাইরে..."

— "নাথিং। কিচ্ছু নেই।" ভূমির কথা শেষ হতে দেয় না অভিজিৎ।

পিছন ফিরে আর-একবার পাপড়ির দিকে চেয়ে নিল ভূমি। গাড়িতে উঠে থেকে ঘুমোতে শুরু করেছে মেয়েটা। মুখের দু-পাশ বেয়ে ঝুলন্ত চুলগুলো গাল ঢেকে রেখেছে। একটা হাত দিয়ে চোখ রগড়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, "তাহলে ভুল দেখেছ। চারপাশে তো যতদূর দেখা যায় শুধু ফাঁকা মাঠ। মেয়ে আসবে কী করে?"

— "হুম..." অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরটা দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল অভিজিৎ। ঘরঘর শব্দ করে গাড়ি থেমে গেল। স্টার্ট নিতে চাইছে না।

— "হায় ভগবান! এটাকেও বিগড়োতে হল!" বিরক্ত গলায় বলল অভিজিৎ। বাঁ হাতে ড্যাশবোর্ডে আলগা চাপড় মারল একটা, "কোথায় এসেছি সেটাও তো বুঝতে পারছি না। তোমার ফোনে নেটওয়ার্ক আছে?"

পাশে রাখা ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে ভূমি, স্ক্রিন আনলক করে বলে, "কম, তবে আছে।"

— "গুগল ম্যাপে দেখো কতদূর এসেছি। আমি একটু বাইরে নেমে দ্যাখি কী গণ্ডগোল করল।"

সামনে গিয়ে বনেট খুলে খুটখুট করতে লাগল অভিজিৎ। ভূমি কারেন্ট লোকেশান দেখে একটু গলা তুলে বলল, — "এ জায়গাটার কোনও নাম নেই। তিন কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে, খামারি। নাম শুনেছ আগে?"

— "উঁহুঁ... এত গ্রাম কেউ চিনে রাখে নাকি? ম্যাপে আর কিছু দেখাচ্ছে?"

— "নাঃ, শুধু সবুজ আর নীল, বাড়িঘর কিছু তো দেখছি না।"

— "আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম," জিব দিয়ে একটা আওয়াজ করল অভিজিৎ, "আজ যে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম, কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

— "গাড়ি কি চলবে না আর?" কথাটা বলে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে ভূমি, "হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে গেল? তুমি সত্যি ধাক্কা মারোনি কিছুতে?"

রাগত চোখে স্ত্রী-র দিকে তাকাল অভিজিৎ, — "যদি মেরেই থাকি তো বডিটা গেল কোথায়?"

ভূমি উত্তর দিল না। ফোনটা হাতে নিয়ে কিছু দেখে একটু থমকে গেল,

ফোনটা আরও কিছুটা চোখের কাছে এনে বলল, — "এই জায়গাটা নিয়ে একটা নিউজ আর্টিক্যাল আছে। দ্যাখো।"

— "আর্টিক্যাল দিয়ে কী করব আমি?" বিরক্ত হয়ে বলে অভিজিৎ।

— "আঃ, দ্যাখোই না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা হাতে নিয়ে আর্টিক্যালটায় চোখ রাখতেই হাত কেঁপে উঠল তার। লিংকে ক্লিক করতে পাতা জুড়ে পুরো খবরটা ফুটে উঠল।

খামারি নামের ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারের একটা গ্রামের আশপাশে গত দু-বছরে বেশ কয়েকটা মৃতদেহ পাওয়া গ্যাছে। পুলিশ সন্দেহ করছে যে খুনগুলো কোনও সিরিয়াল কিলারের কাজ। কারণ সব-কটা খুনই করা হয়েছে ভিকটিমের গলার ভিতরে কাঁচি দিয়ে আঘাত করে।

নিচের দিকে ছোট একটা আর্টিক্যাল করে লেখা, এলাকায় গুজব রটেছে এই দু-মাস ওই অঞ্চলে অনেকে নাকি একটি বছর দশেকের বাচ্চা মেয়েকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছে। সাদা রঙের ফ্রক থাকে মেয়েটির গায়ে, হাতে থাকে একটি বড়ো ধারালো কাঁচি। পুলিশ অবশ্য মেয়েটির ব্যাপারটাকে আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

মাঠের উপরে ইরিগেশন পাম্প বসানোর কাজ চলছিল দু'বছর আগে, রাত জেগে মাটি খুঁড়ছিল কিছু শ্রমিক। সকালে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা। প্রত্যেকের গলায় কাঁচিজাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। এরপর থেকে বেশ কয়েকটা একই ধরনের খুনের ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়।

খবরটা পড়তে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল অভিজিতের। মৃদু শব্দ করে সেটা খসে পড়ল হাত থেকে।

— "কী হল তোমার?" ভূমি তার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

— "ওই মেয়েটা... ফ্রক পরে ছিল, ওর হাতেও একটা কাঁচি ছিল।"

— "কোন্ মেয়ে?"

— "গাড়ির সামনে যাকে দেখেছিলাম।"

— "এই যে বললে ওটা মনের ভুল।"

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল অভিজিৎ। থেমে গেল। সামনের রাস্তার উপর একটা বাতিস্তম্ভ জ্বলছে। তার আলো ত্যারচাভাবে এসে পড়েছে পিচের রাস্তার উপরে, তাতে কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে মাঠের ধারের ঘাসগুলো। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা নিচে নেমে শুরু হচ্ছে মাঠটা। সেই ঢালের উপরে একটা সরু পায়ে-চলা পথ চোখে পড়ে। দু-পাশ থেকে ঝুঁকে লতাগুল্মের ঝোপ এখন ঢেকে রেখেছে রাস্তাটা।

— "যে করেই হোক গাড়িটা স্টার্ট করতে হবে।" থমথমে গলায় কথাটা বলে বনেটের ভিতরে আবার হাত চালায় অভিজিৎ। ভেবেছিল, ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে। কিন্তু না, কুলার ভর্তি হয়ে আছে জলে। তবে?

— "কাউকে ফোন করব? যদি গাড়ি নিয়ে আসে?" ভূমি ফোন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে।

— "ডু ইট।"

একটা নম্বর ডায়াল করল ভূমি। কয়েকবার রিং হয়ে কেটে গেল। রাত একটার কাছাকাছি বেজেছে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর-একটা নম্বরে কল করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘুম জড়ানো একটা গলা শুনতে পেল সে— "মা..."

বেশ জোর গলাতে গাড়ির ভিতর থেকে ডেকে উঠছে পাপড়ি। ভূমি দ্রুত এগিয়ে গেল তার দিকে। গাড়ির পিছনের জানলার কাচ নামানোই ছিল। সেখানে মুখ রাখল, মেয়ের মাথায় একটা হাত রেখে বলল, "দেখ-না গাড়িটা মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে গেল।"

— "একটা মেয়ে এসেছিল।" উদ্‌বিগ্ন মুখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল পাপড়ি, "ডাকছিল আমাকে।"

— "মেয়ে! কোন্ মেয়ে?"

— "কী জানি। জানলার বাইরে টোকা দিচ্ছিল আঙুল দিয়ে।"

একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল ভূমির শিরদাঁড়া দিয়ে। এক ঝটকায় দরজাটা খুলে পাপড়ির পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল সে, — "তারপর? তারপর কোন্ দিকে গেল?"

মায়ের বুকের ভিতর থেকেই চাপা গলায় উত্তর দিল পাপড়ি, ‘‘পিছন দিকে চলে গেল, মেয়েটা কে ছিল গো?’’

মেয়েকে একহাতে বুকে চেপে রেখেই অন্য হাতে পুলিশের নম্বর ডায়াল করল ভূমি। কিছুক্ষণ ঘড়ঘড় করে একটা শব্দ হয়ে কেটে গেল লাইনটা। নেটওয়ার্ক কমে আসতে শুরু করেছে। বিড়ালের মতো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিক দেখতে লাগল সে। এতক্ষণে অভিজিৎ গাড়ির বনেট নামিয়ে দিয়েছে। মুখের উপরে ছায়া নেমেছে তার।

মৃদু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে। ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা। চতুর্দিক আশ্চর্যরকম নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। যেন একটা বড়োসড়ো নাটকের জন্যে মঞ্চ সাজিয়ে রেখেছে কেউ।

সামনের সিটে এসে বসে নিজের কপালে একটা হাত রাখল অভিজিৎ ‘‘নাঃ, কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না।’’

— ‘‘মেয়েটা আমাদের আশেপাশেই আছে। পাপড়িকে জানলা দিয়ে ডাকছিল।’’, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল ভূমি।

— ‘‘হোয়াট!’’ অভিজিৎ ফিরে তাকাল— ‘‘তারপর?’’

— ‘‘শি জাস্ট ওয়েন্ট অ্যাওয়ে।’’

মাথা নাড়াল অভিজিৎ— ‘‘অ্যাবসার্ড! একটা বছর দশেকের মেয়ে মাঝরাতে এই জনশূন্য প্রান্তরে ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে?’’

— ‘‘খুনগুলো যদি ও-ই করে থাকে?’’ থমথমে গলায় বলে ভূমি।

— ‘‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’’ ধমকে ওঠে অভিজিৎ, ‘‘ওইটুকু বয়সের একটা বাচ্চার পক্ষে খুন করাই অসম্ভব, তার উপরে আবার গলায় কাঁচি ঢুকিয়ে। আমাদের ভুল হচ্ছে কিছু।’’

সামনে তাকায় ভূমি। গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে নিজের মুখটা চোখে পড়ছে তার। বুকের মধ্যে জড়ানো আছে পাপড়ির মাথাটা। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে মুখ ফেরায় পাপড়ি, আয়নার দিকে তাকায়। মুখের কোণে একটা হাসি খেলছে তার, কিন্তু কে ও?

এক ধাক্কায় মেয়েকে দূরে সরিয়ে দেয় ভূমি। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে

ফিরে তাকায় পাপড়ির মুখের দিকে।

— "কী হল মা?" অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে পাপড়ি। একটা কান্নার দমক এসে কাঁপিয়ে দেয় ভূমিকে। একটা হাতে নিজের চুল চেপে ধরে। আবার মেয়েকে দু-হাতে চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কিছু একটা হচ্ছে অভি, সামথিং ইস হরিব্‌লি রং।"

এর মধ্যে আরও দু-বার ফোন করার চেষ্টা করেছে অভিজিৎ, কিন্তু কল কানেক্ট হচ্ছে না। ঘড়ঘড় আওয়াজটা হয়েই কেটে যাচ্ছে ফোনটা। সে পিছনে ফিরে বলল, "তোমার ফোনটা কাজ করছে?"

ভূমি ফোনটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কেঁপে উঠল সেটা। একটা কল আসছে, নম্বরের জায়গাটা খালি। সেটা খেয়াল না করে ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে কলটা রিসিভ করে কানে চেপে ধরে অভিজিৎ। তার বুকের ভিতরে জমাটবাঁধা ভয়টা কয়েক ধাপ বেড়ে যায়। একটা মেয়েলি গলায় চিৎকার ভেসে আসছে ফোনের ভিতর থেকে, যেন কোনও বাচ্চা মেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে সাহায্য চাইছে কারও কাছ থেকে।

— "কে... কে বলছ... কে তুমি?" অভিজিৎ ডুকরে চিৎকার করে ওঠে। আর একটু একটু করে সেই আর্ত চিৎকার বদলে যায় মিহি হাসির শব্দে, বাচ্চা মেয়েটা আর ভয় পাচ্ছে না, এবার সে ভয় দেখাতে চায়।

ফোনটা লাউডস্পিকারে করে দেয় অভিজিৎ। ভূমি কান খাড়া করে শুনতে থাকে সেই হাসির শব্দ, কয়েক সেকেন্ড পরে থেমে যায় হাসিটা। তার বদলে এবার একটা চেনা নার্সারি রাইম পড়তে শুরু করে মেয়েটা, দম বন্ধ করে শুনতে থাকে ওরা, ফোনের ওপাশ থেকে একটানা খেলার ছলে পড়ে চলেছে মেয়েটা—

Mary Mary quite contrary–
How does your garden grow.
With silver bells and cockle shells
And pretty maids all in a row.

স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণ। এই চারটে লাইনই খারাপ হয়ে যাওয়া ক্যাসেটের

মতো বারবার পড়ে চলেছে মেয়েটা। ফোনটা হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় ভূমি। ডুকরে-ওঠা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। অভিজিৎ অবাক হয়ে বলে, "এটা তো একটা বাচ্চাদের রাইম! মানে কী এসবের?"

— "এই রাইমটা বাচ্চাদের নয়।" মাথায় হাত রেখে বলতে থাকে ভূমি, "মেরি টুডর ছিলেন হেনরি এইটের মেয়ে। পরে ইংল্যান্ডের রানি হন। প্রচুর নিরপরাধ প্রজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন বলে 'ব্লাডি মেরি' বলা হত তাঁকে। মাথার কিছু সমস্যা ছিল। একটার পর একটা খুন করে তাদের সমাধিস্থ করতেন। সেখান থেকেই How does your garden grow. সিলভার বেল আর কক্‌ল শেল দুটোই টর্চার ডিভাইজ। প্রিটি মেইডস অল ইন আ রো, মানে খুনের আগে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা তার ভিকটিমরা। এই রাইমটা মেরি টুডরকে নিয়ে।"

— "কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?" হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অভিজিৎ।

— "আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।" কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে ভূমি।

নিস্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়। একটু আগের ঢিমে হাওয়াটার জোর এখন আরও খানিকটা বেড়েছে। গাড়ির ভিতরে জ্বলন্ত নীলচে আলোয় শুধু তিনটে মানুষের চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ক্রমশ পাপড়ির একটা হাত উঠে আসে সামনের দিকে। আঙুল দিয়ে কিছু একটা যেন দেখাতে চায় সে।

— "বাবা... ওই যে..."

আঙুল লক্ষ্য করে গাড়ির সামনে তাকায় অভিজিৎ। বাইরে বাতিস্তম্ভের আলোয় যেটুকু হলদে কুয়াশা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে গাড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের শরীর, শিশু। তার গায়ে একটা সাদা রঙের হাঁটু অবধি ফ্রক। ফ্রকের নীচ থেকে বেরিয়ে থাকা দুটো পায়ে অসংখ্য কাটাকুটি দাগ। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা আছে একটা কাঁচি, বারবার কাঁচির দুটো ফলাকে খুলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে সে। ধাতব একটা আওয়াজ ভেসে

আসছে সেটা থেকে।

বিড়বিড় করে কিছু একটা আওড়াতে শুরু করেছে ভূমি, অভিজিৎ ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল তুলে ধরে ইশারায় চুপ করতে বলে।

— "আমি দেখছি। যা-ই হয়ে যাক, তোমরা গাড়ি থেকে বেরিয়ো না।"

— "তুমি... বাইরে যেয়ো না প্লিজ..."

— "এখানে বসে লাভ হচ্ছে কিছু?"

ভূমি আর কিছু বলে না। অভিজিৎ বাইরে বেরিয়ে এসে মৃদু শব্দে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ধীরপায়ে এগিয়ে যায় মেয়েটার দিকে। তার দৃষ্টি মেয়েটার কাঁধ অবধি নেমে আসা চুলের উপরে স্থির।

— "কে তুমি? কী চাও?"

গলা ধরে এসেছে অভিজিতের। কোনও উত্তর এল না। শুধু একটানা সেই কাঁচির কচকচ শব্দ। আর-একটু এগিয়ে গেল অভিজিৎ।

এবারে মেয়েটার পা দুটো সচল হয়ে উঠল। পিছন ফিরেই সামনের দিকে হাঁটতে লাগল সে। হলদে আলোর কুয়াশাটা ছেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে অভিজিতও এগোতে লাগল পায়ে পায়ে। কিছুক্ষণের জন্যে গাড়িতে বসে-থাকা দুটো মানুষের কথা ভুলে গেল সে।

মেয়েটা কি কিছু দেখাতে চাইছে? কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে?

কয়েক পা এগোতেই কিন্তু দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল তার। মেয়েটা কুয়াশা পেরিয়ে প্রায় অন্ধকারে মিশে গেছে। আরও ঝাপসা হয়ে আসার আগেই পকেট থেকে ফোনটা বের করে আলো জ্বালানোর চেষ্টা করল অভিজিৎ, জ্বলল না। তবে কি হারিয়ে যাবে মেয়েটা?

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ে গেল পকেটে সিগারেট জ্বালানোর জন্যে দেশলাই আছে। চকিতে সেটা বের করে আলো জ্বালাল অভিজিৎ। খয়েরি শিখা জ্বলে উঠে সামনের কিছুটা অংশ ভরে দিল ফিকে আলোয়। সামনের রাস্তা ফাঁকা— কেউ নেই সেখানে।

দেশলাইটা আর একটু তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে কবজির কাছে একটা আলগা হাতের স্পর্শে হাত থেকে দেশলাই ছিটকে

পড়ল তার। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাটির উপরে বসে পড়ল সে। পরমুহূর্তে আতঙ্কিত চোখে লক্ষ করল যতটা পথ সে গাড়ি থেকে এগিয়ে এসেছে সেই সমস্ত পথ জুড়ে একটা তরলের রেখা এগিয়ে এসে মিশেছে পায়ের কাছে। গন্ধটা চিনতে পারল। ছিটকে-পড়া দেশলাই থেকে নির্গত আগুনের ঢেউ সেই তরলের রেখা ধরে এগোচ্ছে গাড়ির দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটি থেকে উঠে দৌড়োতে শুরু করল সে।

তাকে দৌড়ে আসতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাকি দু-জন। ভূমি আর পাপড়ির হাত ধরে একটা টান দিল অভিজিৎ, "পালাও এখান থেকে গাড়িটা বার্স্ট করবে।"

কয়েক সেকেন্ড কাটার আগেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ঝরে-পড়া পাথরের মতো রাস্তার ঢাল বেয়ে ঘাসের জমির উপরে নেমে এল ওরা। আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক বজ্রপাতের মতো শব্দে কাঁপিয়ে দিয়ে আগুনের গর্ভে তলিয়ে গেল গাড়িটা। যেন মাটির তলা থেকে হাত বাড়িয়ে লেলিহান শিখা গ্রাস করল সেটাকে। গোটা রাস্তাটা ভরে গেল ক্ষণিকের আলোয়। সেই আলোয় চোখে পড়ল, জ্বলন্ত গাড়িটার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা মেয়েটি। হাতে এখনও ধরা আছে কাঁচি। চোখের পলক পড়তেই মিলিয়ে গেল সে। ছাইয়ের গন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

— "কেন এরকম করছে? কী চায় ও?" কান্না-মাখানো গলায় চিৎকার করে উঠল ভূমি। পাপড়িকে নিজের পাশে টেনে নিল অভিজিৎ। ভূমির মোবাইল ফোনটা গাড়ির ভিতরেই ছিল। সেটার সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মাঠের উপরে এসে পড়ায় কিছুটা আঘাত লেগেছে পাপড়ির মাথায়। হাত দিয়ে জায়গাটা ঘষতে থাকে সে। এতক্ষণ ভয়ে খুব বেশি কথা বলতে পারেনি সে। একটা আচ্ছন্ন ভাব গ্রাস করছে তাকে।

— "উই হ্যাভ টু নো হোয়াট শি ওয়ান্টস।" নিজের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে নেয় অভিজিৎ। একটু আগের নিউজ আর্টিকলটা আবার মেলে ধরে চোখের সামনে। গত দু'বছরে মোট তেরোজন খুন হয়েছে এইভাবে। আর্টিকলের সঙ্গে ভিকটিমদের নাম আর পরিচয়ের একটা ছোটো

তালিকা দেওয়া আছে। সেটায় চোখ বুলোতে গিয়েই থমকে যায় অভিজিৎ। ভূমির আরও কাছাকাছি সরে এসে ফোনটা তুলে ধরে সে বলে, "একটা প্যাটার্ন লক্ষ করেছ? বারবার মেয়েটা তাদেরই খুন করেছে যাদের সঙ্গে বাচ্চা ছিল। দ্যাখো..."

দ্রুত মেলাতে থাকে ভূমি, হ্যাঁ... মাঠের উপর যতবার কারও লাশ পাওয়া গেছে ততবার সেই লাশের মধ্যে একটা না একটা বাচ্চা ছিল।

— "এবং বাচ্চাটাকেই খুন করা হয়েছে সবার আগে... ওঃ গড!" পাপড়িকে প্রায় কোলের উপরে টেনে নেয় ভূমি— "pretty maids all in a row, খুনগুলো সে একসঙ্গে নয়, একটা সিকোয়েন্সে করে। যার বয়স সব থেকে কম, তাকে সবার আগে..."

— "মানে ও যতক্ষণ সেফ আছে, আমাদের ভয়ের কিছু নেই।"

— "কিন্তু কতক্ষণ?"

ঘাসের উপরে একটা পায়ের আওয়াজ হতেই উঠে দাঁড়াল অভিজিৎ। মোবাইলের আলোটা জ্বেলে মাঠের একটা বিশেষ জায়গায় তাকাল। চোখ দুটো ছোটো হয়ে এল তার। ঘাসের জমির উপরে একটা ছোট গর্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। সেটার দিকে এগোতে এগোতে অভিজিৎ বলে, "এই মেরি টুডর ব্যাপারে আর কী জানা যায়?"

চোয়াল শক্ত করে ভূমি বলে, "তেমন কিছু না। শেষ বয়সে এসে ওভারিয়ান ক্যানসারে মারা যান।"

— "ছেলেমেয়ে ছিল না কিছু?"

— "না, সেটাই আশ্চর্যের।" ভূমি একটু ভেবে বলতে থাকে, — "সারাজীবনে দু-বার তাঁর শরীরে প্রেগন্যান্সির সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, একবারও সন্তান জন্মায় না।"

গর্তটার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যায় অভিজিৎ। ভূমি একটা হাতে পাপড়িকে আগলে রেখে এগোতে এগোতে বলে, "মাঝবয়স থেকে ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শোনা যায়, গোপনে নাকি তন্ত্রসাধনা শুরু করেন তিনি। ডেভিল ওরশিপিং।"

গর্তটার ধারে গিয়ে তার ভিতরে ঝুঁকে পড়ে অভিজিৎ। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। ভিতরে আলো ফেলে সে দেখে একটা ঢালু দেওয়াল গর্তের ভিতরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। মুখটা গর্তের আর-একটু কাছে নিয়ে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে সে। খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ আসছে গর্তের ভিতর থেকে। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে একটানা।

— "আর্টিক্‌লে এই গর্তটার কথাই বলা আছে মনে হয়। এটা খুঁড়তে গিয়েই প্রথম খুনগুলো হয়।" অভিজিৎ মাথায় একটা হাত রেখে বলে।

— "হয়তো এর ভিতরেই কিছু একটা ছিল।" ভূমি গর্তটার দিকে চেয়ে বলে।

— "তুমি ওকে চোখে চোখে রাখো, আমি নিচে যাচ্ছি।"

— "নীচে! কেন? ওর ভিতরে কী আছে, কেউ জানে না।"

— "সেইজন্যেই যাচ্ছি। এই শয়তানের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব না আমরা। একমাত্র উপায় হল, এ কী চাইছে, সেটা বোঝা।" এগিয়ে এসে ভূমির কাঁধে একটা হাত রাখল সে,— "চিন্তার কিছু নেই। পাপড়ি যতক্ষণ ঠিক আছে, আমাদের কিছু হবে না।"

মাথা নেড়ে কিছুটা পিছিয়ে এল ভূমি। ঘাসের উপরে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল। মাথার ভিতর সমস্ত চিন্তাভাবনা গুলিয়ে গেছে তার। আজকের এই ভয়াবহ রাতে তাদের সঙ্গে পাঁচশো বছর আগে তৈরি হওয়া একটা ছড়া কোনওভাবে জড়িয়ে গেছে। এর হাত থেকে বাঁচার কি কোন উপায় নেই?

আপাতত দু-হাতের মাঝে মেয়েকে আগলে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। মেয়েটা ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। মাটির উপরে বসে গর্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ভূমি।

অন্ধকার হাতড়ে কিছুটা নেমে আসতে অভিজিতের মনে হল, মাটির একটা বিশেষ জায়গায় এসে পা আটকে যাচ্ছে তার। উপরে তাকিয়ে বেশ কিছুটা আকাশ দেখতে পেল। তার মানে গর্তটার মধ্যে বেশিদূর নামেনি।

আর যাই হোক গর্তটা ভৌতিক না। মানুষের হাতেই তৈরি হয়েছে সেটা।

কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে অভিজিতের মনে হল মাটির দেওয়ালের ওপাশ থেকে কার গলার আওয়াজ আসছে। সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ভাষাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবে ইংরেজির সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। একটা মহিলাকণ্ঠ।

চমকে পিছিয়ে এল অভিজিৎ, মাটিতে যেন পা আটকে গেল তার। নিচের দিকে আলো ফেলে চকচকে কিছু চোখে পড়ল— নীচু হয়ে জিনিসটা ভালো করে দেখতে পেল সে। মাটির ভিতর গেঁথে আছে একটা কালচে ধাতুর তৈরি কাঁচি। দেখে বোঝা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সেখানেই পড়ে আছে।

একটা দিক চেপে ধরে সজোরে টান দিতে মাটি থেকে উঠে এল কাঁচিটা। অসম্ভব ভারী। মৃত শরীরের মতো ঠান্ডা স্পর্শ অভিজিতের হাড় কাঁপিয়ে দিল। হাতের পেশি থেকে সমস্ত জমাট বাঁধা শক্তি যেন টেনে নিতে লাগল কাঁচিটা। অভিজিতের মনে হল, বহু দূর থেকে কিছুর আওয়াজ ভেসে আসছে। যেন মাটির তলার গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে।

তার চোখের সামনে জমাট অন্ধকার চিরে আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে, সাদা কুয়াশার মতো ছেঁড়া ছবি চোখে পড়ছে। সেই কুয়াশার ভিতরে আবছাভাবে ফুটে উঠছে একটা ছায়ামূর্তি— মেরি টুডর। মেরি টুডরকে চিনতে পেরেছে সে। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে দ্যাখে একটু আগে যে কাঁচিটা তার নিজের হাতে ধরা ছিল সেটা এখন মহিলার হাতে। লোলুপ দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক স্বরে কী যেন মন্ত্র পড়ে চলেছেন মহিলা। একটা সদ্যোজাত শিশু শুয়ে আছে তার পাশে—হাসছে। সে হাসিটা দেখে অভিজিতের রক্ত জল হয়ে যায়। এত নারকীয় হাসি একটা শিশুর মুখে ফুটতে পারে?

শিশুর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে একটা কালো ধোঁয়া ঘিরে ধরছে কাঁচিটাকে। চোখ তুলে অভিজিতের দিকে তাকিয়ে কাঁচিটা এগিয়ে দেন মহিলা। চমকে পিছিয়ে আসে সে। সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা মিলিয়ে যায়।

অভিজিৎ বুঝতে পারে, কোনও অলৌকিক শক্তি সংকেতে কিছু বলতে চাইছে তাকে, দেখাতে চাইছে কয়েকশো বছর আগের কোনও দৃশ্য।

আগের ছবি মুছে গিয়ে দূর থেকে এগিয়ে-আসা হর্স ক্যারেজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখন। তার পাশে ফুটে উঠছে একটা মাঠ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই চলমান ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

এতক্ষণে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজটা আরও বেড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অঝোর ধারায় বৃষ্টির শব্দ। ঘনঘন বাজ পড়ছে। অভিজিৎ অবাক হয়ে দ্যাখে, তার চোখের সামনে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ মাঠ। একটু আগে যে মাঠের উপরে তাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এখন সেই মাঠটাই ফিরে গেছে দু-শো বছর আগে। রাস্তাটা উধাও হয়েছে। বৃষ্টির জলে ডুবে ঘাসগুলো দেখা যাচ্ছে না। মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়ার গাড়ি। মুহুর্মুহু বজ্রপাত হচ্ছে খোলা মাঠের উপরে। চালক থামছে না। যত দ্রুত সম্ভব পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে।

অভিজিতের বুক কাঁপিয়ে একটা আকাশচেরা বিদ্যুতের ঝলক আছড়ে পড়ল ঘোড়াগুলো থেকে মিটার দশেক দূরে। আতঙ্কে দিশহারা হয়ে গেল সামনে বাঁধা ঘোড়া দুটো। গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ল বেশ কিছুটা দূরে। পরপর আরও কয়েকটা বজ্রপাত। চুরমার হয়ে গেল কাঠের ক্যারেজটা। দু-চারটে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ এসে পড়ল মাটির উপরে। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ভারী কিছু একটা ছিটকে এল অভিজিতের দিকে। মুখ বাঁচাতে একটা হাত বাড়িয়ে জিনিসটা ধরে ফেলল সে।

বৃষ্টির আওয়াজ থেমে গেছে। ঘোড়ার গাড়িও রাতের স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেছে তার সামনে। চোখ বন্ধ করেও অভিজিৎ বুঝতে পারল, রাত আবার শান্ত হয়ে আসছে। আবার ঝিঁঝির ডাক কানে আসছে। ত্রিমাত্রিক সিনেমার মতো অতীতের দৃশ্য শেষ হয়ে আবার ফিরে এসেছে বর্তমানে।

— "কী হল তোমার? সাড়া দিচ্ছ না কেন?" উপর থেকে ভূমির চিৎকার ভেসে এল।

তার উত্তর না দিয়ে হাতের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে অভিজিৎ দেখল, এখনও তার হাতে ধরা আছে সেই কাঁচিটা। মেরি টুডরের কাঁচি। সেই কাঁচি, যার ভিতরে তিনি বন্দি করে রেখেছিলেন নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে। দু-শো

বছর ধরে এই মাঠের মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল কাঁচিটা।

সব প্রশ্নের উত্তর এখন জলের মতো পরিষ্কার অভিজিতের কাছে। অতীত তার রহস্যের আগল ভেঙে চোখের সামনে উজাড় করে দিয়েছে সব কিছু। কাঁচিটা মাটির উপরেই ছুড়ে ফেলে সে ঢাল বেয়ে আবার উপরের দিকে উঠে আসতে থাকে। আতঙ্কে ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে তার। একটু আগে যে দৃশ্য সে দেখেছে তা আর ভুলতে পারবে না কোনওদিন। মাটি লেগে সমস্ত শরীর ভরে উঠেছে এতক্ষণে। বাইরে ছাইয়ের গন্ধ মাখা বাতাস শনশন করে বয়ে চলেছে গর্তের উপর দিয়ে।

গর্তের বাইরে মুখ বাড়িয়েই ছিল ভূমি আর পাপড়ি। তাকে উঠে আসতে দেখে ভূমি উদ্‌বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, "কী হল? কী আছে নীচে?"

কথার উত্তর দিতে দিতেই ঝলসে যাওয়া গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড়োতে থাকে অভিজিৎ, — "যেভাবেই হোক এই গর্তটা বুজিয়ে ফেলতে হবে আমাদের।"

— "কিন্তু কেন?"

ঘুরে দাঁড়ায় অভিজিৎ, "এই গর্তটা খোঁড়ার পর থেকেই খুনগুলো শুরু হয়েছে এখানে।" কথাটা বলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফেরে সে— "গর্ত খোঁড়ার আগে মাটির নীচে এমন কিছু ছিল, যা গর্ত দিয়ে উপরে উঠে এসেছে... তার জন্যেই এতগুলো খুন..."

— "কী ছিল?"

ভূমির কাঁধে একটা হাত রেখে বলতে থাকে সে, "আজ থেকে দু-শো বছর আগে এই মাঠের ঠিক এই জায়গাটায় একটা ব্রিটিশ হর্স ক্যারেজ বাজ পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ক্যারেজের ভিতরে এমন একটি জিনিস ছিল, যা মেরি টুডরের সম্পত্তি। মেরি টুডর শয়তানের উপাসনা করতেন। শয়ে শয়ে মানুষকে নৃশংস হত্যা করেছিলেন। তাতেও রক্তপিপাসা মেটেনি তাঁর। নিজের গর্ভে দু-বার শয়তানকে ধারণ করার চেষ্টা করেন। সে সন্তানের শরীর ছিল না। শরীরহীন সেই আত্মাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে যান তিনি যাতে তার মৃত্যুর পরেও হত্যালীলা চালিয়ে যায় তাঁর সন্তান। সে জিনিসটাই এতকাল সভ্যতার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল মাটির নীচে।"

— "তার মানে আমরা যে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখছি সে..."

— "পিশাচ, ডেভিল অনেক নাম আছে। আমাদের ভাবার সময় নেই।"

খিল্‌খিল্ করে একটা হাসির শব্দে বাতাস ভরে ওঠে। মনে হয়, ওদের তিনজনকে ঘিরে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করছে বছর দশেকের বাচ্চা মেয়ে। মাঝে মাঝে তার সাদা ফ্রকের একটা অংশ অন্ধকারে ফুটে উঠছে।

— "কিন্তু সে এখানে এল কী করে?" ভূমি ভয়ার্ত চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে।

— "আমি জানি না। সব কিছু আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এটুকু জানি, নিজের মৃত্যুর পরেও তাঁর সন্তানকে, তাঁর রক্তলোভী সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মেরি। দু-শো বছর ইংল্যান্ডেই ছিল সেটা। কেউ বা কারা তাকে ভারতে নিয়ে আসে। তারা সকলেই মৃত, আজ আর জানার উপায় নেই। গাড়ির ডিকিতে একটা শাবল ছিল না?"

— "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা এতক্ষণে..."

— "ভাবার সময় নেই, যেভাবেই হোক পাপড়ির ক্ষতি হতে দিয়ো না তুমি। ও ঠিক থাকলে কিচ্ছু হবে না আমাদের।"

তিনজনে মিলে দৌড়ে যায় গাড়িটার দিকে। এখনও কোথাও কোথাও আগুন জীবন্ত আছে তার। রাস্তার হলদে আলোটা এখনও আগের মতোই জ্বলছে। সেটাকে ঘিরে জমে থাকা ধোঁয়ার বাষ্প আর কুয়াশা অবিচ্ছেদ্য মায়াজালের সৃষ্টি করেছে।

পাপড়ির চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে। ভূমি তাকে জোর করে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অভিজিৎ এতক্ষণে গাড়িটার প্রায় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি বার্স্ট করায় ডেকের পাল্লাটা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। তার ভিতরটা এখন অন্ধকার। পকেট থেকে ফোনটা বের করে আলো জ্বালানোর চেষ্টা করে অভিজিৎ।

পাপড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকায় ভূমি। কিছু একটা খটকা লাগে তার। ভুরু কুঁচকে সে বলে, "একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে। আমি যত দূর জানি, মেরি টুডরের দু-বার ফল্‌স প্রেগন্যান্সি হয়। একটা ভ্রূণ

যদি এখানে থাকে তাহলে দ্বিতীয়টার কী হল?"

— "জানি না..." অভিজিৎ উত্তরটা দিয়ে গাড়ির দিকে ফিরতে যাচ্ছিল, একটু থেমে গিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে, "গাড়িটা যদি তখন তোমাদেরকে নিয়ে বার্স্ট করত তাহলে তোমরা দু-জনেই একসঙ্গে মারা যেতে, সেক্ষেত্রে তো মেইডস ইন আ রো হত না... তাহলে?"

একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে আসে পাপড়ির অবসন্ন গলা দিয়ে, "বাবা, গাড়িটার ভিতরে কেউ আছে।"

থেমে যায় অভিজিৎ। পাপড়ির বুজে-আসা ক্লান্ত চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, "কে আছে?"

— "যে মেয়েটাকে দেখে তুমি গাড়ি থামিয়েছিলে..." থমথমে গলায় একটা ঢোক গিলে উচ্চারণ করে পাপড়ি। তার চোখ দুটো ঝলসে ওঠে।

— "আই ডোন্ট কেয়ার! ও আমাদের কোনও ক্ষতি..." বলতে গিয়ে থেমে যায় অভিজিৎ। ধীরে ধীরে পিছন ফিরে পাপড়ির মুখের দিকে তাকায় সে।

ভূমির চোখও ঘুরে গেছে সেইদিকে, বিড়বিড় করে একটা প্রশ্ন করে, "তুই তো ঘুমিয়ে ছিলি তখন। জানলি কী করে, বাবা কেন গাড়ি থামিয়েছিল?"

মুহূর্তে পাপড়ির মুখ থেকে আতঙ্ক আর ক্লান্তি মুছে গিয়ে একটা চেরা হাসি ফুটে ওঠে। কান ছুঁয়ে ফ্যালে হাসিটা। দুটো পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ফুলহাতা জামার হাতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা প্রাচীন কালো কাঁচি। সেটা সজোরে বসিয়ে দেয় ভূমির গলার ঠিক নীচে।

অভিজিতের পা দুটো এতক্ষণে অকেজো হয়ে এসেছে। সে একহাতে ডেকের পাল্লাটা তুলে ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে, সেখানে শুইয়ে রাখা আছে একটা দশ বছরের বাচ্চার ঝলসানো মৃতদেহ। তার গলার কাছে একটা সমূলে ঢুকে-যাওয়া কাঁচির দাগ... অর্থাৎ যে মেয়েটাকে এতক্ষণ ওরা পাপড়ি ভেবে ভুল করছিল, সে-ই মেরি টুডরের দ্বিতীয় ভ্রূণ!

কিন্তু কখন? পাপড়িকে তো একবারও কাছছাড়া করেনি ওরা। মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। মেয়েটা গাড়ির সামনে এসে পড়ায় ওরা দু-জনেই এসে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির সামনে। পাপড়ি একা ঘুমোচ্ছিল পিছনের সিটে। তারপর

থেকেই...

দূরের অন্ধকার থেকে আর-একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে চলে আসে পাপড়ির পাশে। অভিজিৎ পিছোতে গিয়ে বুঝতে পারে তার পায়ের উপর আর নিয়ন্ত্রণ নেই।

কাঁচি হাতে দুটো মেয়ে এগিয়ে আসে ওর দিকে। ওদের শিশুসুলভ গলায় একটা পুরোনো নার্সারি রাইম ফুটে উঠছে। রাতের খোলা হাওয়ায় মিশে ছড়িয়ে পড়ছে মাঠের উপরে

Mary Mary quite contrary–
How does your garden grow.
With silver bells and cockle shells
And pretty maids all in a row.



কুয়ো



আজ ঘুম থেকে উঠে আবার দেবায়নকে দেখতে পেলাম না। কাল ঘটনাটা ঘটতে খুব একটা আশ্চর্য হইনি। এ জায়গাটা ওর পরিচিত। ছেলেবেলার একটা বড়ো সময় কেটেছে ওর এখানে। ভেবেছিলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে নস্টালজিয়ার ঠেলাতেই বেরিয়ে পড়েছে স্মৃতিরোমন্থন করতে।

কিন্তু আজ সন্দেহটা আগে থেকেই ছিল মনে, আজও কি তবে...

বিছানা ছেড়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। ঘরের ভিতরটা এখন জানলা দিয়ে আসা রোদে ভরে আছে। সেই রোদের ভিতরে মিহি ধুলো ভিড় করে উড়ছে। লক্ষ করেছি, গ্রামের দিকে এলে রোদের ভিতরে ধুলোর পরিমাণটা বেড়ে ওঠে।

পরশু রাতে আমরা দু-জন এই সরঙে এসে উঠেছি। সরং পুরুলিয়ার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম। এমনিতে শহরে শীত আর অফিসে ক-টা দিনের ছুটি পড়লেই আমরা দু-জনে এদিক ওদিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি, এ বছরের মাঝামাঝি দেবায়ন বায়না ধরে যে এই বছর শীতে সরঙে না এলেই নয়। আমি গাঁইগুঁই করছিলাম। ওর এখানে ছোটোবেলার বছর পাঁচেক কেটেছে। ও যায় যাক, কিন্তু আমি এসে কী করব? দেখার মতো কিছুই নেই। অকারণেই একটা এঁদো গাঁয়ে দিন তিনেক কাটিয়ে যাওয়া।

দেবায়নের কিন্তু ওই এক গোঁ। কোথাও যদি যাওয়া হয় তাহলে ওই সরং। শেষমেশ রাজি হয়েছি।

চোখ-মুখ ধুয়ে দরজা খুলে বেরোতেই উজ্জ্বল রঙের **খেলায়** চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমাদের গেস্ট-হাউসটার সামনে যত দূর দেখা যায়, একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ছোটো ছোটো জংলি গাছ আর হলদে লতাপাতায় ভরে আছে জায়গাটা। গেস্ট-হাউস থেকে একটু এগিয়ে গেলেই মাটি নরম হতে শুরু করে, বোঝা যায়, কয়েক পা দূর থেকেই জলের রেখা শুরু হতে চলেছে।

এখন সেই অদৃশ্য জলরাশির উপরে সাদা আর খয়েরি রঙের পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করে আছে। মজার কথা হল, এদের মধ্যে কোনও পাখিই ডাকতে পারে না, ফলে এতগুলো জীবিত প্রাণীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারী নিস্তব্ধ হয়ে আছে জায়গাটা।

খানিকটা হেঁটে গেস্ট-হাউসের পিছনে আসতেই মাঠটা দেখতে পেলাম, তার সঙ্গে একটু চোখ ঘোরাতেই কুয়োটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ আটকে গেল আমার, কুয়োটার ঠিক পাশেই সাদা রঙের কী যেন পড়ে রয়েছে। ভালো

করে দেখতে না পেলেও মনে সন্দেহের রেশ রইল না। এই নিয়ে পরপর দু-দিন, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো।

কুয়োটা যেখানে মাটিতে এসে মিশেছে ঠিক সেইখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে দেবায়ন। আমি মৃদু ঠেলা দিলাম তাকে, "কী রে..."

সে একটু নড়ে উঠল, মুখ দিয়ে শব্দও করল, কিন্তু চোখ খুলল না।

— "কী হয়েছে বল তো তোর?"

আরও বার তিনেক ডাকাডাকির পর চোখ খুলে গেল। দু-এক সেকেন্ড চারপাশটা দেখে নিয়েই ধড়ফড় করে উঠে বসল সে।

— "আ... আমি এখানে..."

কাল এই নিয়ে বেশি প্রশ্ন করিনি আমি, ওর উত্তর দেওয়ারও খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, আজ কিন্তু চেপে ধরলাম, "রাতে কী হয় বলতো তোর? এখানে চলে আসিস কেন?"

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল দেবায়ন, উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাল রাতের কথা মনে আছে কিছু?"

— "ঠিক মনে পড়ছে না... মনে হয় রাতে..." জড়ানো গলায় বলল সে। পুরো কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল।

— "রাতে এখানে এসেছিলি কেন?"

— "কী জানি, মনে হল, কেউ ডাকছে..." থমথমে গলায় বলল দেবায়ন। অন্যসময় হলে ধরেই নিতাম, আমাকে ভয়ে দেখানোর জন্য মিথ্যে বলছে, কিন্তু এখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যিই ভয় লাগল আমার।

— "কে ডাকছিল?"

— "জানি না, এই কুয়োটার ভিতর থেকে..."

মুখ তুলে কুয়োটা দেখাল সে। আমি এই প্রথম ভালো করে তাকালাম সেটার দিকে। কুয়োটা যে পরিত্যক্ত, সেটা বাইরে থেকে একবার দেখেই বোঝা যায়। চারপাশ জুড়ে আগাছা জন্মেছে, মাটি ছাড়িয়ে উপরে উঠে কুয়োর গোটাটাই ঢেকে ফেলেছে তারা। তার ফাঁক দিয়েও বেশ বোঝা যায় কুয়োটা পাথরের। মাথার উপরে খোলা অংশটা সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা। স্ল্যাবের

কয়েকটা জায়গা এবড়োখেবড়ো হওয়ায় ছোটো ছোটো ফাঁক হয়ে আছে। ফাঁকের উপর চোখ রাখলাম আমি, অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

— "ছোটোবেলাতেও এমন হত জানিস... মনে হত, একটা মানুষ যেন বন্দি হয়ে আছে ওর ভিতরে। কোনও কোনও দিন রাতে অজান্তেই হেঁটে চলে আসতাম এখানে। সকালে মাঠে এসে কেউ দেখতে পেয়ে বাড়ি দিয়ে আসত আমাকে...

বাড়ির লোক যে কেন শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এবার বুঝতে পারছি।"

একটা হাত ধরে টেনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিই আমি, পিঠে একটা চাপড় মেরে বলি, — "কুয়োর ডাকের গল্প পরে হবে না হয়, এখন পেটের ডাকে সাড়া দেওয়া দরকার, সেই কার্তিক বলে ছেলেটার তো দেখা নেই..."

আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল দেবায়ন, মুখ থেকে থমথমে ভাবটা গেল না ওর, — "কেন চলে এলাম বল তো রাতে? কে ডাকছিল?"

— "আমার মনে হয়, ঘুমের ঘোরে কিছু স্বপ্ন-টপ্ন দেখিস তুই।"

— "উঁহুঁ... পরপর দু-দিন একই স্বপ্ন দেখব? তা ছাড়া স্লিপ ওয়াকিং-এর হ্যাবিট নেই আমার।"

আর কিছু বললাম না। প্রসঙ্গটা আপাতত এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

গেস্ট-হাউসে পৌঁছোতে দেখলাম, কার্তিক টেবিলের উপরে সকালের চা দিয়ে গ্যাছে। দেবায়ন জামাকাপড় ছেড়ে পরিপাটি হয়ে চা নিয়ে বসল। মুখ থেকে চিন্তার ছায়া কিন্তু সরেনি এখনও।

আমি টোস্টে একটা কামড় বসিয়ে বললাম, "কাছাকাছি শুনলাম, একটা পাহাড় আছে, আজ দুপুরের দিকে যাবি নাকি?"

— "আমার শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না রে, মাথাটা ভার হয়ে আছে।"

— "সে কী! কাল রাতে তো দিব্যি ছিলি।"

অন্য কিছু বলার চেষ্টা করছিল দেবায়ন, থুতনিতে হাত রেখে কথাটা বদলে নিয়ে বলল, — "তোকে একটা কথা বলা হয়নি।"

— "কী কথা?" আমি এবার গোটা টোস্টটাই মুখে পুরলাম।

— "ওই কুয়োটার ভিতরে কেউ থাকে।"

— "অ্যাঁ?" আর-একটু হলে আমার মুখ থেকে খাবার ছিটকে বেরোত, কোনও রকমে সামলে নিয়ে বললাম, "তোর কি মাথাটা সত্যি গ্যাছে?"

— "একবর্ণ মিথ্যে বলছি না, একটা বাচ্চা, আমার মতোই বয়স ছিল তার। আমি ওর গলার আওয়াজ শুনেছি।"

টেবিলে চাপড় মারি আমি, "কোনও রাস্তার পাগলকেও এসব প্রলাপ বকতে শুনিনি আমি। কুয়োটা এত বছর ধরে পরিত্যক্ত, ওর ভিতরে সাপখোপও আছে কি না সন্দেহ, আর তুই বলছিস কিনা বাচ্চা..."

দেবায়ন মাথা নাড়ে, "তুই বুঝতে পারছিস না। কুয়োটার সঙ্গে যে অলৌকিক কিছু একটা জড়িয়ে আছে, সেটা আমি ছেলেবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুই চাইলে আমি প্রমাণ করে দেব।"

— "ইয়ারকিমারছিস আমার সঙ্গে? কী প্রমাণ করে দিবি? যে ওই কুয়োটার গভীরে একটা বাচ্চা থাকে?"

টেবিল থেকে উঠে পড়ে দেবায়ন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরায়। জলার একদিকে এখন পাখির সংখ্যা কমে এসেছে, নীলচে পরিষ্কার আকাশের বুকে সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে ইচ্ছেমতো। সেদিকে তাকিয়ে সে একটানা বলে যেতে থাকে, "অল্প বয়স আমার, ধর ওই আট কি নয়, বিকেল হলেই এই মাঠে এসে ফুটবল খেলতাম আমরা। আমি ছিলাম সব থেকে ছোটো, তাই উৎসাহ ছিল সব থেকে বেশি। একবার পায়ে বল পড়লে আর দিগ্‌বিদিগ খেয়াল থাকত না। সে সময় কুয়োর উপরের ঢাকনাটা লাগানো হয়নি। দৌড়োতে দৌড়োতে কখন কুয়োর একেবারে ধারে এসে পড়েছি, নিজেও বুঝিনি। টাল সামলাতে পারিনি, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। পিছন থেকে বন্ধুদের আর্তনাদ শুনতে পেলাম, বুঝলাম, কুয়োর ভিতরে পড়ে যাচ্ছি। মাটিতে এসে পড়তেই মাথাটা ঠুকে গেছিল। কিন্তু জ্ঞান হারাইনি। দৃষ্টিটা একটু আবছা হয়ে গেছিল এই যা..."

কথাগুলো বলে একটু দম নিল দেবায়ন, জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর উপরে উঠলি কী করে?"

— "বন্ধু বান্ধবরাই বড়োদের ডেকে এনেছিল, ওরা একটা লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে দেয় ভিতরে, আমি ওটা ধরেই উঠে আসি।"

— "কিন্তু এর সঙ্গে কুয়োর নীচে বাচ্চার..."

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দেয় দেবায়ন, গল্প এখনও শেষ হয়নি, সে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বাকি গল্পটুকু বলতে থাকে, "যতক্ষণ ভিতরে ছিলাম, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম, মনে হচ্ছিল কুয়োর একেবারে তলায় অনেকগুলো দরজা আছে। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেওয়ালে আঁকা একটা ছবি দেখতে পেয়েছিলাম...

— "দেওয়ালে আঁকা ছবি? কুয়োর ভিতরে! বলিস কী!"

— "হ্যাঁ... বাচ্চারা যেমন আঁকে? কৌতূহল হতে আমি ওটার উপর হাত রাখতেই কী হয়ে গেল... কারা যেন ঘোরাঘুরি করছিল আমার চারপাশে, ফিশফিশ করে কিছু বলছিল, আমারই বয়সি একটা বাচ্চার গলা। ছেলে না মেয়ে জানি না, গম্ভীর, অথচ কী মিষ্টি!"

লক্ষ করলাম, দেবায়নের চোখ দুটো শূন্যে হারিয়ে গ্যাছে। কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে সে আবার বলতে থাকে, "তারপর থেকে সারাক্ষণই মনে হয় যেন কুয়োর ভিতর থেকে কেউ ডাকছে আমাকে, কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, নীচে নামলেই দেখতে পাব তাকে... কিন্তু সাহস হত না কিছুতেই... মাঝে মাঝে সন্ধে হয়ে গেলে, মা-বাবাকে লুকিয়ে ছুটে চলে আসতাম এই কুয়োটার সামনে... একটানা তাকিয়ে থাকতাম ওই অন্ধকারের ভিতরে, যদি একবার দেখা যায় তাকে... যদি একবার ওই অন্ধকারের বুক থেকে উপরে উঠে আসে সে..."

চাপা উত্তেজনার স্রোত বইছে দেবায়নের গলার ভিতরে। বাতাসে কান পাতলাম আমি, দূর থেকে ভেসে-আসা কোনও ডাক শোনা যাচ্ছে কি? ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—"দিনের পর দিন বেড়ে উঠছিল কৌতূহলটা, নিজের মধ্যে এমন আকুতি তার আগে কোনওদিন অনুভব করিনি আমি। কুয়োর পাশে পড়ে-থাকা পাথর তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলতাম ভিতরে... সেই পাথরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম

ভিতর থেকে... কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসতাম... এরকমই একদিন সন্ধে নেমে গ্যাছে, স্কুলে পরীক্ষার খাতা বেরিয়েছে সেদিন, রেজাল্ট ভালো হয়নি, মাঠে খেলতে গিয়ে অনেকখানি কেটে গ্যাছে পায়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই এসে দাঁড়িয়েছি কুয়োটার সামনে। মনটা ভারী খারাপ হয়েছিল। একদৃষ্টে কুয়োটার অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আছি, চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল নীচের অন্ধকারে, এমন সময় মনে হল, কে সরে গেল নীচ থেকে।"

— "বলিস কী!" আমি মুখ তুলে বললাম।

— "এতটুকু মিথ্যে বলছি না আমি, খচ্‌খচ্ করে একটা আওয়াজ হচ্ছিল। মনে হল, কুয়োর দেওয়াল বেয়ে সে উপরে উঠে আসতে চাইছে আমার কাছে। তারপর থেকেই ভয় ধরে গিয়েছিল ভিতরে। আর যাইনি কোনওদিন।"

আমার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে একটা হাত রাখল ও, "তুই আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছিস না, তাই না?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, — "তুই এই কুয়োটার জন্যেই এতদিন পর সরঙে এসেছিস?"

উপরে নীচে মাথা নাড়ে দেবায়ন। আমি একটু সময় নিয়ে বললাম, "বেশ, গল্প একটা আছে, তার সত্যি-মিথ্যেও যাচাই করা যাবে।"

— "কীভাবে?"

— "কার্তিককে বললে একটা বড়ো দড়ি জোগাড় করে দিতে পারবে না?"

— "পারবে হয়তো, কিন্তু কী হবে দড়ি দিয়ে?"

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, "একবার ভিতরে নেমে দেখাই যাক না কী আছে..."

এতক্ষণের উদ্‌বেগটা কেটে যায় দেবায়নের মুখ থেকে, তার বদলে কয়েকটা ভয়ের রেখা খেলে যায়, "মানে বলছিস, আমরা ওর ভিতরে নেমে দেখব? যদি কিছু গোলমাল হয়?"

— "গোলমাল কীসের? যদি তেমন কিছু না থাকে তাহলে আবার উঠে আসব, অবশ্য সাপখোপ বা পোকামাকড়ের রিস্কটুকু নিতেই হবে।"

দেবায়ন নিমরাজি হয় বটে কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায়, একরাশ অজানা দুশ্চিন্তা ঘিরে রেখেছে তাকে। থেমে থেমে হিসেব করে কথাবার্তা বলছে।

দুপুর থেকে শরীরটাও খারাপ হতে থাকে ওর। জ্বর নেই বটে কিন্তু হাত-পা প্রচণ্ড দুর্বল। খাওয়া-দাওয়াও করেনি। কার্তিককে বলা ছিল, বিকেলের আগেই একটা মিটার দশেক লম্বা দড়ি রেখে গ্যাছে ঘরের এককোণে। একটু অবাক হয়েছে ছেলেটা।

মুশকিল হল দেবায়নকে নিয়ে। বিছানা থেকে নামার ক্ষমতা নেই, এদিকে জেদ আছে ষোলোআনা। যেভাবে হোক আজই কুয়োর ভিতরে নামতে হবে তাকে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক, এই অবস্থায় যদি দড়ি ধরে কোনওরকমে নামতেও পারে, উঠে আসার সময় হাতে জোর না পেলে এক কাণ্ড হবে। অনেক বোঝানোর পর শেষে ঠিক হল যে সে ঘরেই থাকবে। আমিই নেমে দেখে আসব কুয়োর ভিতরটা। সঙ্গে মোবাইল থাকবে, তাতে করে কিছু ছবি তুলে আনব ওর জন্য।

(দুই)

গ্রামের দিকে লোকজন সন্ধে হলেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। গেস্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে যখন মাঠের উপর পৌঁছোলাম তখন মিহি শীতের কুয়াশা নেমেছে। পায়ের নীচের ঘাসগুলো শিশিরে ভিজে গ্যাছে। হাতে বড়োসড়ো দড়িটা ঝুলিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

দূরে মাঠ আর ঘরবাড়ি পেরিয়ে দিগন্তরেখার কাছে দৈত্যের মতো জেগে-থাকা কিছু গাছ চোখে পড়ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন বিশেষ একটা ইঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে তারা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে কুয়োটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। দড়িটা মাটিতে বিছিয়ে রেখে দুটো হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে সরিয়ে ফেললাম সিমেন্টের স্ল্যাবটা। ভারী শব্দ করে মাটির উপর এসে পড়ল সেটা। দড়িটা শক্ত করে

বেঁধে ফেললাম স্ল্যাবটার সঙ্গে।

পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বড়ো করে নিশ্বাস নিলাম। বুকের ভিতরটা কেন জানি না শুকিয়ে যাচ্ছে। মন বলছে, ভিতরে কিছু নেই, তা-ও একটা চাপা অস্বস্তি বারবার এসে গ্রাস করছে আমাকে।

আকাশ ঝকঝকে। একচিলতে মায়াবী রুপালি চাঁদ উঠেছে আজ। মাঝ-আকাশে থমকে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

কুয়োর প্রান্তের উপরে বসে দড়িটা শক্ত করে চেপে ধরলাম আমি। তারপর দুটো পা ঝুলিয়ে দিলাম শূন্যে। কত গভীর হবে কুয়োটা? দেবায়নের আন্দাজে মিটার পনেরোর বেশি নয়। একটু একটু করে নীচে নামতে লাগলাম।

কুয়োর ভিতরের দেওয়ালে পা রাখার মতো খাঁজ আছে মাঝে মাঝে। সেগুলোতে পা আর দড়িতে হাত রেখে কিছুটা নীচে নেমে আসতে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, পায়ের নীচে আর দড়ি নেই। অর্থাৎ প্রায় দশ মিটার নেমে এসেছি। ছোটো একটা লাফ দিয়ে চোখ বুজে নিলাম।

পায়ে সজোরে একটা ধাক্কা লাগতে বুঝলাম নীচে এসে পড়েছি। মাটির উপরের আওয়াজ কমে এসেছে এখানে। পোকামাকড়ের শব্দ প্রায় শোনা যাচ্ছে না। কোমরে জড়ানো ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে জ্বাললাম, কুয়োর ভিতরের দিকের দেওয়ালটা মাকড়সার ঝুলে ঢাকা, এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে ঝুলগুলো সরাতেই দেওয়ালের একটা অংশে চোখ আটকে গেল।

হ্যাঁ, সত্যিই লালচে রঙের শুকনো কালির রেখায় একটা মানুষের ছবি আঁকা আছে সেখানে। ঠিক যেন একটা বছর দশেকের বাচ্চা কাঁপা-কাঁপা হাতে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে দেওয়ালে। টর্চটা বাঁহাতে ধরে ডান হাত দিয়ে সেটার মাথার কাছটা স্পর্শ করতেই মাথাটা দুলে উঠল আমার। যেন মিষ্টি গন্ধের পারফিউমের বোতল হঠাৎ খুলেছে কেউ। উপরে তাকাতে মনে হল, গোটা আকাশটা যেন কুয়োর খোলা মুখের উপরেই নেমে এসেছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো একটা তরঙ্গ খেলে গেল আমার শরীরে। কুয়োর গোল দেওয়ালটা যেন চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। মাটির তলায় লুকোনো একটা বিরাট হলঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছি।

বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে যা দেখছি, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথা থেকে আবছা হলদে আলো ভেসে এসে ভরিয়ে তুলেছে আমার চারদিক। খেয়াল করলাম, আমার চারপাশের দেওয়াল জুড়ে সারি সারি ছবি খোদাই করা। যেন কুয়োর ভিতর থেকে এসে দাঁড়িয়েছি কোনও এক আদিম গুহায়। কলকল করে বয়ে-যাওয়া জলের শব্দ। কান পাতলে শোনা যায়, তার মধ্যে মিশে আছে মানুষের গলার আওয়াজ। পৃথিবীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত কোনও খাদের ভিতর থেকে একযোগে আর্তনাদ করে চলেছে বহু মানুষ।

হতভম্বের মতো এগিয়ে দিয়ে দেখতে লাগলাম সেই গুহাচিত্রের সার, এ কোথায় এসে পড়েছি আমি? সত্যি কি একসময় মানুষ থাকত এখানে? যারা থাকত, তারাই বা গেল কোথায়?

হঠাৎ মনে হল, দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো নিছক আঁকিবুকি নয়, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে তার, তার থেকেও বড়ো কথা, একটা বিশেষ মানুষের ছবি যেন বারবার ফিরে এসেছে। দেওয়াল জুড়ে ছবির মাধ্যমে একটা গল্প ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন শিল্পী, পরপর প্যানেলগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে গল্পটা বোঝার চেষ্টা করলাম আমি... অনেকগুলো মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, তাদের ঠিক মাঝবরাবর একটা বড়োসড়ো গর্ত, সেই বিরাট গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছে তারা... তার পরের ছবিটায়...

পিছন থেকে মেয়েলি গলার শব্দ ভেসে আসতে আমি চমকে পিছন ফিরলাম, হাত থেকে ছিটকে পড়ল টর্চটা। টর্চটা তুলতে নীচু হতেই একটা নরম হাতের স্পর্শ আমার কাঁধ ছুঁয়ে গেল।

— "কে? কে এখানে?" চিৎকার করে উঠলাম।

মিহি ব্যঙ্গের হাসি শোনা গেল, "নিজেই এসেছ আমার কাছে, আবার জিজ্ঞেস করছ আমি কে?"

— "এখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না... কে তুমি?"

— "আমি তো বলিনি আমি মানুষ..." রিনরিনে বাঁশির মতো গলা।

— "তবে কী তুমি?"

কয়েক সেকেন্ড পরে উত্তর আসে, "গলা শুনে মনে মনে কিছু একটা ভেবে নাও, যা ভাববে, আমি তা-ই..."

গলাটা ঠিক কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না, মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে, আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে গন্ধটা...

এই কি তবে কুয়োর ভিতরে থাকে? আজ এতদিনে তার বয়সও বেড়ে গিয়েছে? হায় ভগবান! এ-ও কি সম্ভব?

— "কবে থেকে এখানে আছ তুমি?" আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলাম।

— "কয়েক লক্ষ বছর... কয়েক কোটিও হতে পারে, সময়ের হিসেব আমি আর বুঝতে পারি না..."

মেয়েটার গলা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা হল জুড়ে, আমি পিছিয়ে এসে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালাম, "কী করো তুমি এখানে?"

— "অপেক্ষা..."

— "কার?"

এবার আর উত্তর এল না, তার বদলে মৃদু একটা চাপ পড়ল আমার হাতে, "এসো আমার সঙ্গে।"

— "কোথায়?"

— "এসো-না..."

আমি আপত্তি করতে পারলাম না। সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল অজ্ঞাতের দিকে, তাকে দেখতে পাচ্ছি না, তার নিশ্বাসের শব্দ নেই। শুধু আঙুলে অনুভব করছি পেলব হাতের এক অমোঘ টান। সে টান উপেক্ষা করা যায় না...

কিছু দূর আসার পর দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আবার সেইরকম মিহি গলা শোনা গেল, "দ্যাখো, কী আছে তোমার সামনে..."

হাত থেকে কখন যেন আলগা হয়ে এসেছে টর্চটা। আমার ঠিক সামনে একটা নীলচে আলো ফুটে উঠছে এবার, নিরেট পাথরের দেওয়াল চোখে পড়ছে। তার উপরে আবার সেই আগের মতো ছবি আঁকা আছে, একটা-মাত্র ছবি, দু-জন মানুষকে পাশাপাশি আঁকতে চেয়েছে কেউ। তার মধ্যে একজন

পুরুষ, অন্যজনের মাথা থেকে নেমে এসেছে ঝালরের মতো চুল, আঁকাবাঁকা রেখায় ফুটে উঠেছে তার সরু চোখের কোণ, সে নারী, একটা হাত দিয়ে পুরুষটির আঙুল স্পর্শ করে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোথাও, যেদিকে তারা হাঁটছে, ঠিক সেইদিকে একটু দূরে অস্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়েছে একটা ফুল, যেন ওই ফুলটার দিকে পুরুষটিকে ডেকে নিয়েছে চলেছে নারীটি, ঠিক একটু আগে আমি চলেছিলাম যেভাবে...

— "আমি? আমার জন্য তুমি..."

এত লক্ষ বছর ধরে কি তবে আমার জন্যেই অপেক্ষা করে চলেছে সে? অন্ধকার এখনও ঢেকে রেখেছে তার মুখ, বাঁশির মতো গলায় গুনগুন করে শব্দ করছে সে। সেটা সুর না মন্ত্র, আমি বুঝতে পারলাম না।

— "আমার জন্য এত বছর অপেক্ষা করছ তুমি! কিন্তু কেন?"

— "জানি না কেন" খিলখিলিয়ে হাসতে শুরু করেছে মেয়েটি। অন্ধকার-জড়ানো দুটো হাত দিয়ে টানছে আমাকে। কোথায় নিয়ে যাবে?

তার অদৃশ্য শরীরের টান আমাকে আর স্থির থাকতে দিল না। হাতের টর্চটা সামনে তুলে ধরে আলো জ্বাললাম। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল উচ্ছল হাসির আওয়াজ...

কোথাও কেউ নেই...

কুয়োর ভিতরের সেই মাকড়সার ঝুলে ঢাকা গোল দেওয়ালের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ তুলে উপরে তাকালাম। প্রথমে দেখা সেই লালচে রেখার ছবিটা এখনও দেখতে পাচ্ছি দেওয়ালে, সেটা ছাড়া বাকি সব কিছু যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ? নাঃ, তা হতে পারে না, মাথার ভিতরে এখনও সেই সম্মোহনী কণ্ঠ বেজে চলেছে। হাতের আঙুলে এখনও লেগে আছে তার ছোঁয়া। এ স্বপ্ন নয়, কিছুতেই স্বপ্ন নয়।

দেওয়ালে আঁকা ছবিটার উপরে আবার হাত রাখলাম। একটু পিছিয়ে এসে জোর গলায় ডাক দিলাম, "কোথায় চলে গেলে তুমি?"

ফাঁকা কুয়োর ভিতরে ডাকটা প্রতিধ্বনিত হল। টর্চটা আবার চারদিকে

ফিরিয়ে খোঁজার চেষ্টা করলাম। মাকড়সার জালের ফাঁকে ফাঁকে কিছু গুল্মলতা আর বুনো ফুল ফুটেছে। আর কিচ্ছু নেই। সে হারিয়ে গিয়েছে।

ঝুলন্ত দড়িটা ধরে পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে উপরে উঠে এলাম আমি, এর মাঝে কতক্ষণ কেটেছে, জানি না। বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠের ঘাসে পা রাখতেই মনে হল অন্য একটা জগতে এসে দাঁড়িয়েছি, এ জগৎটা আমার নয়। উপরে তাকালাম। আকাশের সরু চাঁদটা এখন ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

দড়িটা গুটিয়ে নিয়ে গেস্ট-হাউসের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এক অদ্ভুত মোহাচ্ছন্নভাব এসে বার-বার পথ ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাকে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি গেস্ট-হাউসটা অথচ বার-বার অন্যদিকে চলে যাচ্ছি।

মনে হচ্ছে, এখনও অদৃশ্য কেউ হেঁটে চলেছে আমার পাশে। তার পায়ের শব্দ নেই, নিঃশ্বাসের শব্দও নেই... তবু সে আছে...

(তিন)

— "কিচ্ছু দেখিসনি!" অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায় দেবায়ন, "মানে দেওয়ালে কিছুই ছিল না?"

— "কে বলেছে, ছিল না? মাকড়সার ঝুল ছিল, চামচিকে ছিল, বাদুড় ঝুলে ছিল... কতবার তোর কথা জিজ্ঞেস করল..."

— "তার মানে আমি ভুল দেখেছিলাম?" বিড়বিড় করে বলল দেবায়ন। আমি একটু বাঁকা স্বরে বললাম, "তোর বিশ্বাস না হয়, নিজেই গিয়ে দেখে আসিস না হয় আজ, যদিও তোর শরীরের যা অবস্থা..."

— "নাঃ... অবিশ্বাসের কী আছে?" কথাটা বলে কনুইতে ভর দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। তারপর রুমের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়, সে বেরিয়ে যেতেই আমি সামনে রাখা ল্যাপটপটা অন করে নিই। মোবাইলটা তুলে নিয়ে বিশেষ একটা নম্বর ডায়াল করতে থাকি, ওপাশ থেকে ফোনটা

রিসিভ হয় "এত সকালে! কী ব্যাপার?"

— "আমি তোকে মেইলে কতকগুলো ছবি পাঠিয়েছি, ওগুলোর মানে বলতে হবে আমাকে।"

— "ছবির মানে! দাঁড়া, দেখছি।"

ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ শোনা যায় ওপাশ থেকে, কয়েকটা যান্ত্রিক শব্দ, প্রায় দু-মিনিট পর গলা ভেসে আসে "তুই তো পুরুলিয়া গিয়েছিলিস, ওখানে গুহা-টুহা আছে নাকি?"

— "জাস্ট টেল মি দ্য মিনিং..."

— "তুই এত চটছিস কেন? গিভ মি আ মোমেন্ট।"

নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকি আমি, বুকের ভিতরে চাপাস্বরে ড্রাম বাজাতে শুরু করেছে কেউ। সেটা চাইলেও উপেক্ষা করতে পারছি না।

— "এগুলো অনেকটা কেভ পেন্টিং-এর মতো। কিন্তু একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে।"

— "কীরকম ডিফারেন্স?"

— "আমি আজ অবধি যা কেভ পেন্টিং দেখেছি, সেগুলো আদিম মানুষের সূক্ষ্ম হাতের কাজ। এই ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে কোনওরকমে আঁকা। আদিম মানুষের জীবনে অত তাড়া ছিল না, স্ট্রেঞ্জ!"

— "মানে কী এগুলোর?"

— "মানে এরকম ইন্সট্যান্টলি বলা সম্ভব নয়, ছবিগুলো অনেকটা কার্টুন ফর্ম্যাটের। সঙ্গে কিছু সিম্বলও আছে। তবে সব মিলিয়ে যদ্দূর মনে হয়, একটা মেয়ের কথা বলা হচ্ছে।"

— "কীরকম মেয়ে?"

— "আই ডোন্ট নো, এনগ্রেভিংসগুলো তেমন স্পষ্ট নয়, তা ছাড়া আলোও কম, আর একটু ক্লোজলি দেখতে হবে, তুই এগুলো পেলি কোথায় বল তো?"

ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিলাম আমি, ওপাশ থেকে আবার গলা শোনা যায়, "দেয়ার ইজ সামথিং এলস..."

— "কী?"

— "যদি খুব ভুল না দেখে থাকি তবে এখানে একটা র‍্যাট্‌ল স্নেক আঁকা আছে, তিন নম্বর ছবিটার কোণের দিকে..."

— "র‍্যা... ট্‌ল স্নেক!" ছবিটা খুঁজে নিয়ে আমিও অবাক হয়ে যাই। একটা সাপের ল্যাজের ডগায় ঝুমঝুমি জাতীয় কিছু একটা বাঁধা আছে।

— "কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে র‍্যাটল স্নেকের সম্পর্ক কী?"

— "আমার মনে হয় সাপটা এখানে সিম্বলিক। র‍্যাট্‌লের ল্যাজের ডগায় যে ঝুমঝুমিটা বাঁধা থাকে, ওটা অন্য প্রাণীদের জন্য একটা ওয়ার্নিং হিসেবে কাজ করে, ওই ঝুমঝুমির শব্দ আসছে মানে কাছেপিঠে একটা র‍্যাটল স্নেক আছে, আমার মনে হয় র‍্যাট্‌ল স্নেক এঁকে কেউ ওয়ার্নিং বোঝাতে চেয়েছে... কিন্তু তুই..."

আর কিছু না বলেই ফোনটা কেটে দিলাম আমি। দেবায়ন চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকছে। আমার কাপটা সামনে রেখে সে বলল, "শরীরটা কালকের তুলনায় একটু চাঙ্গা লাগছে। কাল পাহাড়ে যাবি বলছিলি না? আজ দুপুরের দিকে বেরোব না হয়..."

— "তুই যাস, আমার একটু কাজ আছে..."

— "কাজ! এখানে আবার কী কাজ তোর?"

আমি জোর করে মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলাম, "দেখি, স্থানীয় লোকজনের থেকে একটু মহুয়া-টহুয়া জোগাড় করা যায় কি না... তোর তো আবার ওসব চলে না..."

দেবায়ন মাথা নাড়ে, "একা একা পাহাড়ে উঠে মজা নেই, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে গেলে এক কেলো হবে। একটা গাইড জোটাতে হবে।"

কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল সে, তারপর কিছু একটা লক্ষ করে বলল, "তোরও আবার জ্বর-টর হল নাকি?"

— "কেন বল তো?"

— "মুখ-চোখ বসে গেছে।" আমার কপালে হাত রাখল সে, "নাঃ, জ্বর তো নেই। তাহলে?"

আমি মুখ বাঁকালাম, "কাল থেকে ধকল কম গেছে নাকি? তার উপরে তোর জন্য আবার এই বয়সে কুয়োর মধ্যে নামতে হল। হাত-পা সব ব্যথা হয়ে রয়েছে... ভালো কথা...," আমি বাইরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "কাল রাতের দড়িটা আছে তো?"

— "কার্তিককে বলেছি সকালে, সন্ধ্যায় নিয়ে যাবে..."

— "না না।" আমি হাত তুলে বললাম, "আমরা যতদিন আছি, এখানেই না হয় থাক ওটা..."

আমার কথায় দেবায়ন একটু অবাক হল বটে কিন্তু আপত্তি করল না। মিনিট কুড়ি পরে সে জুতো পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি টানটান হয়ে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লাম। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, কিন্তু খিদে পাচ্ছে না আমার। কাল সারারাত ঘুম হয়নি অথচ এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করতে পারছি না। আশ্চর্য!

যতক্ষণ চোখ খুলে আছি, ততক্ষণ মনে হচ্ছে, ভিতর থেকে কেউ ডেকে চলেছে। কাল রাতে কুয়োর ভিতরে যার সঙ্গে পরিচয় হল আমার, সে কে? কয়েক লক্ষ বছর ধরে কেন সে অপেক্ষা করে চলেছে আমার জন্য, দেওয়ালে আঁকা ওই ছবিগুলোরই বা অর্থ কী?

ল্যাপটপ খুলে আবার ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল চাইলেও ছবিগুলোর উপর থেকে চোখ সরাতে পারব না আমি, একটানা তাকিয়ে আছি, চোখের পাতা পড়ছে না, বেশ বুঝতে পারছি, এতক্ষণ উজ্জ্বল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে চোখের শিরা-উপশিরা লাল হয়ে ফেটে পড়ার উপক্রম করেছে। জল পড়ছে অথচ শত চেষ্টা করেও চোখ সরাতে পারছি না।

হঠাৎ, একদলা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার সামনে। মনে হল, দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নেমে গিয়েছে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। কিন্তু ল্যাপটপের স্ক্রিনটাই বা নিবে গেল কী করে?

মন দিয়ে কান পেতে শুনতে পেলাম, ঘরের দরজায় আঙুলের টোকা পড়ছে। আমাকে দরজা খুলতে বলছে কেউ। দেবায়ন কি ফিরে এল?

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম আমি। বাইরেটাও ভিতরের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে। গেস্ট-হাউসের কিছু দূরে জলাভূমির উপরে রোজ যে জোনাকি দেখা আজ তারা সবাই যেন মরে গেছে। নিশ্ছিদ্র নিকষ অন্ধকার। তা-ও, মনে হল, আমার সামনে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে একদৃষ্টে।

— "কে?" অন্ধকারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

— "অচেনা কেউ নই... আমি..."

আবার সেই গলা। কাল রাতে কুয়োর ভিতরে এই গলাটাই শুনেছিলাম। পিছিয়ে এলাম, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না, "তুমি! তুমি এখানে এলে কী করে?"

— "আসতে তো বারণ করোনি..."

তার গলায় মেশানো মৃদু ছলনা গিয়ে লাগছে আমার বুকের ভিতরে, সে জানে, ঠিক কোন্ কথাটা বললে আমার বুকের ভিতরে সংকোচ আর ভয়ের পাঁচিলটা ভেঙে পড়বে।

— "কিন্তু... কী চাও তুমি?"

— "তোমার কাছে আসতে, ঠিক এইভাবে..."

আবার আমার হাতে আঙুলের ছোঁয়া লাগল। প্রজাপতির ডানার মতো মসৃণ স্পর্শ। আমার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার মোহজাল, ক্রমশ নিজের দিকে আমাকে টানছে সে, "আসবে না আমার সঙ্গে?"

— "কোথায়?"

— "যেখানে আমি থাকি?"

— "সেখানে তো অন্ধকার... তোমাকে দেখতে পাই না আমি..."

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সে, পরমুহূর্তে গলা আরও নরম হয়ে আসে তার, "আসলে তোমার চোখ সয়নি এখনও। একবার সয়ে যাক, তারপর দেখতে পাবে আমাকে..."

বুঝতে পারছি এ অলৌকিক, এ অসম্ভব, তা-ও একটা অমোঘ আকর্ষণ আমাকে নিজের মধ্যে থাকতে দিচ্ছে না। আমি জানি না সে কী চায়, কোথায়

নিয়ে যেতে চায় আমাকে, শুধু জানি, আমি তাকে চাই, সে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যেতে রাজি।

— "নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমাকে..." হাতের উপর আর নিয়ন্ত্রণ নেই আমার। সে আবার হেসে উঠছে আগের মতো। আবার গোটা ঘর ভরে গেছে সেই মিষ্টি গন্ধে। আমি দু-হাতে শক্ত করে ধরে আছি তার দুটো কোমল হাত। মনে হল, আরও পাঁচটা আঙুল এসে পড়েছে আমার কপালে, পিঠে আঙুলের ছোঁয়া পাচ্ছি, বুকের উপর একটা হাত... পায়ে, গলায়... এ কী করে সম্ভব!

একটা তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম বিছানায়...

ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে বাইরে থেকে। গোটা ঘর এখন ফাঁকা। জানলা দিয়ে বাইরের বারান্দার হলদে আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। সেই মিষ্টি ফুলের গন্ধটাও মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।

দ্রুতপায়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জলার উপরে জোনাকি দেখা যাচ্ছে এখন। হাওয়ার সঙ্গে মিশে মৃদু গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে। কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। বারান্দার এককোণে বড়ো দড়িটা চোখে পড়ল। এগিয়ে সেটা হাতে তুলে নিলাম আমি। তারপর খালি গায়েই হেঁটে এলাম মাঠে।

একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি, ওই কুয়োটার ভিতর থেকে কেউ একটানা ডেকে চলেছে আমাকে। চাইলেও সেটাকে উপেক্ষা করতে পারব না আমি। আমার সমস্ত শরীর-মন জুড়ে শুধু তার অধিকার, আমি নিজে আর নিজের মধ্যে নেই...

স্ল্যাবটা নীচে নামিয়ে আবার পাথরের দেওয়াল বেয়ে নেমে এলাম। ঘুমন্ত পৃথিবীর সমস্ত শব্দ আবার নিবে এল, বেড়ে উঠল শুধু সেই মিষ্টি ফুলের গন্ধটা। আজ আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আকাশটাও যেন ভয়ে মেঘের চাদর জড়িয়ে নিয়েছে মুখে।

— "তুমি এসেছ?" গলাটা শুনে ফিরে তাকালাম। মনে হল, একটু দূরে একটা পাথরের উপরে বসে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার আবছা

দেখতে পাচ্ছি তাকে। লম্বা একটা শরীর, সাদা কুয়াশার চাদর দিয়ে যেন ঢাকা। হাঁটু অবধি নেমে সেই চাদর ছেঁড়া মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

— "এসেছি, বলো কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?"

মনে হল, সে কাতর দৃষ্টি মেলে চেয়েছে আমার দিকে, "ও মা! আমি কখন বললাম তোমাকে নিয়ে যাব কোথাও?"

— "স্বপ্ন দেখলাম..." থেমে থেমে উচ্চারণ করলাম আমি। সে আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, ঠিক স্বপ্নে যেমন হেসেছিল, "আমাকে স্বপ্নে দেখেছ বুঝি?"

আমি উত্তর না দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা আলো হাতে ছুটে গিয়ে তার মুখটা দেখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু জানি, তাকে আমি ততটাই দেখতে পাব, যতটা সে নিজে দেখাতে চায়।

— "আমি কোথাও নিয়ে যেতে চাই না তোমাকে, তোমাকে ফিরিয়েই দেব আমি, শুধু..."

আসার সময় আমার প্যান্টের পকেটে থেকে গিয়েছিল ফোনটা। এখন মনে হল, বেজে উঠছে সেটা। কান দিলাম না।

— "শুধু একটা জিনিস দিতে চাই তোমাকে... এত বছর ধরে আগলে রেখেছি শুধু তোমার জন্যে..."

ফোনটা কেটে গিয়ে আবার বাজছে। আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম, সেই কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে একটা হাত এগিয়ে এসেছে আমার সামনে। হাতের আঙুলে ধরা একটা ফুল। অনেকটা রজনিগন্ধার মতো দেখতে ফুলটা। সেটা আমার দিকে এগিয়ে ধরেছে সে, "নেবে না?"

ফোনটা বেজে চলেছে... বেজে চলেছে... বেজে চলেছে...

রাগে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল আমার, পকেট থেকে বের করে রিসিভ করলাম ফোনটা, ওপাশ থেকে দুপুরের গলাটা শোনা গেল,

— "কোথায় আছিস তুই?"

— "একটা কাজে আছি, কল মি লেটার।"

— "না, শোন।"

— "কী হল? নেবে না?"

আমি ফোনটা রেখে দিতে গিয়েও রাখলাম না। সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে, কলটা কাটেনি, ওপাশ থেকে এখনও গলা ভেসে আসছে,

..."আজ গোটা দুপুর ধরে ছবিগুলোর মানে খুঁজে বের করেছি আমি, ছবিতে কোনও মেয়ের কথা বলা হয়নি..."

আমি তার হাতের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে নিলাম ফুলটা, একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল আমার সমস্ত হাতে, যেন বিষাক্ত কাঁটা এসে ঢুকেছে হাতের তালুতে।

..."বলা হয়েছে একটা ফুলের কথা। পৃথিবী থেকে লক্ষ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ফুল। যার একটা স্পেশাল এবিলিটি আছে। ইউ লিস্‌নিং? ক্ষমতাটা ভয়ানক..."

এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখ, কী অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটো তার, বুকের ভিতর অবধি গিয়ে আছড়ে পড়ছে সেই চাহনি, ফুলের নরম পাপড়ির মতো কোমল দুটো ঠোঁট...

..."ফুলের মিষ্টি গন্ধ হয় পতঙ্গকে আকর্ষণ করার জন্য, পতঙ্গের পায়ে লেগে-যাওয়া রেনু দিয়ে বংশবিস্তার করে ফুল, কিন্তু এখানে যে ফুলের কথা বলা হয়েছে, সে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে একটি মেয়েকে। মিষ্টি গন্ধের মতোই মেয়েটিকে কাজে লাগিয়ে শিকারকে কাছে টেনে আনে... তারপর তার শরীরের ভিতরেই বুনে দেয় তার পরবর্তী প্রজন্মের বীজ... মনের দখল নেয় একটু একটু করে। শিকারের মৃত্যু হলে তার শরীর মাটিতে মিশে গেলে সেখান থেকে আবার জন্ম নেয় নতুন ফুল... এভাবেই বংশবিস্তার করে এরা..."

এতক্ষণে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গিয়েছে সে। ঠিক যেন মোমের একটা মূর্তি, মনে হল, আমার হাত দিয়ে মিহি রক্তের ধারা নামছে। দুটো হাত এনে রাখলাম তার গালে। আঃ, এমন স্পর্শ যদি মৃত্যুর হয় তাহলে...

..."যতক্ষণ এর গন্ধ তোর নাকে আসবে, তুই অন্য একটা জগতে চলে যাবি। মনে হবে একটা গুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছিস তুই। যে ছবিগুলো আমাকে পাঠিয়েছিস, সেগুলো এর আগের শিকাররাই গুহার দেওয়ালে এঁকে

এই ফুল সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছিল আমাদের। আমাদের পূর্বপুরুষরা... ঠিক কী কারণে এই ফুল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা আর জানা যায় না। তুই ছবিগুলো তুলতে পেরেছিস মানে ইউ আর ইন ডেঞ্জার... আর ইউ দেয়ার? হ্যালো... সায়ন্তন...”

আমার দু-হাতের মাঝখান থেকে মিলিয়ে আসছে সে। ঠিক ভোরের কুয়াশার মতো। মন বলছে, আর কোনওদিন দেখা হবে না এই মেয়েটির সঙ্গে, চিরকালের মতো আমার সামনে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সে...

(চার)

— “আপনিই দেবায়ন ঘোষ?”

— “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

— “আজ সকাল থেকে আপনার বন্ধু সায়ন্তন বসুকে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ কেউ বলছে তাকে ভোরবেলা সবুজ টি-শার্ট পরে গঙ্গার দিকে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছে। আপনার কি মনে হয়, উনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন?”

— “যে সায়ন্তনকে আমি চিনতাম, সে অনেককাল আগেই মারা গেছে, তার খোলসের ভিতরে যে বেঁচে ছিল, সে আত্মহত্যা করে থাকলে আমি অন্তত আশ্চর্য হব না।”

— “মানে?”

— “ছ-মাস আগে আমরা দু’জনে মিলে সরঙে ঘুরতে যাই, দিন তিনেকের ছুটিতে ট্যুর আর কী, ওখান থেকে ফিরেই কেমন বদলে যায় সায়ন্তন, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করত না, ঘুমোত না, বন্ধুবান্ধব এমনকী বাড়ির লোকের সঙ্গেও তেমন কথাবার্তা বলত না। মানুষটা বোধহয় তখন থেকেই মরে গিয়েছে। ইদানীং তেমন খোঁজখবর রাখিনি আমি।”

— “এই ট্যুরে কিছু হয়েছিল? মানে মানসিক আঘাতজাতীয়?”

— "আমার তো জানা নেই, তবে কুয়োর ভিতর নামতে গিয়ে হাতে কেটে গিয়েছিল বেশ খানিকটা, সেটা ঠিকও হয়ে যায় পরে..."

— "কুয়োর ভিতর নেমেছিলেন কেন?"

— "আমরা অ্যাডভেঞ্চারার টাইপের ছিলাম, খেয়াল বলতে পারেন..."

— "ওঁর টেবিল থেকে এই ছবিগুলো পেয়েছি আমরা, কেভ পেন্টিং-এর ফোটোগ্রাফ মনে হয়, শেষ ক-দিন নাকি এগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকতেন সারাদিন... দেখুন তো চেনেন কি না..."

— "উঁহুঁ... নো আইডিয়া..."

(পাঁচ)

গঙ্গার ঘাট এখন ফাঁকা। দুপুরের রোদ ঝলমল করছে ঘোলাটে জলের উপরে। হাতের রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল দিয়া। তারপর পকেট থেকে স্মার্টফোনটা বের করে ফ্রন্ট ক্যামেরা অন করল। গঙ্গার জলটা পিছনে রেখে একটা সেলফি। পছন্দ হল না। ঘাটের ঠিক নীচেই নদী থেকে ভেসে-আসা মাটি স্তূপ রাখা। ব্যাকগ্রাউন্ডটা নষ্ট করছে সেটা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য অ্যাঙ্গল থেকে ছবিটা তুলতে যাচ্ছিল দিয়া। এমন সময় চোখে পড়ল জমা করে রাখা মাটির ভিতরে কিছু একটা গেঁথে আছে। কৌতূহল হতে নীচে নেমে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারে, একটা ছেঁড়া সবুজ টি-শার্ট।

সে মুখ ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্য একটা জিনিসে চোখ আটকে যায়। ঘাটের একদিকের মাটির উপর একঝাঁক ফুল ফুটে আছে। সাদা ফুল, অনেকটা রজনিগন্ধার মতো দেখতে। মৃদু হাওয়ার ধাক্কায় মাথা দোলাচ্ছে তারা। মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে।

ফুলগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আর-একটা সেলফি তুলতে যাচ্ছিল দিয়া, হাত কেঁপে যেতে ছবি ঝাপসা হয়ে গেল। ডিলিট করে আবার তুলতে যাবে,

এমন সময় পিছন থেকে একটা ভারী পুরুষালি গলা শুনতে পেল সে, "মে আই হেল্প?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে দিয়া দেখল, ভারী সুন্দর দেখতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের একেবারে উপরে। ঠোঁটের কোণে এত মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে যে নিজে না হেসে থাকতে পারল না।

ছেলেটা বলল, "আপনি বরঞ্চ একটা ফুল তুলে হাতে নিয়ে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে দিচ্ছি।"

— "গঙ্গার পাড়ে এলেই ছবি তুলতে ইচ্ছা করে..." লাজুক হাসে দিয়া।

— "আই নো..." ফোনটা নিয়ে ছেলেটা ছবি তোলার জন্য পিছিয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নীচে নেমে ফুল তুলতে যায় দিয়া। ফুলের ভিতর কাঁটার মতো কিছু ফুটে যায় হাতে... মিষ্টি ফুলের গন্ধটা বেড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে...





(Based on an infamous incident that occurred in Poitiers– France, in the year 1901)



রাত ঠিক আড়াইটে নাগাদ শিশির সান্যালের ডেস্কে রাখা ফোনটা বেজে

উঠল। শিশিরবাবু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন, আচমকা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। একঝটকায় ঘোর কাটিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরলেন, "হ্যালো, বিধাননগর থানা।"

ওপাশ থেকে প্রথমে ফিনফিনে গলা শোনা গেল, চাপা কান্নার আওয়াজ কি? কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন শিশিরবাবু, কান্না থেমে গিয়ে প্রথম কথা শোনা গেল, মেয়েলি গলায় কাঁদতে কাঁদতে শব্দগুলো বলে চলেছে কেউ, "এ বাড়িতে কিছু একটা আছে... আপনি আমাকে বাঁচান মামাবাবু..."

মামাবাবু? গলাটা চিনতে পারলেন সান্যাল। ঋতু। দিন সাতেক আগেই ঋতুকে মল্লিক বাড়িতে কাজে লাগিয়েছেন সান্যাল। নিজে সুপারিশ করে বহাল করেছেন। বাড়িতে কি তবে গোলমাল হয়েছে কিছু?

— "কী হয়েছে ঋতু? কাঁদছ কেন তুমি?" রিসিভারটা কানে রেখেই কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

— "আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখানে চলে আসুন। না হলে আমাকে... প্লিজ... প্লিজ... মামাবাবু..." কান্নার দমকে কথা আটকে যায়।

— "কিন্তু কেন? কী আছে ও বাড়িতে?"

— "যশোদা... যশোদা ফিরে এসেছে... আমি নিজে দেখেছি, কাউকে ছাড়বে না..."

কথাটা শেষ করতে পারে না ঋতু, কান-ফাটানো চিৎকার শোনা যায় ওপাশ থেকে, সঙ্গে একটা মিহি হাসির আওয়াজ। ফোন কেটে যায়।

শিশির সান্যালের বুকের মাঝখানটা গরম হয়ে ওঠে। মেয়েটা হয় বিপদে আছে, না হয় কোনও কারণে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দ্রুতহাতে কল ব্যাক করেন তিনি। ফোন কেটে যায় বার-বার।

পাশের টেবিলে হাবিলদার সুখলাল বসে ছিল, সান্যালের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে স্যার? কিছু গোলমাল?"

রিভলভারটা কোমরের খাপে ভরতে ভরতে সান্যাল বলেন, "বৃন্দাবনকে ডাক দাও, এখুনি বেরোতে হবে আমাদের।"

— "কোথায়?"

— "৬/এ মল্লিক বাড়ি, কুইক। বেশি দেরি করলে মেয়েটার বড়ো কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

— "মল্লিক বাড়ি, মানে যেখানে আপনি সেই মেয়েটাকে কাজ দিলেন? কিন্তু কে ক্ষতি করবে ওর?"

— "যশোদা মল্লিক... সে নাকি ফিরে এসেছে।" সান্যাল দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলেন।

— "ফিরে এসেছে! কোথায় গিয়েছিল?"

সান্যাল ঘুরে দাঁড়ান, থমথমে গলায় বলেন, — "মল্লিক বাড়ির ছোটোমেয়ে যশোদা মল্লিক, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে মারা গিয়েছে।"

(দুই)

ব্রিফকেসটা টেবিলের উপরে রেখে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিল ঋতু। বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখেই অদ্ভুত বিষণ্ণতা এসে চেপে ধরেছিল তাকে। ভিতরে এসে সেটা বেশ কয়েক ধাপ বেড়ে গেল।

অন্তত শ-দেড়েক বছর বয়স হবে বাড়িটার। তিনতলা। ইংরেজ আমলের কায়দায় তৈরি। সে সময়ে বিস্তর খরচাপাতি করে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল সন্দেহ নেই। ইদানীং কিছুটা যত্নের অভাব লক্ষ করা যায়। চারদিকের দেওয়ালে কালো ছোপ ধরেছে। প্রাচীনত্বের ভূত এসে ভর করেছে বাড়ির উপরে। এত বড়ো একটা বাড়িতে মাত্র দুটো মানুষ থাকে! ভাবতেই অবাক লাগে ঋতুর।

— "আপনার থাকার ঘরটা একতলাতেই, মায়ের পাশের ঘরটাই।" পরিতোষ মল্লিকের গলাটা পাশ থেকে ভেসে আসতে চমক ভাঙে ঋতুর, সে একগাল হাসে, পরিতোষ সিঁড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্যাসেজটার দিকে হাত দেখান, "এদিকে আসুন।"

বাগান পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে একচিলতে বসার ঘরে এসে

দাঁড়াতে হয়। তার ডানদিকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির পাস দিয়ে সরু প্যাসেজ চলে গিয়েছে। সেদিকে কয়েকটা ঘর আছে বোধহয়।

ঋতু এগোতেই যাচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়ির লাগোয়া দেওয়ালে চোখ আটকে যায় ওর, লাইন দিয়ে তিনটে ছবি ঝোলানো আছে সেখানে, ছবিগুলো বেশ পুরোনো, উপরের কাচে ধুলো পড়ে বেশির ভাগটাই আবছা হয়ে গিয়েছে। আঙুল দেখিয়ে সে বলে, "এরা কি আপনাদের পূর্বপুরুষ?"

পরিতোষ একটু হাসে, প্রথম ছবিটা দেখিয়ে বলে, "ইনি আমার বাবা, দুর্গাপ্রসাদ মল্লিক, প্রায় বছর তিরিশেক হল মারা গেছেন... আর এটা..."

পাশের ছবিটার দিকে এগোয় পরিতোষ, "আমার বোন, যশোদা।" পরিতোষের গলারস্বর উদাস শোনায়।

— "উনিও মারা গেছেন?"

— "হ্যাঁ... নাইন্টিন নাইন্টি ফাইভ... পঁচিশ বছর হতে চলল। বোন মারা যাবার পর থেকেই মায়ের শরীরটা খারাপ হতে শুরু করে। এত বছর পরেও শোকটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।"

যশোদা মল্লিকের ছবিটার দিকে ভালো করে তাকায় ঋতু। তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়স হবে মেয়েটার। ডাগর ডাগর হরিণের মতো দুটো চোখ, টকটকে ফরসা গায়ের রং, সেই সঙ্গে একমাথা কোঁচকানো চুল, ঋতুর চোখ আটকে যায়। এত সুন্দর একটা মেয়ে আগে দেখেনি সে। মনে মনে একটু হিংসাই হয় তার।

— "ভারী সুন্দর ছিলেন আপনার বোন, এই বয়সেই মারা যান?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

— "ইশ্, কী করে?"

— "বলছি, আগে ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

জিব কেটে সামনে এগোতে থাকে ঋতু। কৌতূহল ব্যাপারটা তার বরাবরই বেশি। এর আগে যে হাসপাতালে কাজ করত, সেখানেও ধমক ধামক খেয়েছে বেশ কয়েকবার। অথচ শোধরায়নি। ওর নিজের বয়সও প্রায় পঁচিশ হতে চলল, অথচ মনটা এখনও শিশুর মতো। হাবভাবেও কৈশোরের ছাপ

রয়ে গিয়েছে।

প্যাসেজ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে এলে শেষ প্রান্তে দুটো ঘরের দরজা চোখে পড়ে। তার মধ্যে একটা এখন বন্ধ। অন্যটায় হালকা একটা ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলেন পরিতোষ। ঘরের ভিতরটা দেখিয়ে বলেন, "পাশেরটা মায়ের। মা এখন ঘুমোচ্ছেন, উঠলে দেখা করবেন, কেমন?"

লাজুক হাসিটা হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে আসে ঋতু। বেশি বড় নয় ঘরটা, দু-দিকের দেওয়াল জুড়ে মোট চারটে জানলা করা আছে। মেঝের উপরে হালকা ধুলোর আস্তরণ। এককোণে জামাকাপড় ঝোলানোর মতো আলনা, একটা পড়ার টেবিল আর বিছানা ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই।

ব্রিফকেসটা টেবিলের উপরে রেখে চেয়ারে বসে পড়ল ঋতু। পরিতোষ মল্লিক কিন্তু বসলেন না, সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝতেই পারছেন, বাড়িতে আমরা দু-জন মাত্র থাকি, ফলে কাজকর্ম সব আপনাকেই বুঝে নিতে হবে। প্রথমে একটু অসুবিধা হবে..."

— "না না, একদম চিন্তা করবেন না। আমি এর আগেও..."

ঋতুর কথা শেষ হয় না। পাশের ঘর থেকে একটা চাপা গোঙানির শব্দ ভেসে আসে, যেন কাতর কণ্ঠে সাহায্য চাইছেন কোনও মহিলা। পরিতোষ ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলেন, "মা উঠে পড়েছেন, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে আসুন একবার।"

পরিতোষ বেরিয়ে যেতে ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে নেয় ঋতু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কলটা খুলে দেয়। দু-হাত ভরে জল নিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দেয়। হঠাৎ কী একটা শব্দ কানে আসে তার। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে কল থেকে জল বেরিয়ে বেসিনের উপরে এসে পড়ছে। ছলছল করে শব্দ হচ্ছে তাতে, তার সঙ্গে মিশে খুব ক্ষীণ, অস্পষ্ট অন্য একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে। যেন জলের ভিতরে একটা ছুরি শান দিচ্ছে কেউ, নাকি মানুষের গলার আওয়াজ?

মনের ভুল ভেবে কলটা বন্ধ করে দেয় সে। শব্দ থেমে যায়। কী মনে হতে আবার চালিয়ে দেয় কলটা। আর কোনও শব্দ নেই। একটু হেসে ঋতু

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

মিসেস মল্লিকের বয়স অন্তত সত্তরের আশপাশে। একবার দেখলেই মনে হয়, সশরীরে উঠে প্রায় কোনও কাজই করতে পারেন না মহিলা। গোটা মুখে বলিরেখার দাগ। শরীরে প্রতিটা ইঞ্চির চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। কাঠিন্যে ভরা মুখ, বোঝা যায় একসময় যথেষ্ট জাঁদরেল ছিলেন মহিলা। ইদানীং হয়তো শরীর সায় দেয় না। চাদর দিয়ে গলা অবধি ঢেকে শুয়ে আছেন তিনি। ঠিক পায়ের কাছে বসে আছেন পরিতোষ।

মুখ তুলে একবার ঋতুকে দেখে নিলেন মিসেস মল্লিক, পরিতোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, — "ইদানীং মায়ের শরীরটা একটু বেশি খারাপ করছে। তাই আপনাকে আনা, না হলে এ বাড়িতে অন্য কেউ এসে থাকুক, সেটা মা পছন্দ করেন না।"

ঋতু বুঝতে পারে, মিসেস মল্লিকের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি এখনও এসে পড়ছে ওর মুখে, অস্বস্তি হয় ওর।

— "শোনো ছুকরি, এ বাড়িতে তুমি কাজ করছ মানে এই নয় যে বাড়িটা কিনে ফেলেছ..." ঠান্ডা বরফের মতো কণ্ঠ মহিলার, "কোথাও যেতে গেলে বা কিছু সরাতে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে আগে। আগ বাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই।"

ঋতু ঘাড় নাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার মতো ধমক শোনা যায়, "আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখে উত্তর দেবে। ঘাড় নাড়ানোটা অভদ্রতা। কানে গিয়েছে?"

— "হ্যাঁ।" মাথা নামিয়ে বলে ঋতু।

— "আমি এই একতলার ঘর থেকে বেশি একটা বেরোই না। তুমিও এখানেই থাকবে। আমার ছেলে একা থাকে দোতলায়, তিনতলাটা আজ অনেকদিন যাবৎ ফাঁকা পড়ে আছে। দিনে একবার দোতলায় গিয়ে ওর খাবার দিয়ে আসবে, বুঝতে পেরেছ?"

— "হ্যাঁ।"

— "বেশ। এবার তোমরা যাও। আমার শরীর খারাপ নেই এখন। দরকার

হলে ডাকব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে ঋতু বড়োসড়ো একটা নিশ্বাস ফ্যালে। এতক্ষণ যেন একটা দরজা বন্ধ খাঁচার ভিতরে আটকে পড়েছিল। নিজের ঘরের চেয়ারে এসে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ে সে।

— "মায়ের আচরণে কিছু মনে করবেন না। আমি তো ছোটো থেকে দেখে আসছি। একটু রাশভারী, তবে মনটা ভারী নরম।" উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলতে থাকেন পরিতোষ, "এ এলাকায় যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন। দরকারে-অদরকারে মায়ের কাছে এলে কেউ ফাঁকা হাতে ফিরে যায়নি। শ্বশুরবাড়িতে মারধর খেয়ে পালিয়ে আসা কত মেয়েকে যে আশ্রয় দিয়েছিলেন..."

— "তিনতলাটা ফাঁকাই পড়ে আছে? কেউ থাকে না ওখানে?" প্রসঙ্গটা পালটে ফ্যালে ঋতু।

— "আজ্ঞে না। চাইলে দেখে আসতে পারেন, তবে যত্ন নেওয়া হয় না বলে মাকড়শার ঝুলে ঢেকে গিয়েছে একদম। আমিই মাসে একবার গিয়ে একটু সাফসুতরো করে আসি।"

— "কে থাকতেন ওখানে?"

দাড়িতে হাত রাখেন পরিতোষ, "এ বাড়িটা আগে দোতলা ছিল, পরে বাবা নিজের কাজকর্ম আর পড়াশোনার জন্যে তিনতলাটা বানান। তবে বেশি দিন ওখানে থাকতে পারেননি। আমি আর যশোদা থাকতাম দোতলার ঘরে। ওর ঘরটাও এত বছর ফাঁকাই পড়ে আছে।"

যশোদার মুখটা আবার মনে পড়ে যায় ঋতুর। কী মায়াভরা চোখ দুটো মেয়েটার। নাকের ঠিক পাশে একটা ছোট্ট কালো তিল।

— "উনি কী করে মারা গিয়েছিলেন বলুন তো?"

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু সময় নেন পরিতোষ। আর ঠিক সেই সময়ের মধ্যে আবার সেই পুরোনো শব্দটা কানে আসে ঋতুর। আগের থেকে আরও ক্ষীণ, একটা ধারালো ছুরিকে যেন মেঝের উপরে ঠুকছে কেউ। পাখার নড়াচড়া থেকে আসছে কি শব্দটা?

— "যশোদার তখন পঁচিশ বছর বয়স। জানি না কেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয় ওর। বাড়ি থেকে বেরোতে চাইত না, কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ জোর করে কথা বলতে গেলে তাকে আক্রমণ করে বসত। শেষে একদিন..." থেমে পরের কথাগুলো বলেন পরিতোষ, "একদিন ওর ঘর খুলে আমরা দেখি, ওর দেহটা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে। ছুরি দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে ও।"

একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে হঠাৎই কাঁপিয়ে দিয়ে যায় ঋতুকে। একটু আগেই ছুরির আওয়াজ কানে আসছিল। হয়তো মনের ভুলেই...

— "কিন্তু কেন?" কোনওরকমে ঢোঁক গিলে বলল।

— "জানি না, তদন্ত একটা হয়েছিল, তবে বিশেষ কিছু জানা যায়নি তাতে।"

কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত কেটে যায়। পরিতোষ উঠতে উঠতে বলেন, "আমি এখন আসি বরং। আপনি বিশ্রাম করুন।"

তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ঋতু। আচমকাই কাঁপা-কাঁপা গলায় দরজার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "কে... ওখানে কে?"

পরিতোষের চোখ দরজার দিকে ঘুরে যায়, চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, "কই কেউ নেই তো, কাকে দেখলেন আপনি?"

— "একটা ছায়া, দরজা থেকে সরে গেল।"

দু-জনেই দ্রুত পা চালিয়ে দরজার কাছে সরে আসে। পাশের ঘরের দরজা আগের মতোই বন্ধ। প্যাসেজ ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। মায়ের ঘরে একবার উঁকি দেয় পরিতোষ। এখনও পাশ ফিরে শুয়ে আছেন।

— "উঁহুঁ, ভুল দেখেছেন আপনি। ক্লান্ত আছেন, আজকের মতো আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

পরিতোষ বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিবিয়ে জানলার কাছে সরে আসে ঋতু।

সন্ধে নামতে শুরু করেছে। জানলার ঠিক বাইরে একফালি বাগান করা

আছে। তার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো ফুলগাছগুলোর উপরেও সন্ধের অন্ধকার নেমেছে। একটু একটু করে একটা আলো এসে মিশছে সেই নিকষ অন্ধকারে। চাঁদের রুপালি আলো।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঋতুর মনে হয় এ বাড়িটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিছু একটা রহস্য লুকিয়ে আছে এর গভীরে। বাড়ির কোনও এক কোনায় এই সন্ধের থেকে বহুগুণ গভীর একটা অন্ধকার জমে আছে। অবরুদ্ধ হয়ে আছে কয়েক দশক ধরে। বুকটা ছমছম করে ওঠে তার...

(তিন)

৬/এ মল্লিক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশের জিপটা। লাফিয়ে জিপ থেকে নেমে এলেন সান্যাল। তাঁর ঠিক পিছনে বৃন্দাবন। রাত তিনটে বেজেছে এতক্ষণে। গোটা পাড়াটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। দুটো ভারী বুটের আওয়াজ আর রাস্তার আশপাশ থেকে ভেসে-আসা ঝিঁঝির ডাক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

— "কিন্তু মরা মানুষ কী করে ফিরে আসে স্যার?" জিপ থেকে নেমে প্রশ্ন করে বৃন্দাবন। সুখলাল ড্রাইভ করছিল গাড়িটা, সে বলে, "তা-ও আবার যে পঁচিশ বছর আগে মারা গিয়েছে।"

— "আমি জানি না, তবে মেয়েটা যে বিপদে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বৃন্দাবন, তুমি ফ্রন্ট ডোরটা চেক করো, বন্ধ থাকলে ভেঙে ঢুকতে হবে।"

সুখলাল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়। মল্লিক বাড়ির বাইরে গার্ডেন গেটের উপরে টর্চের আলো ফ্যালে।

সান্যাল খেয়াল করেন, বাড়ির ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না। কোনও আর্ত চিৎকারও নয়। মেয়েটার জন্যে চিন্তা হয় তাঁর। হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটছে বাড়ির ভিতরে।

— "যশোদা মল্লিক কীভাবে মারা যায় স্যার?"

— "শি স্ট্যাবড হারসেল্ফ... ক-দিন আগেই ওর কেস ফাইলটা ঘাঁটছিলাম..." আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সান্যাল, প্রসঙ্গটা পালটে বললেন, "কিছু একটা গোলমাল আছে ফাইলটায়।"

— "কী গোলমাল?"

— "পরে হবে সেসব, আগে মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার, বৃন্দাবন..."

এতক্ষণে গেট পেরিয়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছে বৃন্দাবন। ভিতরের দরজাটায় এখন তালা লাগানো। পকেট থেকে রিভলভার বের করে সেটার উপর একটা গুলি চালায় সে। দরজাটা ভেঙে ভিতরের রাস্তা দেখা যায়...

— "লেট'স গো ইনসাইড...।"

(চার)

সকালে উঠে মনটা হালকা হয়ে গেল ঋতুর। এ বাড়িতে এসে থেকে তিনটে দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আর গণ্ডগোল কিছু চোখে পড়েনি। কাজকর্মের মধ্যে ডুবে গেলে অন্য কিছুর কথা খেয়ালও থাকে না। প্রথম দিন সন্ধের সেই ছায়াটার কথা দু-একবার মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু এ বাড়িটা পুরেনো, বেশির ভাগ দেওয়ালেই কালচে রং ধরেছে। তার উপর বেশি আলো জ্বালানো থাকে না। চোখের ভুল হওয়া আশ্চর্য না।

তবে ঋতু খেয়াল করেছে, পাম্প না চললে নৈশব্দের সুযোগে বেশ কিছু অবাঞ্ছিত শব্দ কানে আসে তার। যেন গোটা বাড়িটাই তাকে কানে কানে কিছু বলতে চাইছে। সত্যি কি তেমন কিছু আছে এ বাড়িতে? ভাবনাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চায় ঋতু, বারবার। সে কাজ করে পয়সা পায়, এসব আজগুবি চিন্তা মনে না-আনাই ভালো।

এই ক-দিন পরিতোষ মল্লিক বাড়ি ছিলেন না খুব একটা, ফলে দুপুরে খাবার দিতে যেতে হয়নি। আজ তিনি বাড়িতে আছেন।

দুপুর ঠিক একটা বাজতেই একটা প্লেটে পরিতোষের খাবার নিয়ে দোতলায়

হাজির হল ঋতু। বাড়ির সিঁড়িগুলো সরু-সরু। সকাল থেকে পাম্প চলা শুরু হয়েছে। তার গনগন আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়িটা প্রায় ফাঁকা বলে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও গমগম করছে।

সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলায় উঠলে একটা লম্বা প্যাসেজে এসে দাঁড়াতে হয়। সেটা দু-দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকে গেলে পরিতোষের ঘর। সেখানে পৌঁছে টেবিলের উপরে খাবারটা রেখে দেয় ঋতু। পরিতোষ ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে রাখা রেডিয়োতে পুরাতনী গান বেজে চলেছে।

বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। নীচে নেমেই যাচ্ছিল, হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় ছবিতে দেখা যশোদা মল্লিকের চোখটা মনে পড়ে। এই তলাতেই তো থাকত সে। নিশ্চয়ই প্যাসেজের উলটোদিকের ঘরটা তার ছিল। ঘরটা দেখতে ইচ্ছা করছে একবার।

পায়ে পায়ে হেঁটে প্যাসেজ পেরিয়ে আসে ঋতু। এদিকের ঘরগুলোর জানলা বন্ধ। ফলে আলো আরও কম। তা ছাড়া ধুলো আর মাকড়সার জালের পরিমাণ বেড়ে উঠেছে এদিকটায়। মাথার উপরে সাদা সিলিং-এ খয়েরি রঙের ছোপ ধরেছে। বুকটা দুরুদুরু করে। কে জানে কত বছর কেউ থাকেনি এই ঘরগুলোতে।

একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। ঘরের দরজাটা এখন খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে তাকাতে ভিতরের দেওয়ালে একটা ছবি ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। এই ছবিতে একগোছা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে যশোদা মল্লিক। মাথায় একটা বাঁকানো টুপি। কোঁকড়ানো চুলের ঢল কপালের বেশির ভাগটাই ঢেকে ফেলেছে। একটা মিহি হাসিও আছে ঠোঁটের পাশে, কালো তিলটার জন্যে আরও মিষ্টি লাগছে হাসিটা।

এটাই যশোদা মল্লিকের ঘর। ঘরে ঢুকে ছবিটার কাছে এগিয়ে আসে ঋতু। একদিকের জানলা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক রোদের রেখা মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে থাকে সে।

যশোদা মল্লিকের মৃত্যুর পর থেকে হয়তো এভাবেই ঝোলানো আছে।

হলদে রঙের ছাপ পড়েছে ছবির উপর। হাত বুলিয়ে সেটা মুছে দেয় ঋতু আর ঠিক সেই সময় মনে হয় ঘরের দরজার কাছ থেকে মৃদু পায়ের আওয়াজ আসছে। মুহূর্তে মুখ ফিরে তাকায় সে — কেউ নেই। দরজা খালি। ছবি হাতে ছুটে যায় সে দরজার কাছে। নাঃ, প্যাসেজটাও আগের মতোই খালি পড়ে আছে।

গা-টা ছমছম করে ওঠে। বাড়িটা ফাঁকা বলেই কি বারবার মনের ভুল হচ্ছে? দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়ালে পিঠ রেখে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে সে। পাম্পের শব্দও এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। পাশ ফিরে কান রাখে দেওয়ালে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো একটা শব্দ আবার কানে আসে। হ্যাঁ... প্রথম দিন সন্ধের সেই ছুরির আওয়াজটা, এবার আগের থেকে আরও জোরে। মনের ভুল নয়, সত্যি কিছুর একটা আওয়াজ আসছে দেওয়াল বেয়ে। আচমকা একটা শব্দ শুনে সে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। মানুষের গলার আওয়াজ। খুব চাপা, প্রায় বুজে-আসা গলায় অস্পষ্ট কিছু শব্দ উচ্চারণ করে চলেছে কেউ। ঠিক যেন একটা বন্যপ্রাণী মানুষের স্বর নকল করার চেষ্টা করছে।

ছিটকে দেওয়াল থেকে সরে আসে ঋতু। গায়ের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে উঠেছে ওর। মনের ভিতর থেকে কেউ বলে দেয়, একটা ভয়ানক রহস্য লুকিয়ে আছে এ বাড়িতে।

নীচে তাকায় সে, হাতে ধরা ছবিতে যশোদা মল্লিকের মুখের ঠিক উপরে তার নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে। মায়াময় চোখ দুটো তুলে একদৃষ্টে ঋতুর দিকে তাকিয়ে আছে যশোদা। কিছু কি বলতে চাইছে?

ছবিটা দেওয়ালে তুলে রাখতে গিয়ে থমকে যায় ঋতু। ছবিটা যেখানে টাঙানো ছিল সেখানের দেওয়ালে এখন চৌকো রং-ওঠা দেওয়াল বেরিয়ে পড়েছে। এতকাল ছবির আড়ালে ঢাকা পড়েছিল জায়গাটা।

ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সেখানে এবড়ো-খেবড়ো সিমেন্টের উপর কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা আছে। ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কারও নাম খোদাই করে রেখেছে কেউ, অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করে ঋতু

'বি-এ-আর-ইউ...' পরের অক্ষরটা এম বা এন দুটোই হতে পারে। ঋতু আন্দাজ করে নেয় বরুণ।

কে লিখেছে নামটা? যশোদা? নাকি এই বাড়িতে 'বরুণ' নামে কেউ থাকত? ঋতুর ভুরু দুটো কুঁচকে যায়, ছবিটা টাঙিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছিটকে মাটির উপরে পড়ে সে। তিনতলা থেকে একটা শব্দ ভেসে এসেছে এইমাত্র। যেন একটা ভারী জিনিসকে মেঝের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ...

মনস্থির করে নেয় ঋতু। এ বাড়ির রহস্য যেভাবেই হোক ভেদ করতে হবে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে থাকে। কেউ একটা আছে তিনতলায়। নিশ্চয়ই আছে। এ আওয়াজ মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তিনতলার ঘরগুলো চোখে পড়ে। দোতলার মতোই ঘরগুলো। সব ক-টার দরজা হাট করে খোলা। বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। দু-একটা পুরোনো ভাঙাচোরা আসবাব রাখা আছে কোনও কোনও ঘরে। বাকিটা ফাঁকা। কারও পক্ষে সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

দৌড়ে দৌড়ে একটার পর একটা ঘরে ঢুকে দেখতে থাকে সে। কেউ কোথাও নেই, অস্থির হয়ে ওঠে সে, চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠে, "কে আছেন এখানে... বেরিয়ে আসুন।"

ফাঁকা ঘরের ভিতর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে শব্দটা। কোনও উত্তর আসে না। ঋতুর মনে হয়, একটা অদৃশ্য উপস্থিতি যেন তাড়া করছে ওকে। কেউ একটানা নজর রাখছে ওর উপরে।

দৌড়োতে দৌড়োতে সে খেয়াল করে, আবার সেই মানুষের গলার মতো আওয়াজটা শুরু হয়েছে। কথা বলার চেষ্টা করছে কেউ। দুর্বোধ্য ভাষায় নিজের মনে যেন বিড়বিড় করছে।

সব ক'টা ঘর দেখে নেয়, সত্যি কোথাও কেউ নেই। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। আর ঠিক সেই সময় একটা সরু

হাতের স্পর্শ এসে পড়ে তার কাঁধে "কে..." কাঁপা গলায় চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ে সে।

— "আপনি এখানে কী করছেন?" পরিতোষ মল্লিক দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুম ভেঙে কোনও এক ফাঁকে উপরে উঠে এসেছেন তিনি।

ঋতু আমতা আমতা করে, "আসলে তিনতলাটা দেখতে ইচ্ছা করছিল..."

— "দেখতে ইচ্ছা করছিল! এখানে দেখার মতো কী আছে?" পরিতোষের ভুরু কুঁচকে যায়।

— "আ... আমার ভুল হয়ে গেছে... আমাকে ক্ষমা করবেন।" কথাটা বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঋতু, হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা এ বাড়িতে বরুণ মল্লিক বলে কেউ ছিল?"

পরিতোষের মুখের অভিব্যক্তি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে পাল্টে যায়, একটা চাপা উত্তেজনা মুহূর্তের অসাবধানতায় খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে যান তিনি, "বরুণ... কই না তো। কেন বলুন তো?"

— "কোথায় একটা লেখা আছে দেখলাম যেন।"

— "কোথায়?" পরিতোষ একটু এগিয়ে আসে।

— "ঠিক মনে পড়ছে না।"

— "আচ্ছা বেশ," দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে পরিতোষ, "মা আপনাকে ডাকছিলেন, কিছু দরকার আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ঋতু। বরুণ মল্লিক নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষের চোখ-মুখ যে বদলে গিয়েছিল সেটা খেয়াল করেছে সে। কিছু একটা রহস্য তো অবশ্যই আছে। ঋতু মনস্থির করে নেয়, যে রহস্যই থাক, তার সমাধান সে করবেই।

একতলায় নেমে মিসেস মল্লিকের ঘরে ঢুকতেই ধমক কানে আসে, "দরকারের সময় যদি তোমাকে না পাওয়া যায় তাহলে পয়সা দিয়ে রাখা হয়েছে কেন?"

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

— "আমি একটু বাথরুমে যাব, ধরো আমাকে।"

এগিয়ে গিয়ে মিসেস মল্লিকের একটা হাত কাঁধে তুলে নেয় ঋতু। তারপর একটু একটু করে ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে বাথরুম অবধি পৌঁছে দেয়।

তিনি ভিতরে ঢুকে যেতে সতর্ক বিড়ালের মতো চারদিকটা দেখে নেয় সে। ধীরে ধীরে ল্যান্ড ফোনের কাছে এগিয়ে এসে রিসিভারটা তুলে কানে লাগায়, একটা নম্বর ডায়াল করে।

ফোনের ওপাশ থেকে শিশির সান্যালের গলা পাওয়া যায়, ঋতু একটু চাপা গলায় বলে, — "আমি ঋতু বলছি, মামাবাবু।"

— "ও, বলো, সব ঠিকঠাক তো?"

— "হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আছে শুধু।"

— "এ বাড়িতে বরুণ মল্লিক বলে কেউ ছিলেন কখনও?"

— "বরুণ? মিস্টার মল্লিকের নাম সম্ভবত ছিল দুর্গাপ্রসাদ, বরুণ বলে কেউ... আচ্ছা দেখছি, দাঁড়াও।"

ঋতু আর-একবার চারদিকটা দেখে নেয়। বাথরুম থেকে জলের আওয়াজ আসছে। সম্ভবত স্নান করছেন মহিলা। বেরোতে দেরি আছে।

— "নাঃ, বরুণ মল্লিক বলে এ অঞ্চলেই কেউ ছিল না কোনওদিন, তবে আমার যতদূর মনে পড়ছে, বরুণ গোস্বামী বলে একজন ল-ইয়ার ছিলেন। এই বছর পাঁচেক আগে মারা গেলেন। তাঁর সঙ্গে ও বাড়ির যোগাযোগ নেই তো কিছু... কিন্তু তুমি হঠাৎ এসব..."

— "নাঃ, এমনিই... আপনি ভালো আছেন তো?"

— "তা আছি। কোনও অসুবিধা হলে জানিয়ো।"

— "না না, অসুবিধা কীসের, এখন রাখি, মামাবাবু।"

ফোনটা রেখে আবার বাথরুমের কাছে ফিরে আসে ঋতু। এখনও আসছে জল পড়ার শব্দ। একটা চাপা উত্তেজনা তার মাথার ভিতরে স্থায়ী জায়গা করে নিচ্ছে।

যশোদা মল্লিক হঠাৎ অমন নৃশংসভাবে আত্মহত্যা করতে গেল কেন? বরুণ বলে লোকটা কে? তার নামটা শুনে পরিতোষ মল্লিক এমন চমকে উঠলেন

কেন? আর তার থেকেও বড়ো কথা... প্রথম দিন সন্ধের সেই ছায়াটার কথা মনে পড়ে গেল ঋতুর।

চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে মিসেস মল্লিকের ঘরের ভিতরে ঢুকে এল। বাথরুম থেকে ঘর অবধি একা আসতে পারবেন না তিনি। ঋতুকে ডাক দেবেন। ততক্ষণ ফাঁকা পাওয়া যাবে ঘরটা।

ঘরে ঢুকেই চারদিকটা ভালো করে লক্ষ করল সে। ঘরভরতি পুরোনো জিনিস। একদিকে কিছু বইপত্র, হিসেবের খাতা ডাঁই করে রাখা আছে। দ্রুত সেদিকে সরে এল ঋতু। উপরের কয়েকটা খাতা ব্যাবসা আর হিসেবপত্র সংক্রান্ত। সেগুলো পাশে সরিয়ে রাখল। একেবারে তলার দিকে কালো রঙের একটা ডায়েরিতে চোখ আটকে গেল তার।

ডায়েরির স্পাইনে সাল লেখা আছে, ২০১৩। অর্থাৎ ছ-বছর আগের ডায়েরি। মিসেস মল্লিকের পারসোনাল ডায়েরি? কী আছে এতে?

ঋতু বাইরেটা আর-একবার দেখে নিয়ে ডায়েরিটা আলোর সামনে মেলে ধরল। খুদে অক্ষরে কিছু ঘটনার বিবরণ লেখা আছে কোথাও কোথাও। ঋতু শুনেছে, মিসেস মল্লিক নাকি এলাকার মেয়েদের নিয়ে কোনও একটা এনজিও চালাতেন। সেই সংস্থার খুঁটিনাটি তথ্য লেখা আছে পাতায় পাতায়।

হতাশ হয়ে ডায়েরিটা বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময় একটা পাতায় চোখ আটকে যায় তার। কিছু লেখা নেই সেখানে। শুধু একটা পুরোনো খবরের কাগজের কাটিং আঠা দিয়ে সাঁটানো আছে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগের একটা খবর।

খবরটায় চোখ রাখতেই ঋতুর বুকের ভিতর রক্ত থমকে যায়। এই এলাকার এক আইনজীবীর ক্যানসারে ভুগে মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে সেখানে। মৃত আইনজীবীর নাম বরুণ গোস্বামী।

ডায়েরির ভিতর থেকে আর-একটা কাগজ উড়ে এসে ঋতুর পায়ের কাছে পড়ে।

(পাঁচ)

ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে এল বৃন্দাবন। তার ঠিক পিছন পিছন শিশির সান্যাল। দু-দিন আগে ঋতুর কলটা পেয়েই মল্লিক বাড়ির কেস ফাইলটা আবার ঘেঁটে দেখেন তিনি। একটা খটকা চোখে পড়ে। বরুণ নামটার খোঁজ ঋতু কেন করছিল তা অবশ্য জানতে পারেননি এখনও।

বন্দুকের আওয়াজে হয়তো এলাকার কিছু লোকের ঘুম ভেঙে গেছে। এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমোচ্ছিল সবাই। এবার পাড়ার অন্য বাড়িগুলো থেকে মৃদু গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে।

মল্লিক বাড়ির একতলার বসার ঘরে ঢুকে এলেন দু-জনে। পিছনে টর্চ হাতে সুখলাল। সাদাটে গোল আলো এসে পড়ছে একতলার মেঝের উপরে। ডানদিকে সেটা ঘোরাতেই সিঁড়ির ধাপগুলো চোখে পড়ল। পাশেই প্যাসেজ ফাঁকা। পাম্পের আওয়াজ কানে আসছে।

— "আমরা পুলিশ, কেউ সামনে থাকলে হাত তুলবেন..." চিৎকার করে ওঠেন শিশির সান্যাল। অন্ধকারে ডুবে রয়েছে গোটা একতলাটা। রিভলভারটা সামনে তুলে ধরে এগিয়ে যান দু-জনে।

সিঁড়ির ঠিক নীচেই একটা দেওয়ালে ঝোলানো ছবি উলটে পড়ে আছে, ভেঙে গ্যাছে ছবিটা, কাচের টুকরো ছড়িয়ে আছে আশপাশে। ছবিটা হাতে তুলে নেন সান্যাল যশোদা মল্লিকের ছবি। সেটা নামিয়ে রেখে বৃন্দাবনের দিকে ফেরেন তিনি, "আমি একতলাটা দেখছি তুমি উপরে যাও, কিছু গোলমাল দেখলে পায়ে শুট করবে। হারি..."

বৃন্দাবন সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটে যায়, তার পিছন পিছন টর্চ হাতে সুখলাল। পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে নিজের রিভলভারের উপরে ধরে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে এগিয়ে যান সান্যাল। পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটোরই দরজা এই মুহূর্তে খোলা, তিনি আবার চিৎকার করে ওঠেন, "ঘরে কেউ থাকলে বেরিয়ে আসুন, ভয়ের কিছু নেই।"

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যান সান্যাল, অন্ধকারের ভিতরে যেটুকু অংশে সাদা আলো এসে পড়েছে, তাতে দ্যাখা যাচ্ছে, ঘরের এক কোণে

দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বসে আছে একটা নারীমূর্তি। মৃদু দুলছে যেন তার শরীরটা।

— "মিসেস মল্লিক..."

কোনও উত্তর আসে না শরীর থেকে। আগের মতোই মুখ ঢেকে দুলছে, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে চলেছে কিছু। সান্যাল আরও এগিয়ে যান, একটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে যান মূর্তির মাথাটা। ছিটকে পিছিয়ে আসেন তিনি, মুখ তুলেছেন মিসেস মল্লিক, কিন্তু সে মুখের ডান প্রান্ত থেকে বাঁ প্রান্ত অবধি লম্বা ফালা হয়ে কাটা একটা দাগ, রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে সেই কাটা জায়গাটা থেকে। রক্তমাখা মুখেই খলখল করে উন্মাদের মতো হেসে চলেছেন মিসেস মল্লিক, ওঁর বিড়বিড় উচ্চারণ এতক্ষণে ভাষা পেয়েছে বেশ করেছি। যা করেছি, বেশ করেছি। অবাধ্য মেয়েদের বরদাস্ত করি না আমি, কেউ শাস্তি দিতে পারবে না আমাকে... বেশ করেছি..." আকাশ বিদীর্ণ করে হাসতে থাকেন তিনি।

— "কী করেছেন আপনি?"

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা জমাট অন্ধকার আছড়ে পড়ে সান্যালের গায়ে। সামলে নিয়ে সেদিকে টর্চ ফেলে চেনা মুখ দেখতে পান তিনি, ঋতু... উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা ওর। গায়ে রক্তের ছিটে লেগে আছে। হাতে ধরা একটা ধারালো ছুরি। সান্যাল পিছিয়ে এলেন... অজান্তেই বন্দুকটা উঠে আসে ঋতুর দিকে।

— "আপনি..." কোনওরকমে উচ্চারণ করে সে, "আপনি বাঁচান আমাকে। যশোদা ফিরে এসেছে... এই বাড়িতেই।"

মিসেস মল্লিকের হাসির আওয়াজ আরও বেড়ে ওঠে।

— "ইমপসিবল... পঁচিশ বছর আগে মরে যাওয়া মানুষ ফিরে আসতে পারে না... ইমপসিবল..."

— "তাহলে তিনতলার ঘরে যাকে দেখালাম... আপনি প্লিজ..." হাত দিয়ে উপরের দিকটা দেখায় ঋতু। অব্যক্ত শব্দ মুখে রেখেই তার অবচেতন শরীর মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে।

(ছয়)

মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ঋতু। আজ রাতে সে ঘুমোয়নি। উত্তেজনায় ঘুম পায়ওনি তেমন। ঘরের দরজাটা অল্প একটু খুলে বাইরে মুখ বাড়িয়ে সে দেখে নেয়, একতলায় কেউ আছে কি না। কেউ নেই।

পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে আসে। মিসেস মল্লিকের ঘরে একবার উঁকি দেয়। হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছেন, কোনও সন্দেহ নেই।

ঋতুর একহাতে টর্চ, অন্য হাতে একটা পুরোনো হলদেটে কাগজ। আজ সকালে এই কাগজটাই খসে পড়েছিল ডায়েরির ভিতর থেকে। একটু কোণের দিকে সরে এসে টর্চ জ্বেলে কাগজটায় কিছু একটা মিলিয়ে নেয় ঋতু। তারপর আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

ঋতু বুঝতে পারে না, ওর ঠিক পিছনে আরও সতর্ক পায়ে কেউ নজর রাখছে ওর উপর। এ বাড়ি এমনিতেই অন্ধকার। তার উপরে এখন রাত বলে সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় উঠে আসে সে। প্যাসেজের শেষ প্রান্তের জানলার পাল্লা এখন খোলা, সেখান দিয়ে মিহি চাঁদের আলো এসে ঢুকছে এখন। প্যাসেজের মেঝের উপর জটিল রুপালি নকশা কাটা রয়েছে। টর্চটা নিবিয়ে দেয়। বিশেষ একটা ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

দীর্ঘদিনের অব্যবহারে এ ঘরের দরজার হুড়কোগুলো অকেজো হয়ে গ্যাছে। আর লাগানো যায় না। লাগানোর দরকারও পড়ে না।

দরজার পাল্লাগুলো টেনে দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে আসে সে। জানলা খুলে হাতের কাগজটা মেলে ধরে মুখের সামনে। চাঁদের আলোয় চোখে পড়ে কাগজের উপরে আঁকা নকশাটা। এ বাড়ির ঘরগুলোর নকশা।

তিনতলা জুড়ে সব ক-টা ঘর ছক কেটে দেখানো আছে সেখানে। শুধু তিনতলার একেবারে মাঝামাঝি দুটো ঘরের পিছনে একটা আট ফুট বাই আট ফুটের চৌকো অংশ খালি রাখা আছে। পরে কেউ লাল রং দিয়ে ভরে দিয়েছে জায়গাটা।

ঋতু হিসেব করে দেখেছে, আজ সকালে যে ঘরে দাঁড়িয়ে তিনতলার শব্দটা সে শুনেছিল সেটা ওই ফাঁকা অংশটার সোজাসুজি নীচে। অর্থাৎ জায়গাটা ফাঁকা নয়। কিছু একটা আছে ওখানে। উত্তরটা সহজ একটা লুকোনো ঘর। কিন্তু কী রাখা আছে সেখানে?

ঘরের একদিকে এগিয়ে এসে দেওয়ালে একটা টোকা দেয় ঋতু। নাঃ, এ জায়গাটা ফাঁপা নয়, পাশে সরে এসে আবার টোকা দেয়, এখানটাও নিরেট। হঠাৎ চোখে পড়ে, ঘরের এককোণে একটা পুরোনো জামাকাপড় রাখার আলনা আছে। আলনার নীচের দিকে টর্চ ফ্যালে ঋতু। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়।

আলনার ঠিক নীচে বেশ খানিকটা জায়গায় ধুলো এলোমেলো হয়ে আছে, অর্থাৎ মাঝে মাঝে সরানো হয় আলনাটা। মানে গোপন ঘরের দরজা আলনার পিছনেই আছে।

কসরত করে আলনাটা সরিয়ে ফ্যালে ঋতু। তারপর তিনটে আঙুল দিয়ে টোকা দেয় পিছনের দেওয়ালে।

দেওয়ালের ওপাশ থেকে ফাঁপা আওয়াজ আসছে। এখানে দেওয়ালটা সিমেন্টের নয়, কাঠের। রং করে সিমেন্টের মতো করে রাখা হয়েছে।

সিঁড়ির কাছ থেকে খসখস করে শব্দ আসছে একটা। কেউ উপরে উঠে আসছে। ঋতু ঘাবড়ায় না। চাকরি গেলে যাক, তার আগে এই মল্লিক বাড়ির রহস্যের সমাধান সে করবেই।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে ঋতু, দুটো হাত কাঠের দেওয়ালের উপরে রেখে সজোরে দু-দিকে টানতে থাকে সে। সরসর করে আওয়াজ হয় একটা। আরও জোর লাগবে, আরও জোর দরকার হাতে। পায়ের আওয়াজ ঘরের প্রায় ভিতরে ঢুকে এসেছে।

একটু একটু করে খুলে যায় পাল্লাটা। পিছন থেকে মিসেস মল্লিকের হিমশীতল গলা কানে আসে, "এই বয়সের মেয়েদের মরার এত সাধ জাগে কেন বল্-তো? তোর মতো বয়সেই আমার মেয়েটাও গেল... আর আজ তুই..."

একবারের জন্যে পিছন ফিরে তাকিয়ে ঋতু দ্যাখে, জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস মল্লিক। তাঁর হাতে একটা ছুরির ফলা চক্‌চক্ করছে। এতটা সিঁড়ি উঠে আসতে কষ্ট হয়েছে মহিলার। মুখটা হাঁ করে বড়োবড়ো নিশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। চেরা হাসি লেগে আছে মুখের একপ্রান্তে।

ঋতু বুঝল, মিসেস মল্লিক তাকে বেঁচে বেরোতে দেবেন না এখান থেকে। কী এমন লুকোনো আছে ঘরের ভিতর? সামনে তাকাল সে।

কাঠের দরজাটা এখন খুলে গ্যাছে। ভিতরের জমাট অন্ধকারের বুক থেকে ভেসে আসছে একটা বুনো জন্তুর কণ্ঠনালী নিঃসৃত কোনও শব্দ। সেই সঙ্গে একটা তীব্র অমানুষিক দুর্গন্ধ। ঋতুর মনে হল, এখুনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়বে সে।

কাঁপা-কাঁপা হাতে টর্চটা সামনে ধরল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চলন্ত হৃদপিণ্ড কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে এক পলকের জন্যে যে নারকীয় প্রাণীটাকে চোখে পড়েছে, তার সঙ্গে মানুষের কোনও মিল নেই। ঠিক যেন মানুষের কিছু ভাঙা হাড়কে চামড়ার মধ্যে জড়িয়ে তাতে চোখ-মুখ এঁকে দিয়েছে কেউ।

সেই জড়ানো থলেতে স্পন্দন আছে। দুটো হাত সামনে তুলে ধরে আলো থেকে চোখ আড়াল করতে চাইছে সে। মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে অবর্ণনীয় গোঙানির শব্দ।

আর্ত চিৎকার করে পিছিয়ে আসে ঋতু। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মল্লিকের ছুরি তার গলা ছুঁয়ে চলে যায়। কোণঠাসা বিড়ালের মতো অমানুষিক শক্তি এসে ভর করে ঋতুর গায়ে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিসেস মল্লিকের উপর। ছুরিটা কেড়ে নিয়ে চালিয়ে দেয় মহিলার মুখ লক্ষ্য করে। কাতর চিৎকার করে ওঠেন মিসেস মল্লিক। রক্তে ভরে ওঠে ঋতুর হাত। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটতে থাকে একতলার দিকে।

একতলায় পৌঁছে ছুরিটা একহাতে ধরেই ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয় সে। পুলিশের নম্বর ডায়াল করতে থাকে।

(সাত)

সুখলাল আর বৃন্দাবন এতক্ষণে তিনতলায় উঠে এসেছে। দোতলায় পৌঁছে মাটিতে পড়ে-থাকা একটা দেহ দেখতে পেয়েছে দু-জনে। পরিতোষ মল্লিক। ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে তার পায়ে। আঘাত যে ঋতুই করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের জ্ঞান আছে এখনও। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি।

তাঁকে দোতলাতেই রেখে তিনতলায় উঠে এল তিনজন। জোরালো টর্চের আলো এখন এসে পড়ছে ঘরগুলোর ভিতরে। ঘরটা চিনে নিতে ভুল হল না সান্যালের।

— "এদিকে এসো, সামথিং ইজ গোইং অন হিয়ার।"

গোঙানির আওয়াজটা শুনতে পেয়েছেন সান্যাল। একটা বন্যপ্রাণী যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তার।

তিনজনে এসে দাঁড়ালেন কাঠের দরজাটার সামনে। সুখলাল পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল। পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠছে গন্ধে। টর্চের আলো এখন গিয়ে পড়েছে দরজার ভিতরে। একটা ছোটো আট ফুট বাই আট ফুটের ঘর আলোকিত হয়ে উঠেছে তাতে।

ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে আছে কিছু যন্ত্রপাতি, মলমূত্র আর অভুক্ত খাবারের টুকরো, সেই খাবারের টুকরো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে একটা মানুষের মতো দেখতে উলঙ্গ প্রাণী। ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, তার একটা মুখ আছে, চুল আছে, চোখ আছে, ঠিক যেন একটা ভেঙে-যাওয়া কঙ্কালের গায়ে মানুষের গা থেকে খুলে আনা চামড়া জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

চোখে আলো পড়তে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে ঘরের এককোণে সরে যায় প্রাণীটা। মাটির উপরে উলটে শুয়ে আলো আড়াল করে।

— "হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস?" সান্যালের মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে আসে শব্দগুলো।

— "আমার বোন, যশোদা মল্লিক..." ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন

পরিতোষ মল্লিক, একটা হাত দিয়ে হাঁটু থেকে ঝরে পড়ে রক্ত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কোনওমতে, — "একসময়ে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল, বিশ্বাস করুন..."

(আট)

— "কিন্তু এটা তো..." সান্যাল প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন।

— "মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, তা-ই তো?"

সান্যাল আবার টর্চ ফেলেন প্রাণীটার গায়ে, একটু আগেই সিঁড়ির কাছে যশোদা মল্লিকের ছবিটা দেখেছেন তিনি, নাঃ, এ অসম্ভব।

দেওয়ালের একদিকে হেলান দিয়ে বসে পড়েন পরিতোষ মল্লিক, "আজ পঁচিশ বছর হল এই ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি ওকে। গোটা পৃথিবীর কাছে আমার বোন মৃত। দু-তিন দিনে একবার জল আর খাবার দেওয়া হয়। টয়লেট যা করার ওই ঘরেই..."

— "মাই গড! কিন্তু কেন?" সান্যাল বিশ্বাস করতে পারছেন না এখনও।

পরিতোষ মল্লিক হাসেন, "কেন? পঁচিশ বছর বয়সে বরুণ গোস্বামী নামে এক লইয়ারের প্রেমে পড়ে আমার বোন। তাকে বিয়ে করতে চায়। লোকটার পয়সাকড়ি তেমন ছিল না। ফলে আমার মায়ের মত ছিল না বিয়েতে। বোনও জেদ ধরে বসে। অগত্যা মা ওকে ঘরে বন্দি করে দেয়, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যশোদা কিছুতেই ভাঙতে চায় না, দু-পক্ষের জেদের মাঝে পঁচিশটা বছর কেটে গ্যাছে। আমার বোন মানুষ থেকে কীসে পরিণত হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন..."

কয়েক সেকেন্ডের থমথমে নিস্তব্ধতা এসে গ্রাস করে ঘরটাকে। শুধু খোলা কাঠের পাল্লার ভিতর থেকে বীভৎস কুৎসিত প্রাণীটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অস্ফুট শব্দ কানে আসছে।

হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়েন সান্যাল, "আপনি যা বলছেন সেটা বিশ্বাস

করা অসম্ভব। কেবল এই কারণে পঁচিশ বছর নিজের মেয়েকে এভাবে...”

— “আমার মাঝে মাঝে খারাপ লাগত জানেন, ভাবতাম, মানুষটাকে এভাবে অত্যাচার করার থেকে একেবারে মেরেই ফেলি। কিন্তু নিজে হাতে বিষ খাওয়াতে পারিনি কোনওদিন। সপ্তাহে দু-দিন দরজার তলার ফাটল দিয়ে ওকে খাবার দিয়ে যেতাম... ভাবতাম, একদিন এসে দেখব, খাবার পড়ে আছে, নিশ্চিত হব, মরে গেছে। কিন্তু ও মরেনি... মরেনি... কেন যে এতদিন বেঁচে আছে...” চোখ ঝাপসা হয়ে আসে মল্লিকের।

— “আপনি কোনওদিন বলেননি কাউকে?”

চোখ মুছে মাথা নাড়ান পরিতোষ, “আমি মায়ের অবাধ্য হইনি কোনওদিন। যশোদা যে আত্মহত্যা করেছে, সে গুজবটা আমার মা-ই ছড়িয়ে দেয় এলাকায়। বীভৎস রক্তারক্তির কথা শুনে কেউ বডি দেখতে আসেনি। তা ছাড়া এই এলাকায় মায়ের একটা আলাদা সম্মান ছিল। পুলিশকেও মা নিজেই ম্যানেজ করে।”

সান্যাল মাথা নাড়ান, “হুম। পুলিশ ফাইলসেও যশোদা মল্লিকের ঘটনার তেমন ভিভিড বর্ণনা নেই। যেন এই মৃত্যুটা গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট স্রেফ এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। সেটা দেখেই সন্দেহ হয় আমার।”

— “কয়েক বছর হল মা-কে বলেছি, এবার ওকে মুক্তি দাও তুমি। আর তো মরতে কিছু বাকি নেই ওর। মা রাজি হয়নি, ওকে কষ্ট দিয়ে কেন জানি না মনে মনে একটা তৃপ্তি পেত মা। মায়ের দেখাশোনার জন্যেই সারাদিনের লোক রাখি আমি। মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনত যে আমি যশোদার কথা তাকে বলছি কি না...”

দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরেন শিশির সান্যাল। গোটা ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাঁর। ঘরের ভিতর থেকে সেই প্রাণীটার গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে এখনও। বুকের ভিতর উত্তেজনাটা প্রতিমুহূর্তে ছলকে উঠছে সেই শব্দে। মানুষ এতটা নৃশংসও হতে পারে, সে ধারণা আগে ছিল না ওঁর।

পায়ের আওয়াজ শুনে দরজার দিকে মুখ ফেরায় সবাই। ঋতু উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে। তার একহাতে ধরা একটা কাচ-ভাঙা ছবি। সেটা নিয়ে সে

এগিয়ে যায় কাঠের দরজার খোলা পাল্লাটার দিকে। টর্চের আলো ভিতরে এসে পড়লে দেখা যায়, কুৎসিত, উলঙ্গ সেই প্রাণীটা সরু সরু হাতে মনের খেয়ালে একটা ধাতব পাতকে ঘষছে মাটির উপরে। কখনও ঘষা থামিয়ে পাতটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে। দাঁতগুলো প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। এত বছরে শক্ত কিছুতে কামড় দিতে গিয়ে ভেঙে গ্যাছে হয়তো।

তার সামনে এগিয়ে গিয়ে নোংরা মেঝেতেই বসে পড়ে ঋতু। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে হাড় উঁচু হয়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত মুখটার দিকে। ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে মানুষটা।

পঁচিশ বছর আগের ডাকসাইটে সুন্দরী যশোদা মল্লিকের ছবিটা তার সামনে তুলে ধরে ঋতু। মায়াময় হরিণের মতো দুটো চোখ, নিটোল মখমলের মতো চামড়া আর ঠোঁটের পাশে তিল। হলদে হয়ে যাওয়া ছবিতেও ঝরে পড়ছে তার অপরূপ লাবণ্য।

অবোধ বানরের মতো ছবিটা হাতে নেয় প্রাণীটা। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে ছবির মানুষটার দিকে। আচমকা ছবির একটা কোণা কামড়ানোর চেষ্টা করে, তারপর ছুড়ে ফেলে দেয় মেঝের উপর...

ব্লাঙ্ক মনিয়ের জন্ম হয় ১৮৪৯ সালে, ফ্রান্সে। দক্ষ শিল্পীর হাতে তৈরি শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো রূপ ছিল তাঁর। পঁচিশ বছর বয়সে এক আইনজীবীর প্রেমে আবদ্ধ হন তিনি। তাঁর মা এই বিয়েতে মত দেন না ও মা এবং দাদা মিলে জোর করে ব্লাঙ্ককে বাড়ির একটি ছোটো ঘরে বন্ধ করে দেন। পঁচিশ বছর সেই ঘরের ভিতরেই অর্ধভুক্ত ও রোগগ্রস্ত হয়ে কাটান তিনি। এর মধ্যে একবারের জন্যেও এই ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। নিজের মল, মূত্র, রক্তর উপরেই দিনরাত কাটত তাঁর। বেশির ভাগ দিন খাবার ও জল কোনওটাই জুটত না। বছরের পর বছর এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অনাহারে বন্দি থাকার ফলে ব্লাঙ্ক কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। জটিল রোগ এসে বাসা বাঁধে শরীরে। পঁচিশ বছর পরে যখন তাঁকে উদ্ধার করা হয় তখন পঞ্চাশ বছরের ব্লাঙ্কের ওজন ছিল মাত্র ২৩ কেজি। চামড়া ও মাংসের বেশির ভাগটাই পোকামাকড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল।

ব্লাঙ্ক মনিয়ের মা-কে গ্রেফতার করা হয় ও তাঁর বিচার হয়। পনেরো দিন পরে বাড়ির বাইরে জমা হওয়া উন্মত্ত জনতার রোষ দেখে ভয় পেয়ে তিনি মারা যান। দাদা মারসেল মনিয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে যান।

উদ্ধারের পর ফ্রান্সের একটি মানসিক হাসপাতালে রাখা হয় ব্লাঙ্ককে, সেখানে ১৯২৩ সালে, চৌষট্টি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্লাঙ্কের বন্দিদশার খবর পুলিশ পায় একটি উড়োচিঠি মারফত। সে চিঠি কে লেখেন তা আজও জানা যায়নি...



কাঠের ঘোড়া



— "খিদে পেয়েছে, না তোর?"

মানুষটার হাতে ধরা মাংসের হাড়টার দিকে তাকিয়ে সজোরে ল্যাজ নাড়াতে থাকে কুকুরটা। পিছনের দিকের একটা পা নেই তার। বাসের চাকায় কাটা পড়েছে। কোনওরকমে তিন পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। খাবারও জোটে না গায়ে জোর নেই বলে। দু-দিন হল ডাস্টবিন উলটে ফেলেও এক টুকরো এঁটোকাঁটার দেখা মেলেনি।

এখন চোখের সামনে ঝুলন্ত খাবার দেখে চাপাস্বরে কুঁইকুঁই করে ওঠে। সজল চোখে তাকায় ঈশ্বরের মতো এসে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে। দু-এক পা এগিয়ে আসে।

— "আয়, খাবি আয়..."

হাড়টা ডান হাতের মুঠোতে বন্ধ করে হাত এগিয়ে দেয় মানুষটা। কুকুরটা সেই মুঠো একবার শোঁকে। আবার চাপা স্বরে যেন খুলতে অনুরোধ করে মুঠো। ল্যাজটা আরও জোরে নড়তে থাকে।

— "আয় জবাই হবি আজ..."

মানুষটার মুখে একটা হাসি ফোটে। ডান হাতের বদলে বাঁ হাতটা এগিয়ে আসে কুকুরটার গলার কাছে।

(দুই)

আজ দরজা খুলে বেরোতেই ল্যান্ডিং-এর বারান্দা দিয়ে চোখে পড়ল দৃশ্যটা। কর্পোরেশনের লোক এসে রাস্তার উপর থেকে বস্তাবন্দি করে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটের বারান্দার সামনে দিয়েই যাচ্ছিল তারা। আগ্রহ হতে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে বলুন তো? কী আছে বস্তায়?"

— "কুকুর..." বাহকদের মধ্যে একজন উত্তর দিল।

— "কুকুর! আবার মরেছে!"

— "ধড়-মুড়ো আলাদা করে দিয়েছে। কী যে ফ্যাচাং হল..."

আমি একটু অবাক হলাম। গত সাত দিনে এই নিয়ে প্রায় চারটে কুকুর মরল এ পাড়ায়। এমনি মরলে তা-ও হত, কিন্তু এ যাকে বলে একবারে সিরিয়াল কিলিং। ছুরি দিয়ে বারবার গলায় কোপ মেরে খুন করা হচ্ছে। খুনের আগে একটা রাবারের ব্যান্ড জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গলায়, ফলে প্রাণীগুলোর আর্তনাদ কারও কানে যাচ্ছে না।

এমনিতে এ পাড়ার কুকুরগুলো তেমন উৎপাত করে না। নিজেদের নিয়েই থাকে। কোনওদিন কাউকে কামড়েছে বলে তো শুনিনি। তা-ও কার যে হঠাৎ কুকুরের উপরে এমন রাগ জন্মাল, কে জানে।

পাশের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নবদা আর তার ছেলে রন্টু বেরিয়ে এসেছে। রন্টুর বয়স কম। সে ভয়-ভয় চোখে রক্তের ছোপ-লাগা বস্তাটা দেখতে থাকে।

— "কী শুরু হল, বলুন দেখি..." আমার দিকে চেয়ে ব্যাজার মুখে বলেন নবদা, "রোজ অফিসে বেরোনোর সময় রক্ত দেখতে হচ্ছে। অলুক্ষুনে ব্যাপার যতসব।"

আমি মাথা নাড়ালাম, "এটা সেই ল্যাংড়া কুকুরটা মনে হচ্ছে। পাঁজরা বেরিয়ে গিয়েছিল, টিকে ছিল কোনওমতে। কে করছে বলুন তো?"

নবদা ঠোঁট উল্টালেন, "সে জানলে তো হয়েই যেত। কাল রাতে কী সব এঞ্জিও-টেঞ্জিও থেকে লোক এসে হম্বিতম্বি করছিল পাড়ায়... যে এইসব করছে, তাকে হাতে পেলে নাকি গণধোলাই দেবে ওরা..."

— "হেঃ..." আমি একটা বাঁকা হাসি হাসলাম, "ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, এদিকে নিধিরাম সর্দার। দেশে খোলা বাজারে খুন হচ্ছে, দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে লোকে ভেগে যাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আর সামান্য ক-টা কুকুর খুনের আবার সাজা! আপনিও হাসালেন মশাই!" একটু থেমে বললাম, "সাজা পরের কথা... আমি ভাবছি, খুনগুলো হচ্ছে কেন। কুকুরগুলো তো ক্ষতি করেনি কারও..."

— "আমার ছেলেটা তো রোজ খেতে দিত ওদের..." রন্টুর দিকে ফিরে তাকালেন নবদা, "কাল রাতেও তো দিয়েছিলি, নারে?"

রন্টু কিছু একটা বলে। আমি পরিষ্কার শুনতে পাই না। অন্য একটা শব্দ এসে ঢেকে দিয়েছে কথাগুলো। রাস্তাটার একেবারে উলটোদিকে চাটাই পেতে একটা লোক বসেছে। সে-ই আমাদের লক্ষ করে ডেকে উঠেছে, "কাঠের পুতুল নেবেন? ভালো ভালো পুতুল আছে... হেঁ হেঁ..."

আমরা তিনজনেই ফিরে তাকিয়েছি তার সামনে রাখা চাটাইটার উপরে।

সেটার উপর আপাতত সাজিয়ে রাখা আছে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক কাঠের পুতুল। পুতুলগুলোর দিকে একবার তাকালেই পছন্দ হয়ে যায়। নিখুঁত হাতের কাজ। তবে সব ক-টা পুতুলই জন্তুর। কোনওটা বাঘ, কোনওটা জিরাফ আবার কোনওটা ডাইনোসর। তাদের আবার নানারকম সাইজ। উপরে চকচকে পালিশ করা। সূর্যের আলো লেগে সাদাটে ঝলকানি একপাশ থেকে আর-একপাশে সরে যাচ্ছে।

আমিই সিঁড়ি দিয়ে একতলায় একটু এগিয়ে গেলাম। পুতুল-টুতুলের শখ আমার কোনওদিনই ছিল না। তবে পরশু সুস্মিতা বাড়ি ফিরছে। তার বাপের বাড়িতে একসময় এমন কিছু পুতুল ছিল বলে শুনেছি। বিয়ের পর থেকে ওগুলোকেই নাকি সব থেকে বেশি মিস করত।

— "কত করে?" চাটাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটা আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে একবার হেসে বলল, — "দেবেন, যা ইচ্ছা... কোন্টা লাগবে বলুন-না..."

লোকটার কাছাকাছি যেতেই খইনি আর চুনের গন্ধ নাকে আসে আমার। জামাকাপড় নোংরাটে, গায়ের রংটাও ঠিক কাঠের মতোই। তবে মুখটা গোলগাল। মনে হয় লোকটা গরিব। খ্যাপাটে গোছের। তবে জাতশিল্পী মানেই মাথায় একটু ছিট থাকে শুনেছি।

মনোযোগ দিয়ে পুতুলগুলো দেখতে লাগলাম। বাঘ নেব? উঁহুঁ, কমন। একটা শিয়ালও আছে। তবে মেয়েরা বোধহয় শিয়াল পছন্দ করে না। হাতিটা চলবে?

মনে পড়ল, বিয়ের আগে আমার ওজন খানিক বেড়ে যাওয়ায় সুস্মিতা আমাকে হাতি বলে ভেঙাত মাঝেমধ্যে। নাঃ, হাতি নৈব নৈব চ...

চাটাইয়ের একেবারে কোণের দিকে চাইতেই চোখ আটকে গেল আমার। অন্তত গোটা আটেক ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কোনওটা মাথা নামিয়ে ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে, কোনওটা যেন রেসের মাঠে চার পা হাওয়ায় মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি।

একটা আঙুল তুলে সেদিকে দেখিয়ে বললাম, "এগুলো তুমি বানিয়েছ?"

লোকটা মনে হয়, লজ্জা পেল একটু। উপরে নীচে মাথা দোলাল। বাবু হয়ে বসেছে সে। কিন্তু ডান পা-টা কেঁপে চলেছে ক্রমাগত। গুনগুন করে কিছু একটা দেশোয়ালি সুর ভাঁজছে।

— "বাবা! কাঠের উপরে তোমার হাত তো ফুটবলের উপর মারাদোনার পায়ের মতো চলে হে..."

— "হেঁ হেঁ... আসলে ওগুলো একটু বেশি যত্ন নিয়ে বানিয়েছি স্যার..." লাজুক গলাতেই বলে লোকটা, "অন্য পুতুলগুলো পয়সা রোজগারের জন্য বানানো, শুধু ওই ঘোড়াগুলো আমার মন থেকে আসে..."

— "মিউজ! তা রেসের মাঠে-টাঠে যাও নাকি?"

— "কী যে বলেন কত্তা..." রাস্তায় একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল। তার দিকে উদ্দেশ্য করে লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে, "দেখে যান, দেখে যান বাবু। কাঠের পুতুল... হাতি আছে, গন্ডার আছে, কুমির আছে... একদম আসলি চিজ!"

আমি একটা ঘোড়া হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকি। ঘোড়ার কোথাও একটাও ছেনির দাগও নেই। যেন কাঠ নয়, চামড়া!

— "এইটা কত পড়বে বলো তো?" ঘাস-খাওয়া ঘোড়াটাকেই তুলে নিই আমি।

লোকটা এবার জিব কাটে, "আজ্ঞে না স্যার। ঘোড়াগুলো বিক্রি নেই। ওগুলো শুধু বিজ্ঞাপন... হেঁ হেঁ..."

— "সে কী!" আমি একটু হতাশ হলাম। এর আগেও দেখেছি বড়ো শিল্পীরা সাধারণত তাদের সেরা কাজটা বেচতে চায় না। তা-ও আমি একবার শেষ চেষ্টা চালালাম, "পাঁচশো টাকা দেব কিন্তু, ভেবে দ্যাখো।"

— "বিক্রি হবে না স্যার... আপনি বরঞ্চ মিসেসের জন্য এইটা নিয়ে দেখুন..." লোকটা চাটাইয়ের মাঝখান থেকে একটা নাদুসনুদুস চেহারার শুঁড় চাগিয়ে-রাখা ঐরাবত তুলে দেয় আমার হাতে।

— "ধুর মশাই! হাতি চলবে না।"

— "আপনি নিয়ে যান-না। পছন্দ হলে পয়সা দিয়ে যাবেন। আমি এখানে কাল অবধি বসব।" গুনগুন করে আবার সেই সুরটা ভাঁজে লোকটা।

মনে মনে হাসলাম। লোকটা কাঠের সঙ্গে ব্যাবসাটাও ভালোই বোঝে। পয়সা দিতে আসলে আবার অন্য কিছু গছিয়ে দেবে আমাকে। বললাম, "তার দরকার হবে না। দাম কত এটার?"

কালো প্যাকেট হাতে নিয়ে ফ্ল্যাটে ফেরার সময়ে আবার নবদার সঙ্গে দেখা হতে তিনি প্যাকেটের দিকে ইশারা করলেন, "কিনলেন নাকি?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ। মরা হাতি শুনেছিলাম লাখ টাকা। কাঠের হাতি কিন্তু সস্তায় পেলাম মশাই।"

— "তুমি রাইস আদমি বলে কথা, বাড়িতে একটা হাতি পোষা কি চাট্টিখানি কথা রে ভায়া?"

দু-জনেই হেসে উঠলাম। নবদা সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, — "আচ্ছা, লোকটা কবে থেকে বসছে এখানে?"

— "এই ধরো দিন সাতেক।"

— "হুম! রোজই বসে?"

— "হ্যাঁ, রোজই তো অফিস বেরোনোর সময় দেখি, চাটাই নিয়ে বসেছেন। রন্টু বলছিল বিকেলের দিকে কাস্টমার কমে এলে ফাঁকা সময়টায় একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাজায়। অনেকটা হারমোনিকার মতো, তবে কাঠের। মনে হয় ওঁর নিজেরই তৈরি। ভারী সুন্দর সুর তোলে। তা ছাড়া সব সময় হাসিমুখ। আমার জীবনে দেখেছি, যেসব লোক অকারণেই সারাক্ষণ হাসে, তারা মোটেই সুবিধের নয়, একটু সামলে ভায়া..."

নবদা নীচে নেমে যেতে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। দরজাটা ভিতর থেকে লক করে দিয়ে প্যাকেট থেকে হাতিটা বের করে ডাইনিং টেবিলের উপরে বসিয়ে রাখলাম।

এ ফ্ল্যাটটা আমি আর সুস্মিতা মিলে বিয়ের আগেই কিনেছিলাম। তবে এসে থাকতে শুরু করেছি সপ্তাহ দুয়েক হল। ফ্ল্যাটবাড়িতে পাড়াপড়শি বলে তেমন কিছু থাকে না। আমাদেরও এখানে কারও সঙ্গেই তেমন আলাপ হয়নি। ওই নবকিশোরবাবু ছাড়া। ভদ্রলোক আগে নৈহাটিতে থাকতেন। সেখানের বাড়ি বেচে মাসখানেক আগে ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠেছেন এই ফ্ল্যাটে। মানুষটা

শিশুকে হলেও তাঁর ছেলে আর বউয়ের সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি আমার। দু-দিন আগে অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছে সুস্মিতা। জায়গাটা একটু গ্রামের দিকে বলে সবসময় যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পরশু ফেরার কথা আছে।

টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে মন দিয়ে গজরাজকে দেখতে দেখতে ভারী অদ্ভুত একটা খেয়াল এসে চেপে ধরল আমাকে। মনে হল, ঠিক এইরকম হাতি আমি আগেও দেখেছি। অবিকল এই ভঙ্গিমা। কাঠের উপরে ঠিক একই রকম হাতের কাজ। পুতুলটা যত দেখছি তত মনের ভিতরে বদ্ধমূল হচ্ছে ধারণাটা। আশ্চর্য!

অফিসে ছুটি চলছে। সাতসকালে করার কিছু নেই। ফলে এই উটকো ভাবনাটাই আমার মনটাকে ছেলেধরার মতো ব্যাগে ভরে ফেলল। কী মনে হতে আলমারি খুলে তার ভিতর থেকে পুরোনো ছবির অ্যালবাম বের করে আনলাম।

ক-দিন আগেই সুস্মিতা বাপের বাড়ি থেকে কপি করিয়ে নিয়ে এসেছে এগুলো। বেশিব. ভাগই তার নিজের ছেলেবেলার ছবি।

ছবিগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগলাম। অন্যসময় হলে আমার মুখে আলগা একটা হাসি ফুটত ছবিগুলো দেখে। তবে এখন কিছু খুঁজে চলেছে আমার চোখ।

একটা পাতায় এসে আটকে গেলাম। সুস্মিতার বছর দশেকের একটা ছবি। একটা শোকেসের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সে হাসছে।

শোকেসের ভিতরে রাখা আছে কয়েকটা কাঠের পুতুল। কোনওটা বাঘ, কোনওটা জিরাফ আবার কোনওটা হাতি। ছবিটা চোখের কাছে এনে দেখলাম। একই হাতের কাজ, একই রকম নিখুঁত ফিনিশিং, একই রকম ল্যাজের গঠন... আমি শিল্পবিশারদ না হলেও নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার সামনে রাখা কাঠের পুতুল আর ওই শোকেসের জন্তুগুলোর কারিগর কোনওমতেই আলাদা লোক নয়...

বাইরে রাস্তার উপর থেকে একটা সুরেলা শব্দ ভেসে আসছে। ভারী করুণ একটা সুর তুলেছে মানুষটা। একটু আগে এই সুরটাই গুনগুন করছিল মনে

হয়। বুকের ভিতর অবধি যেন নিস্তব্ধ করে দিচ্ছে সেই আওয়াজ। মাথার ভিতরে ঝিমঝিমে একটা অনুভূতি খেলা করে চলেছে।

(তিন)

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কল রিসিভ করল সুস্মিতা। সারাদিনে আমি অন্তত বার তিনেক কল করেছি। ফোন নট রিচেবল। এগারো নম্বর বারে ওপাশ থেকে তার অবসন্ন গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ বলো। আজ সারাদিন যা ধকল গিয়েছে, কী বলব..."

— "তোমার সেই কাঠের পুতুলগুলোর কথা মনে আছে?"

আচমকা প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়েছে সুস্মিতা। থতোমতো খেয়ে বলল, "অ্যাঁ? পুতুল! সে মনে থাকবে না কেন? কিন্তু ওসব কথা..."

— "কোথা থেকে কিনেছিলে ওগুলো?"

এবারে একটু রাগত গলা শোনা যায়, "সারাদিন পরে একবার ফোনে নেটওয়ার্ক এল আর তুমি পুতুল পুতুল করছ!"

— "ব্যাপারটা ইম্পর্ট্যান্ট, প্লিজ একটু ভাবার চেষ্টা করো। কোথা থেকে কিনেছিলে ওগুলো?"

— "আমি কিনব কী করে? যদ্দুর, মনে পড়ছে কেউ গিফ্‌ট করেছিল। প্লাস্টিকের খেলনা নাকি হার্মফুল তাই কাঠের খেলনা..."

— "কে গিফ্‌ট করেছিল মনে নেই?"

সুস্মিতা এবার ভাবার চেষ্টা করে, "তোমাকে তো রাঙ্গামাসির কথা বলেছি। উনি মনে হয় দিয়েছিলেন।"

— "ওঁর নম্বরটা পাঠাও তো আমাকে।"

— "আরে, সে তো মারা গেছে তিন বছর আগে। তবে... রাঙামেসো বেঁচে আছে।"

— "বেশ, সেটাই পাঠাও।"

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে আমার ফোনে একটা মেসেজ ঢোকে। সেটা চেক করতে করতে বলি, "আচ্ছা বেশ। পরে কল করছি।"

— "তোমার কী হয়েছে বলোতো?"

— "না না! কী হবে আবার... রাখলাম, হ্যাঁ?"

ফোনটা প্রায় মুখের উপরেই কেটে দিয়ে আমি নম্বরটা ডায়াল করলাম। কিছুক্ষণ রিং হবার পর একটা বয়স্ক ভারী কণ্ঠ শোনা গেল। আজেবাজে কথায় কিছুটা সময় নষ্ট হল। খানিক খেজুরে আলাপ করে আমি আসল প্রসঙ্গে গেলাম, "আচ্ছা পুতুলগুলো কোথা থেকে কিনেছিলেন বলুন তো?"

উত্তর দেওয়ার আগে খানিক স্মৃতি হাতড়ালেন ভদ্রলোক। তারপর টানাটানা স্বরে বললেন, "সে তো আজ প্রায় পনেরো বছর আগের কথা রে ভাই। আর কিনেওছিলেন তোমার মাসিমা..."

— "আপনাকে বলেননি?"

ব্যঙ্গের হাসি মিশে যায় লোকটার কথায়, "তা মেয়েরা তো কতরকম কথা বলতে থাকে সারাদিন। সেসব কি আমি মন দিয়ে শুনেছি না তুমি মন দিয়ে শোনো?"

— "মানে আর জানা যাবে না?" আমি হতাশ গলায় বললাম।

একটুক্ষণ পরে আবার কথা ভেসে আসে ওপাশ থেকে, "তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আর্জেন্ট। তোমাদের মাসিমা তো ডায়েরি লিখতেন। পুতুলগুলো কেনার কথাও তাতে লেখা থাকতে পারে। তবে তাতে একটু খুঁজতে হবে যে..."

— "প্লিজ একটু দেখুন যদি থাকে।"

— "আচ্ছা বেশ। আমি রাতের মধ্যে জানাই তোমাকে, কেমন?"

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। জানি না কেন, এত ছোটো একটা ব্যাপারে মনটা অস্থির হয়ে উঠছে বারবার। মনে হয় হাতে আর কোনও কাজ নেই বলেই। মাথার ভিতরে সেই খইনিখোর পুতুলওয়ালাটার মুখ ভেসে উঠছে বারবার। সুস্মিতার বাড়িতে তার তৈরি করা পুতুল থাকাটা মোটেই আশ্চর্যের কিছু না... তা-ও... জানি না কেন মনটাকে শান্ত করতে পারছি না

কিছুতেই।

অস্থির ভাবটা কাটাতেই নবদাকে ফোন করে নিমন্ত্রণ করলাম বাড়িতে। বললাম অফিস থেকে ফিরে সত্বর আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসতে। রাতের খাওয়া এখানেই সেরে নেওয়া যাবে। ভদ্রলোক মনে হয়, একটু অবাকও হয়েছেন।

তিনি যখন দরজায় কলিং বেল বাজালেন, ততক্ষণে আমার রান্নাবান্নার পাট চুকে গিয়েছে। সুস্মিতার অ্যালবামের ছবিগুলো আরও ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিলাম এতক্ষণে। নবদা আসতেই তার সামনে এগিয়ে দিলাম সেগুলো, বললাম, "দেখুন তো, মনে হচ্ছে না একই শিল্পীর কাজ?"

ভদ্রলোক আমার হাবভাব দেখেই হয়তো কথার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। ছবিগুলো মিনিটখানেক সরেজমিন করে বললেন, "সিমিলারিটি একটা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি একটা ব্যাপার বুঝছি না ভায়া..." ছবি নামিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "ধরে নিলাম তোমার ছবির পুতুলগুলোও ওই লোকটারই বানানো। আজ থেকে পনেরো বছর আগে, মানে লোকটার তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছাকাছি। তো ওই বয়সে একটা লোক যদি কাঠের পুতুল বিক্রি করে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে? ছবিটা কাল সকালে না হয় দেখিয়ো লোকটাকে..."

— "আপনি বুঝতে পারছেন না, নবদা..." আমি হাতের উপরে একটা ঘুসি মেরে বললাম, — "লোকটা কতদিন আগে এখানে এসেছে বলেছিলেন?"

— "সাত দিন হবে..."

— "কুকুর মরা কবে থেকে শুরু হয়েছে?"

একটু থমকে উত্তর দিলেন নবদা, "ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়। মানে তুমি বলতে চাইছ, লোকটাই খুন করছে কুকুরগুলোকে? কিন্তু কেন?"

আমি মাথা দোলালাম, "তা জানি না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, লোকটার পুতুল বেচা ছাড়াও অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।"

— "কীরকম উদ্দেশ্য?"

— "তা বলতে পারব না। তবে কাজটা সে রাতে করতে চায়। কুকুররা

রাতে পাড়া পাহারা দেয়। ফলে সব ক-টা কুকুরকে খতম করে দিলে ওঁর কাজটা নির্বিঘ্নে হতে পারে...”

— “আঃ! ভারী অ্যাবসার্ড কথা বলছ হে তুমি। গত এক সপ্তাহে এ পাড়ায় কারও বাড়ি চুরি হয়নি।” নবদা প্রতিবাদ করে ওঠেন।

— “হয়নি। হতে চলেছে। এবং আমার মনে হয় কাজটা সাধারণ চুরিজাতীয় কিছু নয়... এত আটঘাট বেঁধে কেউ চুরি করে না।”

আমি নবদার পাশটায় এসে বসে পড়ি। দুটো হাতের মধ্যে মাথা রেখে মাটির দিকে চেয়ে থাকি। তিনি একটা হাত রাখেন আমার পিঠে। খানিক নরম গলায় বলেন, “সত্যি করে বলো তো কী হয়েছে... সাধারণ একটা চুরির আশঙ্কায় তুমি এতটা ভেঙে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে না...”

ধীরে ধীরে মাথা তুলি আমি, “জানি না কেন আমার বার-বার মনে হচ্ছে, এই লোকটার কাজের সঙ্গে সুস্মিতার কিছু একটা যোগ আছে।”

— “সুস্মিতার!”

— “হ্যাঁ। ও এখন পাড়ায় নেই। তাই হয়তো অপেক্ষা করছে লোকটা। এ বাড়িতে এলেই কোনওভাবে আক্রমণ করতে চায়...”

— “বেশ, তো তুমি ওকে আপাতত আসতে বারণ করো।”

— “কী বলে বারণ করব? যে একটা পুতুলওয়ালাকে ভয় পাচ্ছি?”

নবদা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসছে। আমি রিসিভ করে লাউডস্পিকারটা অন করে দিলাম, “ডায়েরিটা পেয়েছি, বুঝলে? আর গুড নিউজ হল, এতে তোমার পুতুলগুলোর কথাও লেখা আছে।”

— “কী লেখা আছে?”

— “জন্মাষ্টমীতে আমাদের এখানে একটা মেলা হত। সেখানেই একটা অল্পবয়সি ছেলের থেকে কিনেছিল পুতুলগুলো।”

— “অল্পবয়সি ছেলে? মানে বছর কুড়ির?”

— “না না, আর-একটু বেশি। তবে বয়স কম হলে কী হবে? ছেলের কাজ ছিল ভারী চৌকশ। তোমার মাসিমার এত পছন্দ হয়েছিল যে একসঙ্গে

সব পুতুল কিনে নিয়েছিলেন। কেবল ঘোড়াগুলো সে বেচতে চায়নি।"

ফোনের উপর আমার হাতের আগল আলগা হয়ে এসেছিল। তাকিয়ে দেখলাম, নবদার ভুরুও কুঁচকে গিয়েছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদিক থেকে অপ্রয়োজনীয় কিছু কথা বলেই চলেছেন, — "ছেলেটা তোমার মাসিমাকে বলেছিল, কিনতে চাইলে সে পরের দিন আরও কাঠের পুতুল নিয়ে আসবে, কিন্তু ওঁর আর পরের দিন যাওয়া হয়নি..."

— "যাওয়া হয়নি কেন?"

কয়েক সেকেন্ড পরে উত্তর ভেসে আসে, "এখানে লেখা আছে, ওঁর পোষা কুকুরটা সেদিনই মরে গিয়েছিল, বুঝলে? ডাক্তার বলেছিল বিষক্রিয়া... ওদের আশপাশে নাকি বেশ কয়েকটা বাড়িতে... যাক গে। পরের বছর মেলায় গিয়ে তোমার মাসিমা আর দেখতে পায়নি ছেলেটাকে। এগুলো পড়তে পড়তে কত পুরনো কথা..."

ফোনটা কেটে দিলাম আমি। ধপ করে বসে পড়লাম চেয়ারের উপরে। নবদা আমার কাঁধে দুটো হাত রাখলেন, "ব্যাপারটা আর অতটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু..."

— "একটাই উপায় আছে আমাদের কাছে..." আমি মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললাম।

— "কী উপায়?"

— "লোকটা সাত দিনে চারটে কুকুরের গলা কেটেছে। এ পাড়ায় আরও দু-চারটে কুকুর ঘুরে বেড়ায়। হয়তো আজ রাতেও অভিযান চালাবে সে। আপনি আর আমি যদি আজ রাতটা একটু সতর্ক থাকি..."

নবদা মাথা নাড়ালেন, "পরশু সুস্মিতা ফিরছে। তার আগেই কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু... লোকটার হাতে ছুরি থাকে নিশ্চিত..."

— "আমাদের হাতেও থাকবে..." আমি ডাইনিং টেবিলের উপর পড়ে থাকা ধারালো ছুরিটা হাতে তুলে নিই, "কাঠের উপরে না-হোক, মানুষের মাংসে নির্ঘাত চালাতে পারব।"

(চার)

ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে একটানা। সেই সঙ্গে শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে ছাদ জুড়ে। ছাদের দুটো প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু-জন। আমাদের ফ্ল্যাট এ পাড়ায় সব থেকে উঁচু। ফলে দু-প্রান্তে দু-জন দাঁড়ালে গোটা পাড়াটাই চোখে পড়ে। আজ ভরা চাঁদের আলো আছে আকাশে। সে আলোয় ফাঁকা পড়ে থাকা রাস্তা আর তার পাশে অন্ধকার ঝোপঝাড় মায়াবী জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছে।

গত এক ঘণ্টায় দু-দিকের কোনও রাস্তাতেই মানুষের চিহ্ন দেখা যায়নি। কেবল কয়েকটা কুকুর-বিড়াল হেঁটে গিয়েছে। একপ্রান্ত থেকে হেঁটে এসে কোনও বাড়ির পাশ দিয়ে মিলিয়ে গেছে। ঘুম যাতে না আসে সেজন্য গান চালিয়ে রেখেছি আমি। মাঝে মাঝে অকারণেই প্রশ্ন করছি নবদাকে লক্ষ্য করে। ভদ্রলোক যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন।

— "আপনাকে জাগিয়ে রাখা অন্যায় হচ্ছে, জানি। সারাদিন অফিস করে..."

— "আরে, এ আর কী? পরের মাসে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হচ্ছে তো। তারই একটু প্র্যাকটিস হচ্ছে আর কী..."

ছাদের পাঁচিল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছি দু-জনে। ফলে নীচ থেকে আমাদের দেখতে পাবার কথা নয়। আমি রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখেই বললাম, "ভারী তাজ্জব ব্যাপার, না? আজ যদি রাস্তায় একটা জেল-পালানো খুনি, কিংবা মব বস গলা কেটে পড়ে থাকত তাহলে মিডিয়া-পুলিশের মেলা লেগে যেত... অথচ ক-টা নিষ্পাপ কুকুর খুন হচ্ছে বলে কারও হেলদোল নেই তেমন... খুনিকে ধরার চেষ্টাও করছে না কেউ..."

ওপাশ থেকে উত্তর এল না। ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন, বিশ্বকাপের ব্যাপারটা নিয়েই কিছু বলব আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে, জানেন?"

— "কী?"

— "কুকুরজাতীয় প্রাণীর কগনিটিভ প্রিমোনিশন বলে একটা ক্ষমতা থাকে। খারাপ কিছুর সম্ভাবনা তারা আঁচ করতে পারে। ধরুন, যে পাঁঠা কোনওদিন কসাইখানা দেখেনি, সে-ও সহজে কসাইখানায় ঢুকতে চায় না। টানাটানি করে ঢোকাতে হয়। কুকুরগুলো কি লোকটাকে দেখে বুঝতে পারে না লোকটার উদ্দেশ্য ভালো নয়?"

— "সে বুঝলেই বা, আদতে তো হ্যাংলা প্রাণী। হাতে খাবার দেখেই গলে যায় হয়তো..."

— "সেখানেও একটা সমস্যা আছে... কুকুর রাতবিরেতে সাধারণত দল বেঁধে বড়ো কোনও রাস্তায় শুয়ে থাকে। ঝুন্ডের মাঝে একটা কুকুরকে খাবার দেখালে সবাই দেখতে পাবে। সবাই মিলে ছুটে এলে খুন করে পালানো সম্ভব নয়..."

— "তাহলে?"

— "আমার মনে হয় দিনের বেলা লোকটা একটা কুকুরকে টার্গেট করে নেয়। তাকে একাকী কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়। সকালে কুকুর দল বেঁধে থাকে না। ফলে কাজটায় অসুবিধে হয় না। রাতে সে হাতে খাবার নিয়ে আসে বটে, কিন্তু প্রথমেই সেটা দেখায় না। দলের পাশ দিয়ে আওয়াজ করে হেঁটে চলে যায়। যে কুকুরটা সকালে খেতে পেয়েছিল সে-ই আবার খেতে পাবার আশায় পিছন পিছন যায়। বাকিরা আগের মতোই শুয়ে থাকে... আর তারপরেই..."

— "ওই... ওই যে..." আমার কথার মাঝেই চাপা চিৎকার করে ওঠেন নবদা। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি, ওঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেছে। যেন কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, "একটা আওয়াজ আসছে। শুনতে পাচ্ছ?"

শনশন হাওয়ার শব্দ কানে আসছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কিছু মিশে আছে কি? আমি কান খাড়া করে শুনতেই আওয়াজটা চিনতে পারলাম। আবার সেই যন্ত্রটা বাজছে। আবার সেই চেনা সুর। খুব ক্ষীণ, তা-ও সুরের উৎস লক্ষ্য করে অন্ধকারের বুকে কিছু খোঁজার চেষ্টা করলাম। তার আগেই

নবদার একটা আঙুল উঠে এসে দূরে কিছু দেখানোর চেষ্টা করে আমাকে, "ওই একটা নড়ছে। ওই... রাস্তার উপরে দেখতে পাচ্ছ?" নবদা উত্তেজিত গলায় বলেন।

জিনিসটা আমারও চোখে পড়েছে। রাস্তাটা আমাদের থেকে একশো মিটারের বেশি দূরে না। বিড়বিড় করে বলি, "হাতে কিছু আছে মনে হচ্ছে। বস্তা জাতীয় কিছু..."

আমি আর অপেক্ষা করি না। ছাদ পেরিয়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকি। লোকটা বড়ো রাস্তার উপরেই আছে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে পারলে ওকে এক্ষুনি ধরতে পারব।

এতরাতে লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে কোনওরকমে একতলায় নেমে আসি। উপরের তলায় পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি, নবদাও আসছেন আমার পিছন পিছন। তাঁর হাতে একটা লাঠি আছে। আমি ডান হাতে ছুরিটাকে শক্ত করে ধরে ছুটতে থাকি বড়ো রাস্তার দিকে। লোকটা যে-ই হোক, তাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া যাবে না।

পিছনে তাকিয়ে দেখি, নবদাও আমার ঠিক পিছনেই দৌড়ে আসছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এই বয়সেও তাঁর পায়ে বেশ জোর আছে। গলা তুলে বললেন, — "মনে হয়, বস্তা নিয়ে এদিকেই আসছে। একবার ধরতে পারলে জানোয়ারটাকে..."

আমাদের পাড়ার রাস্তাটা যেখানে মেন রোডে মিশেছে ঠিক সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। এখান থেকে সোজা সামনে তাকালে দেখা যায়, রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কালচে শরীর পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার থেকে একটু দূরে একটা বড়ো সাইজের বস্তা। এতক্ষণ রাস্তার উপরে ঘষে ঘষে সেটাকে টেনে এনেছে সে।

আমরা দু'জনে রাস্তার ধারের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ক-দিন হল পাড়ার ল্যাম্পপোস্টগুলো কারা যেন ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। এখন অবশ্য সে উত্তর জানতে বাকি নেই আমাদের।

সেই চেনা সুরটা এখন স্পষ্ট কানে আসছে। মনে হয়, বস্তাটা এত দূর টেনে

এনে হাঁপিয়ে গেছে মানুষটা। দু-হাতে মুখের কাছে কিছু একটা যন্ত্র ধরে সুরটা বাজিয়ে চলেছে সে। যন্ত্রটা হাতে ঢাকা পড়ে গেছে বলে ঠিক দেখা যায় না। তাও মনে হল, শিঙে আর হারমোনিকা মিলিয়ে যেন তৈরি হয়েছে যন্ত্রটা।

চাপাস্বরে বাজাচ্ছে লোকটা। যেন যন্ত্রের নলের ভিতর থেকেই বুকের ভিতর দম টেনে নিচ্ছে। এই রুপালি জ্যোৎস্নায় খোলা রাস্তা আর ঘুমন্ত বাড়িঘরগুলোকে যেন ঘুম পাড়াতে চায় সুরটা।

— "এ্যাঁ তো পুরো সাইকো। খুন করে বডির সামনে বসে হারমোনিকা বাজায়!" নবদা ফিশফিশ করে বলে।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। শক্ত করে ধরে রইলাম ছুরিটা। লোকটা পালানোর চেষ্টা করবে না হয়তো। কুকুর খুনের জন্য তেমন বড়ো সাজা তার হবে না...

খানিক পরে যন্ত্রটা পকেটে ঢুকিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায় লোকটা। একবার দু-হাতে চোখ মোছে। বস্তাটাকে হাতে ধরে এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের দিকে। তার ক্লান্ত নিশ্বাসের শব্দ এখান অবধি শোনা যাচ্ছে। সে শব্দের মধ্যে মনে হল, মৃদু কান্না মিশে আছে।

খইনির গন্ধ পাচ্ছি কি? নাকি মনের ভুল?

আবার সামনে এগোতে শুরু করেছে লোকটা। দশ মিটার... পাঁচ মিটার... এবার একেবারে আমাদের হাতখানেকের মধ্যে এসে পড়েছে।

আমার পাশ থেকে একটা শরীর বিদ্যুতের মতো ছিটকে গেল তার দিকে, লোকটা আচমকা আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। মুখ দিয়ে ক্ষীণ আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল রাস্তার একধারে। বস্তাটা রাস্তার মাঝখানেই পড়ে রইল।

নবদা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছিটকে গেল মাটিতে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে, "হারামজাদা, একটুও নড়েছিস কি পা একেবারে গুঁড়ো করে দেব..."

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে সামনে তুলে ধরলাম। লোকটার মুখের উপরে আলো গিয়ে পড়তেই একটা হাত দিয়ে আলোটা আটকানোর চেষ্টা করল সে।

তিনটে প্রাণীর ক্লান্ত নিঃশ্বাসের শব্দে ভরে উঠল ফাঁকা রাস্তাটা। আলোটা একবার বস্তার উপর ফেলে দেখে নিলাম। চুঁইয়ে চুঁইয়ে কালচে লাল রক্ত পড়ছে সেটা থেকে।

— "নিরীহ অবলা প্রাণীগুলোকে খুন করতে হাত কাঁপে না শালা তোর?" আমি ছুরিটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

নবদা লোকটার হাঁটুতে সজোরে একটা আঘাত করল লাঠি দিয়ে।

— "ওরে ওরে... মারিস না রে... আমি চলতে না পারলে..." লোকটা একবার কঁকিয়ে উঠে হাঁটু চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাঁটুতে নেমে এল লাঠি। লোকটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। যেভাবে লেগেছে, তাতে মালাইচাকি সরে গেছে হয়তো।

— "কেন খুন করিস কুকুরগুলোকে?" লোকটার পেটের উপরে একটা পা রাখলাম।

সে কোনও উত্তর দিল না। হাঁটুর যন্ত্রণায় কুকুরের মতো কুঁইকুঁই শব্দ করে চলেছে ক্রমাগত। নবদা আবার মারতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম, "থাক, আবার পুলিশের হুজ্জুতি হবে। কাল সকালে একে পুলিশে দিয়ে দেব। ওরাই যা করার করবে..."

এতক্ষণ লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। এবার জামার দিকে নজর যেতেই আমার গা শিউরে উঠল। গোটা পাঞ্জাবি জুড়ে কালচে শুকনো রক্তের ছিট-ছিট দাগ। সম্ভবত এই পাঞ্জাবিটা পরেই রাতে খুন করে সে। তার গালে সজোরে একটা চড় মারলাম আমি। আবার কঁকিয়ে উঠল লোকটা।

— "কাল সকালে এ মক্কেল তো হাওয়া হয়ে যাবে... অবশ্য পায়ে যা ডোজ দিয়েছি বেশি দূর যেতে পারবে না..."

— "উঠে দাঁড়া।" আমি লোকটার দিকে চেয়ে বললাম। সে একবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কাদার মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

— "বেশ। বসেই বসেই স্বীকারোক্তি দে..."

আমি ফোনের ভিডিয়ো রেকর্ডিং-এর বাটানটা চালিয়ে দিলাম, "বল শালা, কেন খুন করিস কুকুরগুলোকে?"

লোকটাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার লাঠির বাড়ি মারতে যাচ্ছিল নবদা। তার আগেই হাত দিয়ে সেটা আটকানোর চেষ্টা করে সে, "বলছি বলছি... কুকুর... কুকুর আমি সহ্য করতে পারি না... ওদের দেখলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়..."

লোকটার গলায় কোনও অনুশোচনা নেই। যেন গায়ের ঝাল মেটাতেই কথাগুলো বলছে সে।

— "এ পাড়ায় যতগুলো কুকুর খুন হয়েছে, তাদের কে মেরেছে?"

— "আমি..."

রক্তের দাগ-লাগা বস্তাটার দিকে ক্যামেরাটা একবার ঘোরালাম আমি। তারপর বন্ধ করে দিলাম রেকর্ডিংটা।

— "যা, ভাগ হারামজাদা। কাল সকালে হয় পুলিশের লোক তোর বাড়ি যাবে, না হয় পাগলাগারদের..."

লোকটার উঠে পালানোর ক্ষমতা নেই। তার বুকের উপরে একদলা থুতু ফেলে নবদা বাড়ির রাস্তা ধরল। আমিও তার পিছু নিলাম।

এতটা দৌড়া-দৌড়ি আর উত্তেজনার পরে শরীর ঝিমিয়ে আসছিল। পায়ে জোর পাচ্ছি না তেমন। তা-ও, মনের ভিতরে একটা গর্বের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল বারবার।

নবদা মুখ দিয়ে চকচক করে একটা আওয়াজ করল, "আরও দু-ঘা দিয়ে এলে হত। কুকুর মারার জন্য পুলিশ আর কীই বা করবে... দু-তিনদিন কড়কানি খেয়ে আউট হয়ে যাবে..."

— "ভাবছি, ভিডিয়োটা কাল সোশ্যাল মিডিয়ায় দেব। ভবিষ্যতে যদি এসব করার চেষ্টা করে..."

পাশে তাকিয়ে দেখি, নবদার ভুরুটা কুঁচকে আছে। আমি একটু ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

— "একটা ব্যাপার ভারী অদ্ভুত, বুঝলে?"

— "কী?"

— "লোকটা খুন করে ফিরছিল, কিন্তু কোনও ছুরি ছিল না কাছে। আমি

তো ওর গায়ের উপরে গিয়ে পড়েছিলাম। গায়ের কোথাও ছুরি আছে বলে তো মনে হল না...”

আমি উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না। জানি না কেন মনে হল, লোকটা চাইলে অস্বীকার করতে পারত দোষটা। তাকে আমরা বস্তাটা টেনে আনতে দেখেছি। খুন করতে দেখিনি। যেন ইচ্ছা করেই দোষ স্বীকার করে নিল সে। তা ছাড়া আর-একটা ব্যাপার আজ রাত থেকেই মনের ভিতর খোঁচা দিচ্ছে। সুস্মিতার বাড়িতে কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছিল, কিন্তু এ পাড়ারগুলোকে গলা কেটে মারা হয়। তাহলে কি এই পনেরো বছরে এমন কিছু ঘটেছে, যাতে কুকুরদের উপরে তার রাগ বেড়ে গেছে? নাকি দুটো লোক আলাদা? কিন্তু তা কী করে...

পিছন ফিরে দেখলাম কোনওরকমে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। যন্ত্রণাময় দেহটা টেনে নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের দিকে...

(পাঁচ)

কাল বাড়ি ফিরে শুতে শুতেই চারটে বেজেছিল। সাড়ে তিনটে নাগাদ আমার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন নবদা। তার আগে অবধি লোকটাকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শেষে ভোরের ঘুম চোখে এসে লাগাতে তিনি উঠে গিয়েছেন। আমি আর ওঁকে এগিয়ে দিতে যাইনি।

আজ ভেবেছিলাম, দেরি করে ঘুম থেকে উঠব। কিন্তু সকালের দিকেই দরজায় টোকা পড়ছে জোরে জোরে। কোনওরকমে ঘুম কাটিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, নবদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, কোনও বিপদে পড়ে এসেছেন।

— “আমার নাম রেবতী... আপনার পাশের ফ্ল্যাটে...”

— “হ্যাঁ... হ্যাঁ... চিনি আমি। কী ব্যাপার বলুন তো? এত সকালে...”

— “আপনি একটু আমার ঘরে আসবেন?”

অনুরোধটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আপত্তিও করা যায় না। বললাম, "একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে যাই?"

মহিলা আর কিছু না বলে মাথা নেড়ে ফিরে গেলেন। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। রেবতীদেবী সচরাচর নিজে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন না।

খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়েই কলিং বেল বাজালাম। রন্টু দরজা খুলে দিল। আমাকে সোফাটা দেখিয়ে বলল, "মা আপনাকে বসতে বলেছে।"

আমি বসতে সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ওপাশ থেকে তার পড়ার শব্দ শুনে বুঝলাম, সে ইংরেজি পড়ছে।

সুস্মিতার নম্বরটা ডায়াল করতে রিং হল। সে ফোন ধরেই বলল, "কাল কী হয়েছিল বলোতো তোমার? হুট করে কেটে দিলে ফোনটা..."

— "তোমার জন্য একটা জিনিস কিনছিলাম। যদিও পছন্দ হবে না..."

— "পছন্দ হবে না! কী জিনিস?"

— "একটা হাতি। তবে জ্যান্ত নয়। কাঠের।"

— "বাঃ, ভালো তো। পছন্দ হবে না কেন?"

— "হাতি তোমার পছন্দ নয়, তাই। আমি মোটা ছিলাম যখন, আমাকে হাতি বলে খ্যাপাতে না?"

— "ও! তো বিয়েটা কাকে করেছি?"

মনটা নরম হয়ে এল আমার। লোকটা বলেছিল সুস্মিতার পছন্দ হলেই পয়সা দিতে। এতটা ভদ্র অথচ কী নৃশংস মানুষটা!

মিনিট তিনেক পরে হাতে একটা ফোটো নিয়ে ঘরে ঢুকে এলেন রেবতী দেবী। একটু ইতস্তত করে ছবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "দেখুন, আপনি আমার ভাইয়ের মতো। এ এলাকায় সাহায্য পাবার মতো আর কাউকে চিনিও না আমি। এসব কথা আর কাউকে আপনি বলবেন না, সেই বিশ্বাসেই আপনাকে বলছি..."

কথা বলার ভঙ্গিতে একটু থতোমতো খেলাম আমি। ছবিটা হাতে নিয়ে দেখলাম একটা ফ্যামিলি পোর্ট্রেট। চারটে মানুষ। এর মধ্যে তিনজনকে আমি চিনি। নবদা, রেবতী দেবী নিজে আর রন্টু... চতুর্থজন রন্টুরই বয়সি একটা

ছেলে।

— "রন্টু আমাদের দ্বিতীয় সন্তান। এই আমার প্রথম ছেলে টিটো। মারা গিয়েছে আজ ছ-মাস হল।"

— "ওঃ!" মনটা খারাপ হয়ে গেল। কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলেন নবদা।

— "একটা গাড়ির ধাক্কায় ও মারা যায়। স্পট-ডেড। স্কুল থেকে ফিরছিল, এমন সময় একটা কুকুর তাড়া করে ওকে..."

— "কুকুর!"

— "হ্যাঁ... ও ভয় পেয়ে পালাতে গিয়েই গাড়ির তলায়... ওর বাবা খুব বড়ো শক পায়। মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। নানারকম ডিলিউশনে ভুগতেন। আর ওই কুকুর একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। এই পাড়ার সমস্ত কুকুরকে উনিই..."

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, "কী যা-তা বলছেন। এ কী করে সম্ভব?"

মহিলা শান্ত গলায় বলতে থাকেন, "সাধারণত কাজটা রাতে করতেন। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতাম উনি বিছানায় নেই। কাল অফিস থেকে ফেরার সময়ই ওঁর জামায় রক্তের দাগ দেখে বুঝি, ফেরার সময়েই খুন করেছেন।"

আমার মাথার ভিতরে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তা কী করে হয়? নবদাই যদি কুকুরগুলোকে খুন করে থাকেন তাহলে লোকটা দোষ স্বীকার করল কেন? মহিলা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছেন। মাথার ব্যামো তাঁর নিজেরই আছে।

— "উনি কোথায় এখন?" আমি কঠিন গলায় প্রশ্ন করলাম।

মহিলা এই প্রথম মুখ তুললেন, "কাল রাতে উনি বাড়ি ফেরেননি। আজ সকালেও ফেরেননি। আমার খুব টেনশন হচ্ছে ভাই... তুমি যদি একবার বাইরে বেরিয়ে..."

অসহায়ের মতো আমার দুটো হাত চেপে ধরলেন তিনি। অস্বস্তি হল আমার। কাল রাতে নবদা বাড়ি ফেরেননি কেন, আমি জানি। কিন্তু আজ

ভোরেও ফিরবেন না কেন? মন বলল ভোরের আগেই হয়তো উৎসাহে পুলিশে খবর করতে চলে গিয়েছেন।

— "আপনি শান্ত হোন, আমি দেখছি।"

কথাটা বলে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম। একটা জিনিসে চোখ পড়তে থমকে গেলাম। রন্টু যে ঘরে পড়ছে, সে ঘরের শোকেসে একটা কাঠের পুতুল রাখা আছে। একটা সিংহ। শিল্পী কে, সেটা আর বলে দিতে হল না।

কৌতূহল হতে ঘরের ভিতরে ঢুকে এলাম আমি। রন্টু এখনও ইংরেজি পড়ে চলেছে। আমি সিংহটা হাতে নিয়ে তার দিকে দেখিয়ে বললাম, "এটা তোমার বাবা কিনেছে?"

রন্টু উপরে নীচে মাথা নাড়ল, "আমার সিংহ খুব ভালো লাগে।"

আমি হাসলাম, "তা-ই? তাহলে এই কাঠের সিংহকে ইংরেজিতে কী বলবে বলোতো?"

রন্টু একটু ভেবে উত্তর দিল, "উড লায়ন।"

— "উঁহুঁ... হল না।" আমি তার কাছে গিয়ে গাল টিপে দিলাম, "উড না। উডেন, কাঠের সিংহ হল উডেন লায়ন। কাঠের হাতি উডেন এলিফ্যান্ট, আর কাঠের ঘোড়া হল উডেন..."

বাকি কথা আমার গলাতেই মরে গেল। মাথার ভিতরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এক মুহূর্তে। মাথা চেপে ধরে মাটির উপরেই বসে পড়লাম।

'উডেন হর্স' মানে কাঠের ঘোড়া। কিন্তু আমেরিকার সিভিল ওয়ারের সময় ওই শব্দ দুটো একসঙ্গে বসলে তার অন্য একটা' মানে হত।

উডেন হর্স পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে ভয়ংকর এক টর্চার ডিভাইস। আজ এত বছর পরে এর বর্ণনা শুনলেও মানুষের বুক শিউরে ওঠে।

ঘোড়ার পিঠে যেমন স্যাড্‌ল থাকে, ঠিক তেমন আকারের একটা সরু কাঠের প্লাটফর্ম তৈরি করা হত। ঠিক যেন একটা ছোটো পিরামিডকে দু-পাশ থেকে টেনে কেউ চওড়া করে দিয়েছে। উপরের দিকের সরু ধারটায় জেগে থাকত একটা লম্বা ধারালো ব্লেড। যাকে শাস্তি দেওয়া হবে, তার দু-পায়ে

চেন দিয়ে ভারী কিছু বেঁধে দেওয়া হত। তারপর ঘোড়ার উপর অশ্বারোহী যেভাবে বসে, সেভাবে বসিয়ে দেওয়া হত ওই ব্লেডের উপরে। পায়ে বাঁধা ভারের টানে অপরাধীর শরীর ধীরে ধীরে মাঝখান থেকে চিরে দু-ফাঁক হয়ে যেত।

চকিতে মাটি থেকে উঠে পড়লাম। কোনওদিকে না চেয়ে দ্রুত নেমে এলাম একতলায়। রাস্তায় এসে পড়তেই দেখলাম, লোকটা খোঁড়া পায়েই আজ আবার চাটাই পেতে বসেছে। আগের মতোই তার সামনে সাজিয়ে রাখা আছে কাঠের জন্তু-জানোয়ারগুলো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। স্পষ্ট মনে আছে, কাল ঘোড়ার সংখ্যা ছিল আট। আজ ন-টা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে চাটাইয়ের একপাশে।

আমি সেদিকে তাকাতে আমার নজর লক্ষ করে একগাল হাসল লোকটা, "হেঁ হেঁ... সুপ্রভাত। আজ সকালে এইটা বানিয়েছি স্যার। ভারী সুন্দর হয়েছে, না?"

— "তুমি... তুমি কাল রাতে..."

লোকটার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে এল। আমার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "যারা নিরীহ অবলা প্রাণীদের উপর অত্যাচার করে, তাদের উপর ভীষণ রাগ হয় আমার, খুব রাগ হয়, খুব। মনে হয়, আমার ভিতরে একটা ঘুণপোকা সব কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। যতক্ষণ না লোকগুলোকে শাস্তি দিচ্ছি, ততক্ষণ পোকাগুলো খেয়েই যায় আমাকে। কী করব বলুন স্যার? রাগ কমাতে আমি ওদের ধরে এনে ঘোড়ায় চড়াই। কাঠের ঘোড়া। কাল রাতে আপনার বন্ধু চড়েছে। ওই লোকগুলোকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে আমার রাগ কমে, পোকাগুলো শান্ত হয়। ভারী শান্তি আসে মনে। ওদের ঘোড়ায় চড়তে দেখে প্রেরণা পেয়েই তো এই ঘোড়াগুলো বানাই আমি... নইলে এমন ভালো কাজ কি আর এমনিতে হয়... এই দেখুন-না..."

লোকটা একটা কাঠের ঘোড়া তুলে ধরে আমার দিকে, "এটা আমার বানানো নয় নম্বর ঘোড়া স্যার। যতদিন বেঁচে আছি, ততদিনে আরও বানাব। অন্য কোথাও..."

লোকটা উদাস হয়ে যায়। যেন স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় সে।

— "কাল রাতে তাহলে..."

— "আমি কাল রাতে বাড়ি ফিরছিলাম, স্যার। কুকুরগুলোকে রোজ রাতে আমি খেতে দিই। ওদের সুর বাজিয়ে শোনাই। কাল শোনাতে গিয়ে দেখলাম একটা কুকুর নেই। বুঝলাম, কোথাও তার গলাকাটা দেহটা পড়ে আছে। আমি একটা ঝোপের ভিতর ওকে খুঁজে পেয়ে বডিটা চাপা দেব বলে টেনে আনছিলাম, এমন সময়..."

— "আর তোমার পাঞ্জাবিতে যে শুকনো রক্তের দাগ..."

খলখল করে হেসে ওঠে লোকটা, "ওটা কুকুরের রক্ত নয় স্যার..."

আমার গা-টা গুলিয়ে ওঠে একবার, "কিন্তু তুমি যখন জানতে, নবদা খুনগুলো করছে তখন সবাইকে জানিয়ে দিলেই তো..."

দাঁতের ফাঁকে হাসে মানুষটা, "কুকুর-বিড়াল মারলে কত টাকা জরিমানা হয়, স্যার? ওঁর থেকে বেশি টাকায় তো আপনি আমার একটা ঘোড়া কিনতে চেয়েছিলেন..."

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না, সে নিজেই বলতে থাকে, "এই যে আপনি যেমন বেঁচে আছেন, আমি যেমন বেঁচে আছি, তেমন ওই অবলা অসহায় জন্তুগুলোরও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে, স্যার... হেঁ হেঁ। ওদেরও মরতে ব্যথা লাগে। যারা ওদের ব্যথা দেয় তাদেরও একই ব্যথা পাওনা হয়। এই যে আপনি কাঠের পুতুল কিনলে আমার যেমন পাওনা হয়..."

— "আপনার বন্ধু গত রাতে যে কুকুরটাকে মেরেছিল, তার একটা পা ছিল না, জানেন। কত কষ্ট করে হাঁটত কুকুরটা। খেতে পেত না। গলা চুলকোতে পারত না। ধুঁকত, কষ্ট পেত, কিন্তু অবিশ্বাস করেনি, বলুন? খাবার দেখিয়ে ডাকতেই খুশি হয়ে কাছে গিয়েছে। খাবারের বদলে গলায় ছুরি চলছে কেন, বুঝতেই পারেনি কুকুরটা... হেঁ হেঁ..."

লোকটা এবার হাতের ঘোড়াটা তুলে ধরে আর-একটু উপরে, মুগ্ধ হয়ে যায় তার চোখ দুটো, "এইটা আমার সেরা কাজ হয়েছে, স্যার। আজ অবধি যত করেছি, তার মধ্যে একেবারে সেরা।"

তার চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ঠিক যেন কোনও 'আর্মি অফিসার তার সদ্য পাওয়া মেডেলের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে।

আমি ফিরে যাচ্ছিলাম। সে পিছু ডেকে থামিয়ে দিল আমাকে, "ও দাদা, শুনছেন... শুনুন-না..."

আমি ফিরে তাকাতে সে খুশি মুখে ঘোড়াটা এগিয়ে দিল আমার দিকে, "এতদিন এ কাজ করছি, কেউ ধরতে পারেনি। আপনি পারলেন। নিন, এটা আমি আপনাকে দিলাম... পয়সা লাগ[illegible] না। এমনিই দিলাম..."

কথা না বাড়িয়ে হাতে তুলে নিলাম ঘোড়াটা। চকচকে মসৃণ পালিশের উপরে হাত পিছলে যায় যেন।

— "কাল থেকে আর এখানে বসব না আমি..." সে বিড়বিড় করে বলে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে দিল। মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর।

আমার হাতে কাঠের ঘোড়াটাও জীবন্ত হয়ে উঠতে চাইছে। শিল্পীর দক্ষ হাতের টান আর প্রেরণা ছাড়া কাঠের ঘোড়ায় এমন প্রাণ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় হয়তো...

পিছন থেকে শুনতে পেলাম, সেই কাষ্ঠল যন্ত্রের করুণ সুর আবার বাজতে শুরু করেছে। মনে হল, আমার ঠিক পিছনে চাটাইটাকে ঘিরে একে একে জমা হচ্ছে কিছু অদৃশ্য চতুষ্পদ।

স্থির, মুগ্ধ নয়নে তারা চেয়ে আছে বাঁশুরিয়ার দিকে...



শিশুরা অকারণেই কাঁদে



— "না বাবা, আমি ইনজেকশন নেব না, কিছুতেই না।"

— "ওরকম করে না লিলি। কথা না শুনলে বাবা কিন্তু খুব রেগে যাবে। আর রেগে গেলে..."

হাতের ইনজেকশনটা তুলে ধরে মানুষটা। নিড্‌ল চুইয়ে একফোঁটা তরল এসে পড়ে মাটিতে।

— "আমার কষ্ট হয়, আমার..." কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা শক্ত হাতের চড় এসে পড়ে মেয়েটার গালে। ঠোঁটের নীচে রক্তের স্বাদ পায় সে। হাত-পা কুষ্ঠ রোগীর মতো কাঁপছে। শুধু ভয়ে নয়। চাইলেও হাতটা নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে না ও।

— "নাও, কাম অন লিলি, হাতাটা তোলো তো দেখি..." আদর করে মেয়েটার হাতের উপরদিকে হাত বুলোতে থাকে লোকটা।

— "আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না বাবা, ইনজেকশন দিলে আমি আর চলতে পারি না, হাত দিয়ে কাজ করতে পারি না।"

মেয়েটার থুতনিতে আদর করে একটা হাত রাখে লোকটা, — "যাতে তুমি আমার মনের মতো হয়ে থাকো, সেইজন্যেই তো দিচ্ছি ইনজেকশন। ড্যাডিস লিট্‌ল গার্ল।"

— "আমি মায়ের সঙ্গে থাকব।" অনুরোধটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

লোকটার মুখে একবার করুণ হাসি খেলে — "কিন্তু মা তো তোমার সঙ্গে থাকবে না মামণি... তার তো আলাদা সংসার আছে... উহুঁ, এদিকে তাকাতে হবে না..."

মেয়েটা কিন্তু মুখ ঘোরায় না। হাতে সিরিঞ্জ ঢোকায়, ছিটকে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে। এই প্রথম রক্তের লাল রংটাই এখন নেশা ধরাচ্ছে ওকে। সেই রক্তটার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে সে।

* * * * * * * *

ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামতেই দৌড়ে একটা দোকানের শেডের নীচে এসে দাঁড়াল অনিন্দ্য। আচমকা বৃষ্টি এসে পড়ায় একেবারে কাকভেজা হয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কপালে এসে-পড়া ভেজা চুলগুলোকে সরিয়ে দিল। চারপাশে তাকিয়ে খুঁজে দেখতে লাগল বসার মতো কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না।

দোকানটা অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে গেছে। শাটার নামানো। বাইরে একটা সাদা টিউব জ্বলছে। সেটা থেকে আলো এসে সামনে পড়েছে বটে, তবে এখন ত্যারচা করে পড়া ঝাঁক-ঝাঁক বৃষ্টির ফোঁটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শাটারের সামনেই একটা কাঠের বেঞ্চ রাখা। কাঁধ থেকে ব্যাগটা খুলে তার উপর রেখে পাশেই বসে পড়ল অনিন্দ্য। বৃষ্টির যা তেজ, তাতে সহজে কমবে বলে মনে হচ্ছে না।

শনশনে ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছে। জোলো, হাড়কাঁপানো হাওয়া। অনিন্দ্যর শরীরটাও শিউরে উঠল কয়েকবার। জামাটা যেভাবে ভিজে আছে, তাতে কাল নিশ্চয়ই ঠান্ডা লাগবে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে হতাশ হল। নেটওয়ার্ক গায়েব। ফোন লাগছে না, ইন্টারনেটও নিষ্ক্রিয়। অগত্যা ইয়ারফোন কানে গুঁজে রেডিয়ো অন করল সে। দু-চারটে ফ্রিকোয়েন্সি ধরছে অ্যান্টেনা। তিনটেয় বিজ্ঞাপন। একটায় গান হচ্ছে। রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে এই রেডিয়ো স্টেশনটা আগেও শুনেছে অনিন্দ্য। এই সময়ে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, 'রাতের হেল্পলাইন'। রাতবিরেতে কলকাতার রাস্তায় কী কী সমস্যা হতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা, আর মাঝে মাঝে পুরোনো গান। কখনও আবৃত্তি করে শোনানো হয়। এখন পুরোনো দিনের একটা বাংলা গান চলছে। সুরটা ভারী ভালো লাগল অনিন্দ্যর। মনটা জুড়িয়ে এল।

গানের মধ্যে মজে গিয়েছিল। এমন সময় আচমকাই থেমে গেল গানটা। বিরক্ত হল অনিন্দ্য। বেশ লাগছিল শুনতে। গান থেমে ঘোষকের গলা ভেসে আসছে। ভারী, সিরিয়াস গলায় একটা ঘোষণা পড়ছে। আধা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল অনিন্দ্য, "রাতের হেল্পলাইনে আজ আমাদের আলোচনা সিরিয়াল কিলিং নিয়ে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, গত সপ্তাহে উত্তর কলকাতার রাস্তায় কয়েকটি নৃশংস খুন হয়ে গেছে। পুলিশ আশঙ্কা করছে এ কাজ কোনও সিরিয়াল কিলারের। আততায়ী সদ্যোজাত শিশুর কান্না নকল করতে পারে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই খুনগুলো করছে সে। অসহায় পরিত্যক্ত শিশুর টোপ দেখিয়ে ভিকটিমকে বাড়ির বাইরে টেনে আনছে। খুন

করার পর প্রতিটি খুনের অকুস্থলে ফেলে যাচ্ছে একটি পুতুলের কাটা মাথা। শহরবাসীর মুখে এ সিরিয়াল কিলারের নাম, 'ক্রায়িং বেবি'। পুলিশের নির্দেশ, মাঝরাতে আপনি যদি বাড়ির বাইরে কিংবা রাস্তায় কোনও সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনতে পান তবে দয়া করে সাড়া না দিয়ে ফোন করুন ৯৪৬৪৬ নম্বরে বা অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন আমাদের লাইভ ইন অনুষ্ঠানে ৮৮৮৮ নম্বরে। বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বাড়তি যত্নে লক করে রাখবেন। অযথা ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ।"

ঘোষণা শেষ হতেই আগের গানটা আর শোনা গেল না। ক্রায়িং বেবিকে নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। অনিন্দ্যর কিন্তু আর ভালো লাগল না শুনতে। মনটা আশঙ্কায় ভারী হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে সে উত্তর কলকাতারই একটা গলির ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। চতুর্দিক বৃষ্টি আর অন্ধকারে ঢেকে আছে। দু'হাত দূরে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে দেখা যাবে না। রাস্তাটা কি খালি?

— "এ ব্যাপারে আলোচনা করতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন মনস্তাত্ত্বিক সমীরণ গাঙ্গুলি। মিস্টার গাঙ্গুলি, আপনার কী মনে হয়, কেন খুনগুলো করছে ক্রায়িং বেবি?

দ্যাখো ভাই, এ ধরনের সিরিয়াল কিলারদের মোটিভ তাদের ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। খুনের ধরন দেখে আমার মনে হচ্ছে খুনি কোনও কারণে ছেলেবেলায় নিজের বাবা-মা-র কাছে রিপিটেডলি অ্যাবিউজড..."

বৃষ্টিটা এর মধ্যে আরও বেড়েছে। ইয়ারফোন বেয়ে-আসা শব্দ প্রায় ঢেকে যেতে বসেছে। অনিন্দ্য উঠে দাঁড়াল। ব্যাগের ভিতরে ছাতা আছে বটে, কিন্তু ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাবে না। তা-ও, খবরটা শোনার পর থেকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করল না তার।

ছাতা খুলে বাইরের দিকে পা বাড়াল অনিন্দ্য। সঙ্গে সঙ্গে পা আটকে গেল। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে আর একটা আওয়াজ কানে আসছে— একটা শিশুর কান্না। মনে হচ্ছে একটু দূরেই কোথাও মাটির উপর বসে কেঁদে চলেছে কোনও বাচ্চা। অক্ষম শব্দে কাউকে ডাকছে।

এগিয়ে-রাখা পা-টা পিছিয়ে নিল সে। একটু আগে রেডিয়োর ঘোষণাটা

মনে পড়ে গেল। আততায়ী সদ্যোজাত শিশুর কান্না নকল করতে পারে। শব্দটা ঠিক যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। বুকের ভিতর চাপা উত্তেজনার স্রোত বইছে। হাঁটু কেঁপে উঠল। সত্যি কি কোনও শিশু কাঁদছে? এত রাতে রাস্তায় একটা সদ্যোজাত শিশুকে কে ফেলে যাবে?

অনিন্দ্য ভেবে দেখল, সিরিয়াল কিলার যদি সত্যি তার পিছু নিয়ে থাকে তবে শাটারের তলায় দাঁড়িয়ে বিশেষ লাভ হবে না। উলটে আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে আততায়ীর সুবিধেই হবে।

ছাতাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। দৌড়াবে কি?

বাইরে বেরিয়ে কিন্তু মনের জোর বেড়ে গেল অনিন্দ্যর। কান্নার আওয়াজ খুব একটা দূর থেকে আসছে না। সত্যি যদি কোনও শিশু হয়? এই অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে থাকলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা যাবে। হয় বৃষ্টির জলে, না হয় কোনো গাড়ি পিষে দেবে।

সাহসে ভর করে শব্দটা লক্ষ্য করে আরও এগিয়ে এল অনিন্দ্য। হঠাৎ তার মনে হল বাচ্চার কান্নাটা ঠিক— 'স্বাভাবিক' নয়, তবে গোলমালটা ঠিক কোথায়, সেটা বুঝতে পারল না। একটানা ফোঁপানো কান্না। হাতের ফোনে ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে নিল সে।

কয়েক পা এগোতেই মাটির উপরে কিছু চোখে পড়ল। হ্যাঁ, ওখান থেকেই আসছে কান্নাটা। একটা সদ্যোজাত বাচ্চাই তো... ফ্ল্যাশলাইট মাটির দিকে ধরে জিনিসটার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝতে পারল।

কোনও বাচ্চা নয়, মাটির উপরে পড়ে রয়েছে একটা ইঞ্চি দশেক লম্বা, জমা জলে প্রায় আধডোবা হয়ে যাওয়া পুতুল। আর সেই পুতুলের ভিতরে লাগানো কোনও যন্ত্র থেকেই বেরিয়ে আসছে কান্নার আওয়াজটা। পুতুলটাকে দেখে কিন্তু পরিত্যক্ত বলে মনে হল না। তবে এই মুহূর্তে বৃষ্টির ধাক্কায় তার চুলগুলো পিচের রাস্তার উপরে ছড়িয়ে গেছে।

আশ্চর্য! এমন একটা পুতুল রাস্তার উপরে কে ফেলে গেল? তবে কি গাড়ি করে যেতে যেতে কারও হাত থেকে পড়ে গেছে?

আগ্রহ হতে নীচু হয়ে সেটা মাটি থেকে তুলে নিল অনিন্দ্য, ঠিক এমন সময় পিছন থেকে আসা একটা মেয়েলি গলার চিৎকারে বুক কেঁপে গেল তার। বৃষ্টির মধ্যে থেকে দমকা হাওয়ার মতো সাদাটে কিছু একটা ছুটে এসে তার হাতে ধরা পুতুলটা ছিনিয়ে নিল। তারপর মিলিয়ে গেল রাস্তার উলটোদিকের ফুটপাথে। সরু নখে লেগে কবজির কাছে কিছুটা চিরে গেল অনিন্দ্যর।

পুতুলটা ছিনিয়ে নিয়েই মানুষটা হারিয়ে গেছে বৃষ্টির মধ্যে। কান্নার শব্দটা মিলিয়ে গেছে সেই সঙ্গে। আবার মুশলধারায় বৃষ্টির ঝমঝম। অনিন্দ্যর হাতের চেরা অংশটা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বৃষ্টির জলে মুহূর্তে ধুয়ে যাচ্ছে সেই রক্ত।

চামড়ার ব্যাগটা আগলে ধরে সেদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল অনিন্দ্য। কয়েক পা এগোতেই মানুষের শরীরের অবয়ব চোখে পড়ল তার— একটা মেয়ে। রাস্তার ধারে দোতলা বাড়ির কার্নিশের নীচে দাঁড়িয়ে পুতুলটা বুকে আঁকড়ে ধরে হাঁপাচ্ছে। চুল দিয়ে মুখের বেশির ভাগটাই ঢাকা। অনিন্দ্যকে বৃষ্টির চাদর পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে আর একটু শক্ত করে চেপে ধরল পুতুলটা। তারপর একপাশ ফিরে দাঁড়াল।

— "ওটা কি আপনার?" মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল অনিন্দ্য।

মেয়েটা উত্তর দিল না। তার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ। অনিন্দ্য লক্ষ করল মেয়েটার বয়স সতেরো-আঠেরোর বেশি নয়। গায়ে ঢোলা লম্বাটে গোছের জামা কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর খানিক নীচ অবধি নেমে এসেছে।

— "আপনি ঠিক আছেন তো?" আবার প্রশ্ন করে অনিন্দ্য। কোনও উত্তর আসে না। একইভাবে পুতুল চেপে ধরে লুকোনোর চেষ্টা করছে মেয়েটা।

অনিন্দ্য বুঝতে পারে, মেয়েটার কিছু একটা সমস্যা আছে। মুখ-চোখ দেখে মাথায় খানিকটা ছিট আছে বলেও মনে হয়। তাকে আর না ঘাঁটিয়ে পিছিয়ে আসতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় বিড়বিড় করে কথা বলে ওঠে মেয়েটা,— "ও... ও মেরে ফেলবে আমাদের।"

অনিন্দ্য ঘুরে দাঁড়ায় — "কে মেরে ফেলবে?"

— "ওই..." আঙুল দিয়ে বৃষ্টির চাদরের ভিতর একটা জায়গা দেখিয়ে দেয় মেয়েটা। ধোঁয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

অনিন্দ্য মুখ ফিরিয়ে নেয় — "আমাদের বলতে? আপনার সঙ্গে আরও কেউ আছে?"

এতক্ষণে অনিন্দ্যর দিকে মুখ তুলে তাকায় মেয়েটা, হাতের পুতুলটা দু'হাতে সামনে তুলে ধরে— "মিনি, আমার মেয়ে।"

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে অনিন্দ্য। মেয়েটা সম্ভবত পাগল। তবে চেহারা দেখে রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো ভবঘুরে পাগল বলে মনে হয় না। সম্ভবত কাছেই কোনও বাড়িতে থাকে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছে বোধহয়।

ভয়টা এবার কেটে যায় অনিন্দ্যর, বলে, — "ভয় নেই, কেউ মারবে না তোমাদের, কোথায় থাকো তুমি?"

মেয়েটা উত্তর দেয় না। পুতুলটার চুলগুলো আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে। মিহি সুরে একটা লালাবাই গেয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে।

— "পুতুলটা... আই মিন তোমার মেয়ে... পড়ে গেল কী করে বলো তো?" অনিন্দ্য পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

— "আ... আমাদের মারতে চাইছিল। আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

— "মারতে চাইছিল! কে?"

আচমকাই অনিন্দ্যর শার্টের নীচের দিকটা খামচে ধরে মেয়েটা — "ওই যে... আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না?"

— "কীসের আওয়াজ?"

— "পায়ের আওয়াজ।" মেয়েটার অস্থির চোখের মণি দুটো বৃষ্টির চাদরের ভিতর কাকে যেন খুঁজে চলেছে। বিড়বিড় করে কিছু আওড়ে চলে সে।

ভয় পেয়ে অনিন্দ্যর পিছনে লুকিয়ে পড়ে মেয়েটা। অনিন্দ্য ভালো করে কান পাতার চেষ্টা করে। বৃষ্টির অঝোর ধারার শব্দ আসছে, তা ছাড়া আর কিছু তো নেই। মেয়েটার মাথায় যে ছিট আছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

সেই সঙ্গে স্কিতজোফ্রেনিয়াও আছে নাকি? অনিন্দ্য পিছন ঘুরে প্রশ্ন করে, "তোমার মেয়ের নাম মিনি তো বুঝলাম, তোমার নাম কী?"

— "আমি পিয়ালি।"

মিষ্টি গলার স্বর মেয়েটার, পুতুলের মায়ের মতোই দেখতে বটে। অথচ ডিলিউশনে ভুগছে। অনিন্দ্যর মায়া হয় মেয়েটার জন্য— "তা পিয়ালি, এত রাতে বৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে এভাবে ঘুরে বেড়ালে মেয়ের তো শরীর খারাপ করবে।"

— "তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?" নিষ্পাপ গলার প্রশ্ন।

— "নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগে তো জানতে হবে তুমি কোথায় থাকো?"

এবারে এক-পা, এক-পা করে পিছিয়ে যায় পিয়ালি — "আর যদি তুমিই সে হও? যদি মাঝপথে পিছন থেকে একটা ছুরি দিয়ে..."

— "ধ্যাত!" হেসে ফেলে অনিন্দ্য— "আমার কাছে ছুরি কোথায়?"

পিয়ালির চোখ নেমে আসে অনিন্দ্যর হাতে ধরা চামড়ার ব্যাগের দিকে — "ওতে কী আছে?"

এবার বেশ খোলা গলাতেই হেসে ওঠে অনিন্দ্য — "ওতে ছুরি নেই। তবে অন্য একটা জিনিস আছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।"

ব্যাগ খুলে ছোটো চেন থেকে চিরুনি বের করে আনে অনিন্দ্য। মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরে— "নাও, এটা দিয়ে ওর চুল আঁচড়ে দাও।"

পিয়ালির গোটা মুখ জুড়ে সরু হাসি খেলে যায়। চিরুনিটা হাতে নিয়ে পুতুলের চুল আঁচড়াতে থাকে। লালাবাইটা আবার শোনা যায়।

সুযোগ বুঝে কার্নিশের তলায় বেশ কিছুটা তফাতে সরে আসে অনিন্দ্য। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে দ্যাখে, অল্প হলেও এতক্ষণে নেটওয়ার্ক এসেছে তাতে। মনটা খুশি হয়ে ওঠে। নম্বর ডায়াল করতে গিয়েও কিন্তু থেমে যায়। কোন নম্বরে কল করতে বলেছিল যেন? অনিন্দ্যর প্রথম নম্বরটা মনে পড়ে না। দ্বিতীয়টা সহজ বলে সেটা মনে আছে— ৮৮৮৮। অগত্যা সেটাই ডায়াল করে।

ওপাশ থেকে প্রথমে গানের শব্দ ভেসে আসে। লাইনটা কানেক্ট হতে একটু

সময় লাগে।

— "কাকে ফোন করছ তুমি?" পিয়ালি হঠাৎই ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। ফোনটা কেটে দেয় অনিন্দ্য। হেসে বলে, — "বাড়িতে করছিলাম। আসলে দেরি হচ্ছে তো, চিন্তা করবে তো সবাই..."

— "তোমার বাড়িতে কে কে আছে?"

— "মা আছে, বোন আছে।" ঘাড় নেড়ে বলে অনিন্দ্য।

— "বাবা নেই? মরে গেছে, তা-ই না?" অনিন্দ্যকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয় না সে, নিজের মনেই বলতে থাকে, "আমারও নেই, জানো। সেই ছোটবেলায় দেখেছিলাম। আমাদের কত মিল, তা-ই না?"

— "কই? বেশি তো না। একটা হল সবে..."

পিয়ালিকে একটু চিন্তিত দেখায়, ভেবেচিন্তে বলে — "ও আমাকেও মারতে চায়, আর তোমাকেও মারতে চায়।"

অনিন্দ্যর পায়ের পাতা কেঁপে ওঠে, — "আমাকে! আমাকে মারতে চায়, কী করে জানলে?"

— "ওই যে, ও তোমার দিকে তাকিয়ে আছে..." আঙুল দিয়ে অনিন্দ্যকে সামনে ইশারা করে মেয়েটা।

সামনে ফিরে অনিন্দ্য দ্যাখে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। ঝমঝমে বৃষ্টির চাদরে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। কয়েক সেকেন্ড অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। কয়েকটা ধাতুর মতো ঠান্ডা আঙুল তার হাত চেপে ধরে, খলখল হাসির শব্দ ভেসে আসে— "ভীতু... আমার মিনিও এত ভয় পায় না। আবার বলে, আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে... হিহিহিহি..."

প্র্যাঙ্ক করল মেয়েটা? নিশ্চিন্ত হয়ে তার হাসিভরা নির্মল মুখটার দিকে চেয়ে থাকে অনিন্দ্য। ফরসা রং, সরু ঠোঁট, ছোট ইঞ্চি দুয়েকের কপাল। চোখ দুটো বড়োসড়ো। কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে মেয়েটার মধ্যে। ভালো লাগে, কেমন যেন ভয়-মেশানো ভালো লাগা।

অনিন্দ্য কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা আলোর ঝলকানিতে ভরে যায় চতুর্দিক। কাছেই কোথাও বাজ পড়েছে, মেয়েটার চোখে-মুখে আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাজের শব্দ শোনা যাবে। এই ধরনের স্কিতজোফ্রেনিকরা সাধারণত বাজ-টাজ পড়লে ভীষণ ভয় পায়। একটা বুদ্ধি খেলে যায় অনিন্দ্যর মাথায়। সুযোগ বুঝে মেয়েটার কাছে এগিয়ে আসে।

বাজের শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে। মেয়েটা ভয় পেয়ে একহাতে জড়িয়ে ধরে অনিন্দ্যকে। শরীরের ছোঁয়ায় অনিন্দ্য কিছু অনুভব করার চেষ্টা করে। দুটো হাত রাখে মেয়েটার কোমরের কাছে, নাঃ, শক্ত কিছুর ছোঁয়া লাগে না। মেয়েটার শরীরে কোথাও ছুরি গোঁজা নেই। একটু নিশ্চিন্ত হয় সে। মায়া লাগে মেয়েটার জন্যে।

বাজের শব্দটা মিলিয়ে যেতে আস্তে আস্তে হাতের বাঁধন আলগা করে নেয় মেয়েটা। কয়েকটা লজ্জার রেখা ফুটে ওঠে মুখে। একবার গলাখাঁকারি দিয়ে অনিন্দ্য বলে, "বাজ পড়লে ভয় লাগে, তাই না?"

— "তুমি আমাদের বাড়ি দিয়ে আসবে?" মাথা নামিয়েই প্রশ্ন করে মেয়েটা।

অসহায় লাগে অনিন্দ্যর। মেয়েটা বাড়ি যেতে চাইছে, কিন্তু ঠিকানা বলতে পারছে না। তার কাছে মোবাইল ফোন জাতীয় কিছুও নেই যে সেখান থেকে কিছু জানা যাবে। সাত-পাঁচ ভেবে সে ঠিক করল, বৃষ্টিটা একটু কমলে মেয়েটাকে একেবারে থানায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। তাতে পুলিশের ঝামেলা হয় হোক, ক্রায়িং বেবি থাক বা না থাক, এত রাতে রাস্তায় এই বয়সের একটা মেয়ে একেবারেই সেফ নয়।

— "বৃষ্টিটা কমুক একটু, তারপর বেরোই আমরা?"

উপরে-নীচে মাথা নেড়ে সায় দেয় পিয়ালি। পুতুলটাকে কার্নিশের নীচের উঁচু পাঁচিলটার উপর শুইয়ে দেয়, তারপর এগিয়ে এসে অনিন্দ্যর হাতটা তুলে ধরে, — "তোমার হাতে কাটল কী করে? আমার নখ লেগে?"

উপরে-নীচে মাথা নাড়ায় অনিন্দ্য। পিয়ালির চোখ-মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে। যেন নখটা তার নিজের হাতেই লেগেছে।

— "ভুল হয়ে গেছে, সরি..."

একহাতে নিজের একটা কান ধরে শব্দটা উচ্চারণ করেছে মেয়েটা।

অনিন্দ্যর মনটা নরম হয়ে এসেছে এতক্ষণে, সে পিয়ালির মাথার চুল এলোমেলো করে দেয় — "আমাকেই খুনি ভেবেছিলে, তা-ই না?"

— "না তো। তুমি কী করে হবে?" কান থেকে হাত নামিয়ে অবাক চোখে বলে মেয়েটা। অনিন্দ্যর হাতটা তুলে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বেরিয়ে আসা রক্তের দিকে।

— "কেন হব না?"

— "খুনি তো মেয়ে।"

— "মেয়ে! তুমি জানলে কী করে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অনিন্দ্য।

— "আমি দেখেছি।"

— "দেখেছ!

— "হ্যাঁ, এই যেমন তোমাকে দেখছি।"

— "মানে! তুমি জানো, খুনগুলো কে করেছে?" অনিন্দ্যর গলা কেঁপে যায়।

— "হ্যাঁ।"

— "কে?"

— "আমি।"

মেয়েটা এখনও একইভাবে চেয়ে আছে রক্তের দিকে। তাও, অনিন্দ্য বুঝতে পারে শেষ শব্দটা বলার সময় পিয়ালির গলার মধ্যে কিছু একটা পালটে গেছে। শিশুসুলভ আলগা ভাবটা মুছে গিয়ে একটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠছে মুখে।

— "ইয়ারকি হচ্ছে আমার সঙ্গে?" ধমকে ওঠে অনিন্দ্য।

হাতটা নামিয়ে রেখে বৃষ্টির দিকে ফিরে তাকায় মেয়েটা, কপালে একটা হাত ঘষতে ঘষতে বলে, — "আপনার কাছে সিগারেট হবে একটা?"

আবার সেই বদলে যাওয়া গলা মেয়েটার। যেন বাজের ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্ল্যাক মাজিকের মন্ত্রে পালটে গেছে মানুষটা। অনিন্দ্য বুঝে উঠতে পারে না। অবাক গলায় বলে, — "হঠাৎ করে কী হল তোমার?"

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো জ্বলন্ত চোখে অনিন্দ্যর দিকে চায় অচেনা মেয়েটা, ধারালো ছুরির মতো গলা শোনা যায়— "আর ইউ ডিফ ম্যান? সিগারেট,

একটা সিগারেট চেয়েছি আমি।"

এই প্রথম ভয় লাগে অনিন্দ্যর, মেয়েটার চাহনি আমূল বদলে গেছে, এখন সেই ডাগর হরিণের চোখদুটো বিড়ালের চোখের মতো সরু হয়ে গেছে। তার দিকে তাকালেই বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। কণ্ঠস্বরে ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব।

ব্যাগের ভিতর হাত চালিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এনে মেয়েটার হাতে দিয়ে দেয় অনিন্দ্য। সিগারেটটা ঠোঁটে ধরতে লাইটার দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর ভয়ে ভয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়।

ধোঁয়ার লম্বা রিং ছাড়ে মেয়েটা। মাথাটা ত্যারচা করে চারপাশে ঘুরিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে, "শিট ম্যান। ফাঁদটা ভালোই পেতেছিলাম, আপনি চলে এসে সব মাটি হয়ে গেল।"

— "আমি... মানে..."

— "হ্যাঁ, আপনার জায়গায় যদি কোনও মেয়েছেলে হত তাহলে এতক্ষণে..."

কিছু একটা ভেবে নেয় অনিন্দ্য, বলে, — "তার মানে এতক্ষণ তুমি..."

— "আমি না, পিয়ালি। আমাকে আপনি স্নেহা বলে ডাকতে পারেন। পিয়ালি একটা ন্যাকা মেয়েছেলে... নাটহেড..."

নিজে থেকেই কয়েকটা চাপা শব্দ বেরিয়ে আসে অনিন্দ্যর গলা থেকে— "স্প্লিট পারসোনালিটি!"

— "এগজাক্টলি। মেয়েটার ছোটো থেকেই মাথায় গোলমাল আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ওর গলাতেই ছুরি ঢুকিয়ে দিই শেষ করে।"

অবাক হয়ে লক্ষ করে অনিন্দ্য। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে যেন আমূল পালটে গেছে মানুষটা। একটু আগের নরম তুলোর মতো মেয়েটাকে এখন বন্য শ্বাপদের মতো হিংস্র মনে হচ্ছে।

অনিন্দ্যর একবার মনে হয়, এই অবস্থায় দৌড়ে পালিয়ে যাবার থেকে ভালো কিছু আর হয় না। পরমুহূর্তে একটা অন্যরকম ভাবনা চেপে ধরে তাকে। মেয়েটা যদি বাকি খুনগুলো করেও থাকে তাহলেও এই মুহূর্তে তার কাছে অস্ত্র নেই। তা ছাড়া কথা শুনে মনে হয় সে কেবলমাত্র মহিলাদের

খুন করে।

পিয়ালির জন্য দুশ্চিন্তা শুরু হয় তার। মানসিক সমস্যায় ভুগছে অসহায় মেয়েটা। এরকম হতে থাকলে যে কোনওদিন নিজের একটা ক্ষতি করে ফেলতে পারে। হয়তো খুনের ব্যাপারটা কেউ জানে না। আরও ইনটেন্স ট্রিটমেন্ট দরকার। সত্যি যদি তার অলটার ইগো স্নেহাই 'ক্রায়িং বেবি' হয়ে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে আরও কিছু না জেনে ফিরলে পুলিশের পক্ষে মেয়েটাকে আইডেন্টিফাই করা মুশকিল হবে।

সে মনে মনে একটা প্ল্যান বের করার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে পিয়ালি নেই, আছে সিরিয়াল কিলার 'ক্রায়িং বেবি'। সে যদি ধুরন্ধর খুনি হয় তাহলে পিয়ালির সম্পর্কে বেশি ইনফর্মেশান জানাবে না অনিন্দ্যকে।

— "পিয়ালি জানে আপনার কথা?" মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে সে।

সিগারেট-ধরা হাতেই কপাল থেকে চুল সরায় স্নেহা— "জানে। কিন্তু আমার ব্যাপারে কাউকে বলবে না। পুতুলটাকে ও নিজের মেয়ে ভাবে, মাঝে মাঝে ওটাকে খুন করে দেবার ভয় দেখাই।" একটা শয়তানি হাসি হাসে মেয়েটা— "ভালো কথা, তখন নম্বরটা ডায়াল করেছিলেন... কেটে দিলেন যে? পিয়ালিকেই খুনি সন্দেহ করেছিলেন, তা-ই না?"

— "আমি যে নম্বরটা ডায়াল করেছিলাম, সেটা আপনি..." প্রশ্ন করতে গিয়েও আটকে যায় অনিন্দ্য। ভীষণ কাছাকাছি সরে এসেছে স্নেহা, ডান হাতটা বুক ছুঁয়ে উঠে আসে গলার কাছে। অনিন্দ্য বাধা দিতে গিয়েও আটকে যায়। মেয়েটা তার গলার একটা বিশেষ জায়গা দু'আঙুলে চেপে ধরে বলে, "এটাকে বলে ল্যারিংকস, এর ঠিক উপরে এই জায়গাটা... বুঝতে পারছেন? এটা হল ফেরিংস, মানুষের গলার এই দুটো জায়গাকে জয়েন করে রাখে ট্রাকিয়া, গোদা বাংলায় যাকে বলে শ্বাসনালি। ভারি মজার জিনিস, জানেন? নরম, সেন্সিটিভ, কিউট। ঠিক পিয়ালির মতো। অথচ এই ট্রাকিয়াকে ছুরি দিয়ে কাটা বেশ মুশকিল, কারণ এর চারপাশে গিজগিজ করে স্কিনটিস্যু, কারর্টিলেজ এসব। এবার হাতে জোর থাকলে আর ছুরিতে ধার থাকলে যদি

দুটোকে একসঙ্গে চিরে দেওয়া যায় তবে আরও এক মজার কাণ্ড ঘটে। নিজের গলার রক্ত নিজের শ্বাসনালিতে ঢুকে চোকড হয়ে যান আপনি। ভেবে দেখুন আপনি প্রাণপণে নিঃশ্বাস নিতে চাইছেন, ভাবছেন এইবার আপনার বিশ্বস্ত শ্বাসনালি অক্সিজেন এনে দেবে আপনার বুকে। অথচ সে তুলে আনে কেবল রক্ত... যেন আপনার শ্বাসনালি উন্মাদ হয়ে গেছে...", খিলখিলে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার উপরে।

এতক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। সামনের জলে-ভেজা রাস্তাটা চোখে পড়ছে। রাস্তার ওপাশে সোডিয়াম ভেপারের হলুদ আলোটা নিশ্চিন্তে জ্বলছে। মিহি ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে গা ছুঁয়ে। কাছেই কোনও বাড়ির রেডিয়ো থেকে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসংগীতের সুর।

— "আজ সন্ধেটা বেশ, তা-ই না?" সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলে মেয়েটা। অনিন্দ্য উত্তর দেয় না। ভেজা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে মেয়েটা। একসময় বলে— "বললেন না তো কাকে ফোন করছিলেন, পুলিশে?"

— "নাঃ, পুলিশের নম্বরটা মনে নেই। রেডিয়োতে ঘোষণা করছিল আপনার কথা, ওদের হেল্পলাইনেই করছিলাম।"

— "আমার কথা রেডিয়োতে বলছে?" স্নেহার গলায় উচ্ছ্বাস— "কই, চালান তো দেখি একবার..."

অনিন্দ্য আবার চালিয়ে দেয় ফ্রিকোয়েন্সিটা। এখন সেই ঘোষক ছেলেটা একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে,

কেউ যে কোথাও নেই;
সকলে গিয়েছে মরে;
সকলে গিয়েছে চলে;
উঠান রয়েছে শুধু একা,
শিশুরা কাঁদে না কেউ;
রুগিরা হাঁপায় না তো;
বুড়োরা কয় না কথা—
থুবড়ো ব্যথার কথা যত,

এখানে সকাল নাই;
এখানে দুপুর নাই;
এখানে জনতা নাই;
এখানে সমাজ নাই;
নাইকো মূর্খ ধাঁধা কিছু,
আকাশে চাঁদের আলো;
উঠোনে চাঁদের আলো;
নীলাভ চাঁদের আলো;
এমন চাঁদের আলো আজ।

মন দিয়ে কবিতাটা শোনে স্নেহা। তারপর কী যেন ভেবে বলে, "চলুন, আমরা একটু হাঁটি।" অনিন্দ্যকে থতোমতো খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার হাত ধরে একটা টান দেয়

— "আরে চলুন না, ভয়ের কিচ্ছু নেই।"

পাঁচিলের উপর থেকে পুতুলটা এনে অনিন্দ্যের হাতে ধরিয়ে দেয় "এটা রাখুন, পিয়ালি আবার এলে ওকে শান্ত করতে পারবেন না, এটা না থাকলে।"

— "আপনিই তাহলে ক্রায়িং বেবি?" কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে অনিন্দ্য।

— "ক্রায়িং বেবি? সেটা কী?"

অনিন্দ্য ভেবে দ্যাখে সিরিয়াল কিলারের নামটা তার নিজের দেওয়া নয়, সুতরাং সে নামটা যে তার চেনা হবে তা না-ও হতে পারে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে আসে অনিন্দ্য। এতক্ষণের বৃষ্টিতে গোড়ালি অবধি জল জমেছে রাস্তায়। দুটো মানুষের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তার উপর। অঝোর বৃষ্টি ঝরিয়ে আকাশ এখন পরিষ্কার। গোল পূর্ণিমার চাঁদ ফুটে উঠেছে একপাশে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে রাস্তার উপর। একটু আগের কবিতাটার মতোই একটা রাত আজ।

— "আপনার ট্রিগারটা কী?" অনিন্দ্য হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে।

— "ট্রিগার?"

— "মানে যাদের এরকম স্প্লিট পার্সোনালিটি থাকে, তাদের একটা

পার্সোনালিটি থেকে আর একটায় যাবার কিছু কারণ থাকে। সেটা আপনার ক্ষেত্রে ঠিক কী?"

— "কেন? আপনি পিয়ালিকে মিস করছেন, তাই না?" স্নেহার গলায় ছদ্মকৌতুক।

— "তা খানিকটা..."

আচমকাই অনিন্দ্যর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় স্নেহা, গম্ভীর কিন্তু মিহি ব্যঙ্গ মাখা গলায় জিজ্ঞেস করে, — "আর আমাকে ভয় লাগছে না?"

— "আপনার যদি আমাকে খুন করার হত তাহলে এতক্ষণ অপেক্ষা করতেন না, তাছাড়া আজ রাতে ছুরিটা হারিয়ে ফেলেছেন কোনওভাবে। তাই না?"

অল্প হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে থাকে মেয়েটা— "আপনি বিয়ে করেছেন? মানে বউ আছে বাড়িতে?"

— "আসলে এমন কিছু হাতি-ঘোড়া চাকরি করি না, একটু গুছিয়ে নিয়ে... কেন বলুন তো?"

— "না, ভাবছিলাম পিয়ালিকে নিয়ে এত সহানুভুতি..." মিহি হেসে ওঠে মেয়েটা

— "সহানুভূতি জিনিসটা একদম পছন্দ নয় আমার, জানেন?"

অনিন্দ্যর মুখে একটা মিশ্র অভিব্যক্তি খেলে যায়, মেয়েটা আগের মতোই হাসতে হাসতে বলে, "ভয়ের কিছু নেই। আপনাকে নিয়ে আমার আগ্রহ নেই তেমন।"

— "আচ্ছা, এত রাতে পিয়ালি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন বলুন তো?"

— "ও একটা অ্যাসাইলামে থাকে। সপ্তাখানেক হল অ্যাসাইলামের পিছনের দিকের সিঁড়িতে ভাঙাভাঙির কিছু কাজ হচ্ছে। রাত হলে সেখান থেকে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।"

মনে মনে হিসেব করে অনিন্দ্য। এমন একটা অ্যাসাইলাম যার সিঁড়িতে ভাঙাভাঙির কিছু হচ্ছে। অবশ্য ক্রায়িং বেবি যদি ধুরন্ধর খুনে হয় তাহলে ভাঙা সিঁড়ির ব্যাপারটা মিথ্যে। আপাতত তার কোনও কথাকেই বিশ্বাস করা

যায় না। পিয়ালি কোথায় থাকে সেটা একমাত্র পিয়ালীর থেকেই জানা সম্ভব। কিন্তু পিয়ালিকে আবার ফিরিয়ে আনতে গেলে ট্রিগারটা জানতে হবে। কী করে পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয় মেয়েটার?

মাথা হাতড়ে উত্তর খুঁজতে থাকে অনিন্দ্য। এ ধরনের মানসিক রোগীদের পার্সোনালিটিগুলো ইমোশনাল স্ট্রেস থেকে জন্মায়। এমন একটা কিছু যদি করা যায়, যাতে পিয়ালির সত্তাটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে...

বিদ্যুৎ খেলে যায় অনিন্দ্যর মাথায়। পিয়ালির মেয়ে— মিনি। এখনও তার হাতেই আছে পুতুলটা। খানিকটা দূরে গিয়ে সেটা মাটির উপরে আছড়ে ফেলে অনিন্দ্য। পরমুহূর্তেই পাশে পড়ে-থাকা একটা পাথর তুলে নিয়ে আঘাত করে পুতুলের মাথার উপরে।

— "একী! এটা কী করছেন আপনি!" আহত বাঘের মতো হিংস্র চিৎকার করে ওঠে স্নেহা। অনিন্দ্য উত্তর দেয় না। আবার আঘাত করে।

— "স্টপ ইট..." মেয়েটার চিৎকারে আকাশ কেঁপে ওঠে।

— "পারবেন না, নখ দিয়ে আমার ল্যারিংকস ছিঁড়তে পারবেন না। তার জন্যে ছুরি দরকার..."

দুটো হাত তুলে অনিন্দ্যর দিকে ছুটে আসতে যায় মেয়েটি, কিন্তু কয়েক পা এসেই দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটির উপরে আছড়ে পড়ে। হিংস্র চিৎকারের শব্দটা মুহূর্তে করুণ আর্তনাদে পরিণত হয়।

ছেঁড়া পর্দার মতো কয়েক খণ্ড বাতাস বয়ে যায়। মেয়েটা মুখ তোলে। আবার সেই নরম শিশুর মতো দৃষ্টি। মাটিতে পড়ে-থাকা পুতুল আর অনিন্দ্যর হাতে ধরা পাথরটা দেখেই তার শরীরে একটা ধাক্কা লাগে। মুখে একটা শব্দ করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে এসেই পুতুলটাকে ছিনিয়ে নেয়, "এ কী করছিলে তুমি! মিনি, মিনি, চোখ খোল..."

পুতুলের গাল ধরে বারবার তাকে জাগানোর চেষ্টা করে পিয়ালি। অনিন্দ্য দ্রুতগতিতে উঠে পড়ে মাটি থেকে। এগিয়ে এসে পিয়ালির দুটো কাঁধ চেপে ধরে— "পিয়ালি আমার কথা শোনো... তোমার পুরো নাম কী?"

— "মিনি চোখ খুলছে না..." কান্নাভেজা গলায় বলে পিয়ালী।

— "খুলবে, তার আগে তোমাকে বলতেই হবে, নিজের সম্পর্কে যা মনে আছে, সব বলো আমাকে, প্লিজ।"

— "মিনি... মিনি..."

— "যদি আমাকে না বলো তাহলে ওই মেয়েটা মেরে ফেলবে মিনিকে..."

— "কে মেরে ফেলবে আমার মিনিকে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে পিয়ালি।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য কী বলবে, ভেবে পায় না অনিন্দ্য। পুতুলটা আবার কাঁদতে শুরু করেছে। সম্ভবত ওর শরীরে কোথাও একটা সুইচ আছে। তাতে চাপ পড়লেই কাঁদতে থাকে পুতুলটা।

পিয়ালীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— "এই তো চোখ খুলেছে মিনি।" খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সে।

— "কারও নাম মনে পড়ছে না? কে থাকে তোমার কাছে?" দু'হাতে পিয়ালির দুটো গালে হাত রাখে অনিন্দ্য— "মনে করো, প্লিজ মনে করো।"

— "মনে... আমার মনে..." অনিন্দ্যর মনে হয় পিয়ালি তার স্মৃতি হাতড়ে কিছু একটা তুলে আনার চেষ্টা করছে। সে উদ্গ্রীব চোখে তাকিয়ে থাকে নিষ্পাপ মুখের দিকে। আচমকাই অনিন্দ্যর খুব কাছে সরে আসে মেয়েটা, পুতুলটা অনিন্দ্যর হাতে দিয়ে, ঝিরঝিরে হাওয়ার মতো সুরেলা গলায় বলে, "মনে করতে পারলে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন আপনি?"

— "হ্যাঁ... কিন্তু তার আগে তোমার বাড়িটা..."

— "আমার বাড়ি না। আপনার বাড়ি..."

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায় অনিন্দ্য। অসংগতিটা ধরা পড়েছে তার কানে, অস্ফুটে উচ্চারণ করে, "স্নেহা, তুমি..."

মেয়েটার মুখে আবার সেই হাসিটা ফিরে আসে— "ও কিছু বলবে না, ও আমাকে ভয় পায়।"

অনিন্দ্য বুঝল, একটা বড়োসড়ো ভুল করে ফেলেছে সে। স্নেহা বিষধর সাপের মতো হিসহিসে গলায় বলে, "এই ভুলটা আর করবেন না। আমার আপনাকে খুন করতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছাটা জাগিয়ে তুলবেন না।"

— "আপনি আমাকে খুন করতে পারবেন না। আপনার কাছে ছুরি নেই।"

— "তা-ই নাকি?" ছোবল মারার মতো অনিন্দ্যর হাত থেকে পুতুলটা ছিনিয়ে নেয় সে, সেটা সামনে তুলে ধরে বলে, — "এর মাথাটা ঘুরিয়ে ছিঁড়ে ফেলুন, দেখুন কী আছে ভিতরে?"

— "মানে এতক্ষণ আমি..." বাক্যটা শেষ করে না অনিন্দ্য।

— "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুরিটা আপনিই বইছিলেন।" রাস্তার পাশে একটা পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ায় স্নেহা। ভেজা চুলগুলো বাঁধতে থাকে। কয়েকটা ভাবনা দ্রুত খেলতে থাকে অনিন্দ্যর মাথায়। হয় স্নেহায় ক্রায়িং বেবি, না হয় সে ডিলিউশনাল। যদি সে ক্রায়িং বেবি না হয় তাহলে পুলিশে খবর দিলে পিয়ালি স্বাভাবিক মানসিক রোগী থেকে হিংস্র মানসিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত হবে। এ ধরনের রোগীদেরকে অনেক সময় লোবোটোমি করে জড়পদার্থ করে দেওয়া হয়। পিয়ালির সঙ্গে সেটা কিছুতেই হতে দেবে না সে। আর যদি স্নেহা সত্যি ক্রায়িং বেবি হয় তাহলে আজ তাকে ছেড়ে দিলে আরও কয়েকটা নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যাবে।

সত্যিটা জানার একটাই উপায় আছে। পুতুলের মাথাটা খুলে দেখা যায়। কিন্তু পিয়ালি আবার ফিরে এলে পুতুলের মাথা ছেঁড়া দেখে কী করবে ঠিক নেই।

অনিন্দ্যর অসহায় লাগে। ফোনের দিকে না তাকিয়েই নম্বরটা ডায়াল করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয়। নাঃ, পিয়ালিকে নিয়ে এতটা রিস্ক সে নিতে পারবে না।

স্নেহার চুল বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, সে ছলনার হাসি হেসে বলল, "একটা ব্যাপার ভেবে মজা লাগছে, জানেন?"

— "কী?"

— "মানে আমার আর পিয়ালির চেহারায় কোনও পার্থক্য নেই। গলার স্বর, হাতের ছোঁয়া সব একই রকম। আপনি ওঁর দিকে অমন হাঁ করে চেয়েছিলেন। অথচ আমি এতক্ষণ ধরে চুল বাঁধলাম, একবার ফিরেও তাকালেন না।"

— "আপনার দিকে তাকালে কেন জানি না ভয় করছে খুব।"

— "স্টপ ইট, ম্যান। স্বীকার করুন, আপনাদের পুরুষদের ন্যাকা-ন্যাকা আতুপুতু টাইপের অসহায় মেয়েই ভালো লাগে। ওইটাই আপনাদের দুর্বলতা। ঠিক যেমন মেয়েদের দুর্বলতা শিশুর কান্না শুনে ছুটে আসা..."

— "আপনি নাকি বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ করতে পারেন... একটু করে দেখাবেন?" স্নেহা ক্রায়িং বেবি কি না জানার এইটাই একমাত্র উপায়।

— "আপনি জানলেন কী করে?"

— "রেডিয়োতেই বলছিল..."

রেডিওর ব্যাপারটা শুনে আবার খুশি হয় স্নেহা। থমকে দাঁড়ায়। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফ্যালে। কয়েক সেকেন্ড পরেই স্নেহার হাতের ফাঁক থেকে অবিকল শিশুর কান্নার মতো একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। অনিন্দ্য থ হয়ে যায়। দূর থেকে এ আওয়াজ শুনলে মনেই হবে না একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের গলা থেকে বেরোচ্ছে শব্দটা।

মুখ ঢেকেই এবার হাসতে থাকে স্নেহা। অনিন্দ্যর হাতটা এই সুযোগে চলে গেছে ফোনের উপরে। নম্বরটা ফুটেই আছে স্ক্রিনের উপরে। সে ডায়াল বাটানটা টিপে দেয়।

— "খুব ছোটো থেকে পারি এটা। একজনের থেকে শিখেছিলাম।"

আবার ফোনটা কেটে দেয় অনিন্দ্য— "কার থেকে?"

সদ্য-ভেজা মার্কারি ভেপারের আলো ছড়িয়ে আছে রাস্তার উপরে। আলো-আঁধারি হয়ে আছে চতুর্দিক। তার ভিতর দিয়েই হাঁটতে থাকে দুটো মানুষ। স্নেহা ধীরে ধীরে বলে,

— "পিয়ালি ছোটো থেকেই অ্যাসাইলামে। তো অনেক বছর আগে আমরা যে অ্যাসাইলামে থাকতাম সেখানে একজন রোগী এসেছিল, বুঝলেন? পিয়ালির মতোই নাটহেড। ভালোনাম জানি না। তবে ডাকনাম ছিল লিলি। পিয়ালির সঙ্গেই কথা বলত বেশি। আমি এলেই অ্যাভোয়েড করত।"

— "অ্যাভয়েড করত কেন?"

অনিন্দ্যর দিকে আরও কিছুটা সরে এসে হাঁটতে থাকে স্নেহা, — "লিলি বলত ওর নাকি খুন করতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে সিমপ্যাথি

জিনিসটা দেখলেই নাকি হিংসা হত ওর। মায়ের কাছ থেকেও হয়তো কিছুটা সিমপ্যাথি চেয়েছিল, পায়নি, তাই... বলত আমার সঙ্গে কথা বললে ওর খুন করার ইচ্ছাটা বেড়ে যায়।"

অনিন্দ্যর মনে পড়ে রেডিয়োতে বলছিল, এই ধরনের খুনিরা ছেলেবেলার কোনও সাপ্রেসড ইমোশন থেকে খুন করে।

— "ওর বাবা-মা-র ডিভোর্স হয়ে গেছিল। তো লিলি ওর বাবার কাছে থাকত। আর এই বাবাটাই অ্যাবিউজ করত ওকে। পঙ্গু করে রাখার জন্য কী সব ইনজেকশন দিত।"

— "পঙ্গু করে রাখার ইনজেকশন?"

একটু থমকায় স্নেহা। বলে, — "আমি ঠিক জানি না কীসের ইনজেকশন। পিয়ালি জানে। আমাকে খুলে বলেনি। শুধু এরকম বাচ্চাদের মতো হাসতে পারত ও। এভাবে হাসলে নাকি ওর বাবা খুশি হত। আমি ওর কাছ থেকেই শিখে নিই।"

— "তারপর লিলি গেল কোথায়?"

— "বছর দুয়েক পর ওকে অন্য অ্যাসাইলামে নিয়ে যাওয়া হয়।"

— "কেন?"

স্নেহার গলা এবার ক্লান্ত শোনাচ্ছে, কিছু কি বদল আসছে ওঁর মধ্যে?

— "লিলি এমনিতে শান্ত ছিল। একদিন হঠাৎ করেই একটা মজার কাণ্ড করে ফ্যালে। সেদিন ওকে ওর মা দেখতে এসেছিল। মাকে দেখলে সেদিন লিলির মনটা ডিস্টার্বড থাকত। সেদিন একটু বেশি হয়েছিল। সারারাত ও কাঁদছিল..."

স্নেহাকে উদাস দেখায়। যেন নিজেরই কোনও যন্ত্রণাময় স্মৃতি মনে করছে— "সে রাতে আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। ও একসময় কাঁদতে কাঁদতে করিডোরে বেরিয়ে যায়। প্রথমে স্বাভাবিক ভাবেই কাঁদছিল। হঠাৎ খেয়াল করলাম, কান্নাটা বদলে গেছে। একটা শিশুর মতো কাঁদছে ও। আমি তো অবাক... একটু পরে বুঝলাম ওর উদ্দেশ্য। একজন নার্স সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অ্যাসাইলামে অত ছোটো বাচ্চা ছিল না। ফলে

কাজটা কোনও রোগী করছে বলে সন্দেহ করেনি সেই নার্স। বাইরে আসতেই লিলি ওর ল্যারিংসে কাঁটা চামচ ঢুকিয়ে খুন করে। নার্সের গলা চিরে বেরিয়ে-আসা রক্ত মাখতে মাখতে ওর কান্না হাসিতে বদলে যায়... এবার গেস করুন দেখি ওকে কাঁটা চামচটা কে দিয়েছিল?"

— "আপনি?"

উত্তেজনার স্রোত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অনিন্দ্যর সমস্ত শরীরে। এই লিলিই যে ক্রাইং বেবি তাতে সন্দেহ নেই। উত্তেজনার ভিতর থেকেই উত্তরটা খেলে যায় তার মাথায়

— লিলি আর কেউ নয়। পিয়ালি ও স্নেহারই আর একটা পার্সোনালিটি...

দূরে একটা ছায়া দেখা গেছে এতক্ষণে। একটা ভিখারিজাতীয় মহিলা রাস্তা পার হচ্ছে। সেটা দেখেই স্নেহার চোখে ঝিলিক খেলে যায়, "গুড বাই। উই হ্যাড আ গ্রেট টাইম, ম্যান। নাউ আই হ্যাভ ওয়ার্ক টু ডু।"

ছুটে সেদিকে এগিয়ে যায় স্নেহা। অনিন্দ্য তাকে বাধা দিতে যায়, কিন্তু তার আগেই তার পকেটে ফোনটা ভাইব্রেট করে ওঠে। দ্রুত সেটা কানে চেপে ধরে।

— "হেল্লো। রেডিয়ো হেল্পলাইন।"

গলাটা চিনতে পারে অনিন্দ্য। রেডিওর ঘোষক সেই ছেলেটা। তিনবার নম্বর ডায়াল করেও কেটে দিয়েছে ও। তাই ওরা কল ব্যাক করেছে।

অনিন্দ্য আমতা আমতা করে "আসলে ওই ক্রায়িং বেবির ব্যাপারটা... আমি এক্ষুনি নর্থ কলকাতার কপার লেনে দাঁড়িয়ে ওইরকম একটা কান্না শুনেছি... একটি মেয়ে আমার সঙ্গে ছিল, মনে হচ্ছে, ও বিপদে পড়তে চলেছে... প্লিজ, একটা কিছু..."

— "মেয়ে? আপনার বাড়িতেই..."

অনিন্দ্য কথা শেষ হতে দেয় না— "চিনি না মেয়েটিকে। ওর মাথার ঠিক নেই, কোনওভাবে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে..."

— "বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়েছেন আপনারা, তা-ই তো?"

অনিন্দ্য কয়েক সেকেন্ড ভেবে নেয়, উত্তরটা যদি — 'না' দেয় তাহলে

এরা গুরুত্ব দেবে না ব্যাপারটাকে।

— "হ্যাঁ, শুনেছি। প্লিজ তাড়াতাড়ি করুন..."

— "আপনি শিয়োর? বাড়িতে বাচ্চা নেই আপনার?"

— "আমি বাড়িতে নেই। রাস্তার উপরেই..."

ওদিক থেকে হো হো করে হসে ওঠে ছেলেটা— "ওঃ আপনি মনে হয় ঘোষণাটা শুনেই রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিকটা আর শোনেননি। ইট ওয়াজ আ প্র্যাংক। আ প্র্যাকটিক্যাল জোক।"

— "মানে?" অনিন্দ্য অবাক গলায় প্রশ্ন করে।

— "ইয়েস। দেয়ার ইজ নো ক্রায়িং বেবি। আমরা আসলে একটা সোশ্যাল সার্ভে করছিলাম। মানে মানুষের মনে যদি কোনও স্পেসিফিক ভয় আগে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষও হ্যালুসিনেট করতে থাকে। ইউ ওন্ট বিলিভ বাট আপনি আমাদের সিক্সটিন্থ কলার, যিনি আউট অফ নাথিং বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়েছেন..."

— "প্র্যাংক!" অনিন্দ্যর শব্দটাকে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগে। আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কেটে দেয় সে। ক্রায়িং বেবি বলে কেউ না থাক, স্নেহাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। অনিন্দ্য ভেবে দ্যাখে এতক্ষণে স্নেহা একবারও বলেনি সে ক্রায়িং বেবি। হয়তো সে সত্যি রাত হলে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে খুন করে।

কয়েকটা প্রশ্ন এখনও অস্পষ্ট অনিন্দ্যর কাছে। সেগুলো আপাতত সরিয়ে রেখেই সে সামনে দৌড়াতে থাকে। একটা খুনিকে কিছুতেই হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

— "স্নেহা..."

মেয়েটা এগিয়ে গেছিল। সে পেছন ঘোরে না।

— "পিয়ালি..."

মেয়েটা থেমে যায়। ঘুরে তাকায় পিছনে। অনিন্দ্য একদৌড়ে এগিয়ে যায় তার দিকে। তাকে সামনে পেয়ে নরম হাসি খেলে যায় মেয়েটার ক্লান্ত মুখে— "তুমি... তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলে না তো..."

ফেলে দেব। আমাকে ক্ষমা করে দিও পিয়ালি।"

— "ক্ষমা! কিন্তু আমি তো..."

— সে আর কিছু বলার আগেই তার হাত থেকে পুতুলটা ছিনিয়ে নেয় অনিন্দ্য। তারপর একটানে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে সেটার মাথা। পিয়ালি সন্তানহারা মায়ের মতো ডুকরে চিৎকার করে ওঠে। সেদিকে কান দেয় না অনিন্দ্য। সে স্থির চোখে চেয়ে দেখে পুতুলের ভিতরটা খালি। ছুরির কোনও চিহ্ন নেই সেখানে।

— "তুমি... তুমি খুন করলে ওকে!"

বিড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পিয়ালি। নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে অনিন্দ্যকে।

— "আমি... আমি তোমাকে..." দুটো সপাটে চড় গালে পড়ে তার। আর কিছু বলে ওঠার আগেই পুতুলের মাথা আর দেহটা বুকে আগলে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় পিয়ালি। আর্ত চিৎকারের শব্দ মিলিয়ে আসে।

অনিন্দ্যর হুঁশ ফিরতে কয়েক মিনিট সময় লাগে। উঠে দাঁড়াতেই তার বুকের ভিতরে একরাশ যন্ত্রণার ঢেউ আছড়ে পড়ে। স্নেহা, পিয়ালি কেউ খুনি নয়। সম্ভবত লিলি বলেও কেউ ছিল না।

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে পিয়ালিকে। এত রাতে একটা মেয়ে এভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে...

মেয়েটাকে কি ভালোবেসে ফেলেছে ও?

— "পিয়ালী... প্লিজ আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো।" চিৎকার করে ওঠে অনিন্দ্য। বাতাস ঢিমে তালে বইতে থাকে। কোনও উত্তর আসে না।

পরের আধ ঘণ্টা উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে ছুটে বেড়াতে থাকে অনিন্দ্য। কপার লেনের আশপাশের কানাগলিগুলো হানাবাড়ির মতো হাঁ করে আছে। ব্ল্যাকহোলের মতো গিলে খেয়েছে পিয়ালিকে।

ঘণ্টাখানেক পর অনিন্দ্য ক্লান্ত হয়ে একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফোনটা বের করে একবার দ্যাখে। কিছু একটা খটকা লাগে তার। কিন্তু সেটা ভাবার আগেই একটা চাপা শব্দ কানে আসে।

কান্নার আওয়াজ— একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। একটু আগে স্নেহা যেমন করে হেসেছিল।

— "পিয়ালি..." প্রায় ছুটে সেদিকে এগিয়ে যায় অনিন্দ্য। খটকাটা তার মাথা থেকে উবে গেছে।

অন্ধকারের বুক থেকে ভেসে আসছে কান্নাটা।

— "পিয়ালি আমাকে ক্ষমা করে দাও... আমি তোমাকে সন্দেহ..."

সামনে এগোতে গিয়েও থমকে যায় অনিন্দ্য। পিছনে একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। পিয়ালী যদি সামনে থেকে থাকে তাহলে পেছনে কে?

সে পেছনে ঘোরে। পিয়ালি দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকায় অনিন্দ্য— "তুমি এখানে! তাহলে..."

মুখ ফিরিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে ফেরে অনিন্দ্য। কাঁপাকাঁপা আঙুলে অন্ধকারের ভিতরের দিকে নির্দেশ করে পিয়ালি, একটা শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে,

— "ওই যে—লিলি!"

কান খাড়া করে অনিন্দ্য শোনে, সামনে থেকে একটা চাপা গলার স্বর ভেসে আসছে, চিনতে পারে সে, একটু আগের শোনা সেই কবিতার কয়েকটা লাইন— 'হেঁটেছি অনেক পথ; আমার ফুরালো পথ; এখানে সকল পথ, তোমার পায়ের পথে গিয়েছে নীলাভ ঘাসে মুছে।'

কবিতাটা শেষ হতেই দুটো শক্ত হাতের ধাক্কায় রাস্তার উপরে আছড়ে পড়ে অনিন্দ্য। সামনে তাকিয়ে দেখে একটা ছায়ায় ঢাকা মূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে। মূর্তির একহাতে ধারালো ছুরি। অন্য হাতে একটা ইঞ্চি পাঁচেকের পুতুল।

— "লীলাময় গুহ। আমার মায়ের দেওয়া নাম। বাবা ডাকত লিলি।"

গলাটা চেনে অনিন্দ্য। হঠাৎ করে খটকাটা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। যে ফোনটা তার কাছে এসেছিল, সেটা কোনও রেডিয়ো স্টেশনের রেজিস্টারড নম্বর নয়। পারসোনাল নম্বর।

মানুষটার মুখটা এখনও ঢেকে আছে অন্ধকারে। শুধু গলাটা চেনা লাগছে, ভীষণ চেনা লাগছে। কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, এই গলাতেই শুনেছিল কবিতাটা।

তুমি যে রয়েছ কাছে; ঘাসে যে তোমার ছায়া; তোমার হাতের ছায়া; তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে, আকাশে চাঁদের আলো; উঠোনে চাঁদের আলো; নীলাভ চাঁদের আলো; এমন চাঁদের আলো আজ।

— "এই কবিতাটা শুনলেই আমার নিজের মা-বাপের কথা মনে পড়ে, জানেন? বাপটা বেওড়া ছিল। মেয়ের শখ ছিল তার। কিন্তু হয় ছেলে। যত দিন যায়, তার মেয়ে-সন্তানের শখ বেড়ে উঠতে থাকে। পাগলা হয়ে যায় শালা। ছেলেটাকেই অ্যাবিউজ করে কয়েকবার। অ্যাবিউজ বোঝেন তো আপনি? মানে..."

ছেলেটা বলে চলেছে কথাগুলো। এই মুহূর্তে তার হাত ঘোরাফেরা করছে অনিন্দ্যর বুকে, কোমরে। ছুরিটা উঠে এল ছেলেটার হাতে ধরা পুতুলটার গলার কাছে। পুতুলের মাথাটা খসে পড়ল ধড় থেকে।

— "হারামিটা আমার বডিতে মেয়েছেলের মাল ফুটিয়ে তুলতে হরমোনাল ইনজেকশন দিত রোজ। ওই ইনজেকশনগুলো আমার নার্ভকে শেষ করে দিত। গলাটা মেয়েলি হয়ে যেত আমার, শরীরটাও। কষ্ট হত ভীষণ... ভীষণ... একটু পরে আপনার যেমন হবে... মা কে বলতাম, আমাকে এর হাত থেকে বাঁচাও, কিন্তু মা-ও শালা জানত একবার এইসব খবর বাজারে এলে বাবার জেল হাজত হয়ে যাবে। মান-সম্মান সব ভোগে যাবে... শেষে একদিন সবাই জানল... ততদিনে আমিও শালা বেওড়া হয়ে গিয়েছি..."

— "কিন্তু আমি কী করেছি আপনার?" অনিন্দ্য চিৎকার করে উঠল।

— "করবি। আজ না হোক কাল। কারো না কারো বাপ তো হবি, তা-ই না? ওই যে বললাম— 'ঘাসে যে তোমার ছায়া; তোমার হাতের ছায়া; তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে'..."

— "কিন্তু... আমি..."

একটা সরু ছুরির ফলা অনিন্দ্যর গলাটা চিরে দেয়। বগবগিয়ে রক্ত বেরিয়ে

আসে সেখান থেকে। রক্তাক্ত অসহায় চোখে মৃত্যুর আগে শেষ একবার পিয়ালির দিকে তাকায়। এদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই পিয়ালির। মেয়েটা আবার সেই আগের লালাবাই গেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পুতুলের মাথাটা একমনে জোড়ার চেষ্টা করছে। সেটা জুড়বে না আর।

মিনিট দশেক পর কপার লেনের লাগোয়া কানাগলিতে পড়ে থাকে অনিন্দ্যর নিথর দেহটা। বৃষ্টির জমা জলে শরবতের মতো মিশতে থাকে রক্তের স্রোত। তার থেকে একটু দূরে পড়ে থাকে একটা মাথাকাটা পুতুলের দেহ।

কাছেই কোনও বাড়ির দোতলায় একটা শিশুর কান্না শোনা যায়। কেন কাঁদছে? কে জানে...

শিশুরা অকারণেই কাঁদে।



সুর



টুং করে একটা শব্দ হতেই আঠেরোতলার লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। এবং সামনে তাকাতেই বিনোদের মনটা শরতের কাশের মতো দুলে উঠল। লিফ্‌টের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে তৃষা।

এই স্টুডিয়োতে জয়েন করার পর থেকেই তৃষাকে ভারী ভালো লাগে বিনোদের। রিসেপশনিস্টের কাজ করে তৃষা। সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে ভয়েস ওভারেও কাজে লাগে। মুখটা পুতুলের মতো। টুকটুকে ফরসা। তবে যে জিনিসটা সব থেকে বেশি আকর্ষণ করে, সেটা হল ওর চোখ। ভরাট ডাগর অস্থির চোখে কুচকুচে কালো মণি। সারাক্ষণ যেন কাউকে খুঁজে চলেছে। বিনোদের মনে মনে ইচ্ছা ওই অস্থির মণি দুটো একদিন ওকেই খুঁজুক। মাঝেমধ্যে বিনোদের মনে হয়, তৃষারও ভালো লাগে ওকে। কে জানে...

— "বিনোদদা যে, কাজ কমপ্লিট?"

'দা' শুনতে ভালো লাগে না বিনোদের। ওকে কি বন্ধু ভাবতে পারে না তৃষা? কাষ্ঠহাসি হাসে, বলে, "এই আছি আর কী, আপনি বাড়ি ফিরছেন?"

— "উহু, তোমাকে লিফ্‌টে উঠতে দেখলাম তাই ধাওয়া করে এলাম।" কথাটা বলে একটু হাসে তৃষা। বিনোদ ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

— "কেন? করতে পারি না?"

— "হ্যাঁ..." আমতা আমতা করে উত্তর দেয় বিনোদ, "কিন্তু আমি..."

— "হ্যাঁ... তুমি। অফিসে ওরকম হাঁ করে তাকিয়ে থাকো কেন বলো তো?" কথাটা বলে সটান বিনোদের দিকে ঘুরে তাকায় তৃষা। ওর ডান গালে রাখে নরম হাতটা, ·

— "আমাকে ভালো লাগে, তা-ই না বিনোদদা?"

চোখের দিকে তাকায় বিনোদ, চোখ মিথ্যে বলে না। মেয়েটা কি মজা করছে? বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে, এই মুহূর্তে তৃষার অস্থির চোখ দুটো ওকেই খুঁজছে। লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ভিতরে এই দুটো প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। সেটা হুড়মুড়িয়ে নেমে চলেছে নীচের দিকে। একটা ভীষণ অস্বস্তির ঢেউ বিনোদকে চেপে ধরে।

— "জানো, এই অফিসটা ভালো নয়, এখানে এসে থেকে কয়েকজন আমাকে..."

তৃষার মাথাটা ঢলে পড়ে বিনোদের বুকে। মেয়েটার চোখ থেকে কিছু একটা তরল গড়িয়ে নামছে বিনোদের বুকে। তৃষা কাঁদছে?

সুর

বিনোদের অস্বস্তিটা বেড়ে ওঠে। তৃষার চোখ দুটো সে পছন্দ করে। কিন্তু সে চোখ থেকে জল নামলে কেমন দেখাবে তা সে কল্পনা করেনি। সে লিফ্‌ট থেকে কোনওমতে বের হতে চায়। কিন্তু লিফ্‌টটা থামছে না কেন?

— "প্লিজ, আপনি এভাবে কাঁদবেন না... আপনাকে হাসলে ভালো লাগে... আমি আপনাকে..."

হঠাৎ বিনোদের পকেটে ফোনটা বেজে ওঠে। সে ছিটকে সরে আসতে চায়। কিন্তু তৃষার নরম হাতগুলো আগলে ধরেছে তাকে। মেয়েটার কান্নাটা বেড়ে উঠেছে। স্টুডিয়োতে কি খারাপ কিছু হয়েছে তৃষার সঙ্গে?

দীপ ফোন করেছে। বিনোদ সেই অবস্থাতেই ফোনটা রিসিভ করে কানে লাগায়। ওপাশ থেকে গলা শোনা যায়, "শালা আহাম্মক, আজ আবার স্টুডিয়োতে ছাতা ফেলে যাচ্ছিস।"

— "এঃ! একদম ভুলে গিয়েছি! তুলে রাখ, কাল এসে নেব।"

— "এখন তো বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে বাড়ি ফিরবি নাকি?"

— "বৃষ্টি পড়ছে!" বিড়বিড় করে বিনোদ, "আচ্ছা, দাঁড়া, লিফ্‌টে আছি। ব্যাক করছি..."

দীপ ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওপাশ থেকে একটা গলা শুনতে পেল বিনোদ। সে একটু থমকে বলল, "দীপ, শুনছিস?"

— "কী?"

— "তোর পাশ দিয়ে এখুনি কেউ হেঁটে গেল, গান গাইতে গাইতে..."

— "হ্যাঁ... গেল তো..."

— "কে?"

কয়েক সেকেন্ড সময় নিল দীপ, তারপর উত্তর শোনা গেল, "তৃষা... ওয়াশরুমের দিকে গেল..."

দীপ মিথ্যে বলেনি। গলার আওয়াজটা শুনেছে বিনোদ। তার বাঁ হাতটা এতক্ষণ তৃষার মাথায় ছিল। এবার সেটা নেমে আসে। দু-হাতের ধাক্কায় তাকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দেয় বিনোদ।

— "কে তুমি?"

ফাঁকা লিফ্‌টের মধ্যে গমগম করে ওঠে চিৎকারটা। তৃষার মুখটা এখন ঢেকে আছে কপাল বেয়ে নেমে আসা-ঘন চুলের ঝালরে। মিষ্টি সুর কানে আসছে বিনোদের। সুরটা সে একটু আগেই কোথাও শুনেছে।

— "ও মা! আমি তৃষা, সেই যার চোখ দুটো ভালো লাগে তোমার? দেখবে এখন আমার চোখ দুটো?" উচ্ছল গলায় বলে তৃষা, কিন্তু তাতেই বিনোদের শরীরের মাঝখান দিয়ে একটা সরীসৃপ উঠছে মনে হয়।

মুখটা একটুও দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে তৃষার দুটো হাত উঠে আসে। চুল দু-পাশে সরিয়ে নিজের মুখটা দেখাতে চায় সে।

— "উহু... চোখ সরালে চলবে না। তাকিয়ে থাকো আমার দিকে... দ্যাখো, দ্যাখো আমার চোখ দুটো... বিনোদ..."

বিনোদের পা কেঁপে ওঠে। নিজের বুকের দিকে তাকায় সে। এতক্ষণ বুকে যে তরল স্পর্শটাকে সে জল ভাবছিল, সেটা জল নয়, রক্ত!

মাঝখান থেকে চিরে চুল দু-দিকে ফাঁক করছে তৃষা।

— "তাকিয়ে আছ তো?..." খেলার ছলে বলে সে, "এক... দুই..."

তিন গোনার আগেই কয়েক সেকেন্ড থেমে যায় তৃষা। তারপর এক ঝটকায় সরিয়ে ফেলে সমস্ত চুল। তীব্র আকাশ বিদীর্ণ করা পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ে সে। একটু আগে যে হাসি দেখতে চাইছিল বিনোদ...

তার ঘন হরিণ চোখের মণিটা এখন উধাও। সাদা, পোর্সিলিনের মতো দুটো চোখ। উদ্দাম নারকীয় হাসিতে বারবার কেঁপে উঠছে, কালো চেরা দাগে ভরে যাচ্ছে মুখ। তৃষার শরীরটা বদলে যাচ্ছে অন্য কিছুতে।

একটু আগের সেই মিহি সুরটা বেড়ে চলেছে...

(দুই)

— "আপনার নাম?"

— "দীপ্তাংশু মিত্র।"

— "ভিকটিম শেষ আপনাকেই কল করেছিল?"

সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে দীপের। এই ক-দিন রাতে ভালো ঘুম হয়নি। চোখ বুজলেই বিনোদের মাঝখান থেকে দু-ভাগ হওয়া শরীরটা...

স্টুডিয়োরই ওয়েটিং রুমে ইন্টারোগশন চলছে। দীপের সামনে বসে আছেন ইন্সপেক্টর নিরলস ব্যানার্জি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুঠাম ঋজু চেহারা। শান্ত, ঘন চোখে চেয়ে আছেন সামনের টেবিলে বসা দু-জনের দিকে। একটু আগে লিফ্‌টের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর থেকেই তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে আছে।

— "ও করেনি স্যার, আমি করেছিলাম। ছাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল, ভাবলাম এখনও বেশি দূর যায়নি, তাই কল করে ফিরে আসতে বললাম।"

— "গলায় অস্বাভাবিক কিছু খেয়াল করেছিলেন?"

— "অস্বাভাবিক কিছু..." একটু ভাবতে হয় দীপকে, "শিয়োরলি বলতে পারব না, তবে মনে হয়, একটু এক্সাইটেড লাগছিল।"

কবজির উপর রাখা নোটবুকে কিছু লিখে নিলেন ইন্সপেক্টর, তারপর মুখ তুলে বললেন, — "দেখুন দীপ্তাংশুবাবু। খুন একটা হয়েছে, মানে খুনি একজন আছে। এবং এখানে যেভাবে খুন হয়েছে, তাতে আত্মহত্যার কথা ভাবাই যায় না। খুনি একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছে এটা খুন! স্ট্রেঞ্জ!"

পরের কথাগুলো বলতে ইতস্তত করে দীপ, "আপনি তো স্যার ফুটেজটা দেখলেন। তারপরেও বলবেন এটা স্বাভাবিক একটা খুন?"

— "অলৌকিক কিছু সাজেস্ট করতে চাইছেন?" ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে ইন্সপেক্টারের মুখে, "ফুটেজে যা দেখা যাচ্ছে, সেটা অ্যাবসার্ড বটে, কিন্তু

অলৌকিক ছাড়াও তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।" বড়ো করে একটা নিঃশ্বাস নেন ব্যানার্জি, "ফুটেজে আমরা দেখছি সেদিন সন্ধে সাতটা পনেরোতে আঠেরোতলা থেকে লিফ্‌টে ওঠেন বিনোদবাবু। সে সময়ে লিফ্‌টে তিনি একাই ছিলেন। তবে ওঠার পর থেকেই তিনি অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেন। দেখে মনে হয় যেন তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ আছে। কারো সঙ্গে কথা বলতেও শোনা যায়। অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লিফ্‌ট ফাঁকা। আমরা ধরে নিতে পারি, কোনওরকম মানসিক সমস্যা ছিল তার। হ্যালুসিনেশন। এর কিছুক্ষণ পর লিফ্‌টের আলো নিবে যায় এবং মিনিট দশেক আলো বন্ধ থাকে। আলো জ্বলে উঠতে দেখা যায়, বিনোদবাবুর দেহ লিফ্‌টের মেঝেতে পড়ে আছে। এবং শরীর মাঝখান থেকে দু-ভাগ করে কাটা। কোয়াইট আ গোর। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যতক্ষণ আলো বন্ধ ছিল, তার মধ্যে কেউ লিফ্‌টে ঢুকে খুনটা করে বেরিয়ে যায়?"

দীপের পাশের চেয়ারেই বসে ছিল জয়ন্ত। মুখ তুলে বলে, "দশ মিনিটের মধ্যে একটা মানুষকে আধখানা করে লম্বালম্বি কেটে ফেলা... এটা সম্ভব স্যার? তা ছাড়া লিফটের লগ বলছে, ওই সময়ের মধ্যে লিফ্‌ট একবারও থামেনি, চলন্ত লিফ্‌টের মধ্যে মানুষ কী করে ঢুকবে বলুন তো?"

গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বোলালেন ব্যানার্জি,— "মানে আপনাদের যুক্তি হল একটা ফাঁকা অন্ধকার লিফ্‌টের মধ্যে একটা নিরস্ত্র মানুষ নিজেকে দু-আধখানা করে কেটে ফেলেন! দ্যাট টু কোনও ওয়েপন ছাড়া!"

— "এটা কোনও মানুষের কাজ নয়, স্যার।" কথাটা বলতে গিয়ে জয়ন্তর গলা কেঁপে যায়।

সেদিনের ঘটনার পরে প্রায় দিন সাতেক কেটে গেছে। স্টুডিওর পরিবেশ আগের থেকে কিছুটা শান্ত হয়েছে। কাজকর্ম আবার শুরু হয়েছে আগের মতো। বিনোদের দেহ ফরেনসিক করে আলাদা কিছু পাওয়া যায়নি। তারা জানিয়েছে, "ক্লিন কাট, কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর থেকে নিচ অবধি মাছের মতো কাটা হয়েছে মানুষটাকে। শরীরের দুটো ভাগেই অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।"

— "আপনাদের স্টুডিয়োটা কত দিনের?"

— "এই বছর পাঁচেকের হবে।" জয়ন্ত বলে।

— "মালিক তো আপনি?" দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন ব্যানার্জি।

— "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

— "কী ধরনের কাজ হয় এখানে?"

— "সাউন্ড স্টুডিয়োতে যা হয়, অনেকে গান রেকর্ড করতে আসে, আমরা সুরও তৈরি করে দিই দরকার হলে। তারপর ধরুন ফলি থেকে শুরু করে..."

— "মোট ক-জন কাজ করে এখানে?"

— "স্টুডিয়োটা তো বিশেষ বড়ো নয়। সব মিলে পাঁচজন।"

— "নামগুলো বলবেন?"

দীপ বড় একটা শ্বাস নিয়ে বলতে থাকে, "আমরা দু-জন ছাড়া তৃষা বলে একটি মেয়ে আছে। তা ছাড়া বিকাশদা রেকর্ডিংটা দেখেন।"

— "বেশ, আপনারা কী কাজ করেন?"

— "তৃষা রিসেপশনিস্ট, কোনও ক্লায়েন্টের ফিমেল ভয়েস ওভার দরকার হলে ও করে দেয়। বাকি আমরা তিনজন সাউন্ড মিক্সিংটা দেখি।"

— "আর যিনি মারা গিয়েছেন, আই মিন বিনোদ কাঞ্জিলাল?"

— "ও মেইনলি ভয়েস ওভার করত। মানে টিভি তে যে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেখেন, সেখানে যেমন থাকে-না..."

— "হুম..." নোটবইটা বন্ধ করে পকেটে রাখেন ব্যানার্জি, তারপর জয়ন্তর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেন "আপনি এখন যেতে পারেন। দীপ্তাংশুবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে আমার।"

জয়ন্ত বেরিয়ে যেতে ব্যানার্জি দীপের দিকে ফেরেন,— "দেখুন। এটা যে হোমিসাইড তাতে সন্দেহ নেই। যেহেতু স্টুডিয়োর বিল্ডিং-এই হয়েছে এবং বিল্ডিঙের দারোয়ান বাইরে থেকে কাউকে লিফ্‌টে উঠতে দেখেনি তাই আপনাদের চারজনের কেউই সন্দেহের বাইরে নন। আপনাদের ফোন নম্বর আর ঠিকানাগুলো একটু লাগবে আমার।"

— "বাকিদেরগুলো দিচ্ছি, কিন্তু আমার ফোনটা ক-দিন হল সার্ভিস

সেন্টারে দিয়েছি। কল রিসিভ করতে পারব না।”

— “সারাতে দিয়েছেন কেন?”

— “একটু প্রবলেম হচ্ছে, স্যার। কল রিসিভ করলেই কখনও মিউট, আবার কখনও নিজে থেকেই কল রেকর্ড শুরু হয়ে যাচ্ছে।”

কিছুটা এগিয়ে বসলেন ইন্সপেক্টর, — “মানে ঘটনার দিনের আপনার সঙ্গে বিনোদবাবুর কলটাও রেকর্ড হয়ে থাকতে পারে!”

দীপের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে— “হ্যাঁ... হ্যাঁ স্যার। হতে পারে। আমার খেয়াল ছিল না একদম।”

— “যদি হয়ে থাকে তাহলে ওই রেকর্ডিংটা আমার চাই...”, টেবিলের উপরে হাত দিয়ে চাপড় মারেন ব্যানার্জি। নার্ভগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে তার।

— “ফোনটা ঠিক হয়ে এলেই আমি আপনাকে...”

— “না। এক্ষুনি লাগবে আমার... সার্ভিস সেন্টারের নম্বর আছে?”

— “আমার কাছে নেই, কিন্তু ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে।”

— “লুক ফর ইট। তারপর কল করে বলুন ওটা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে।”

দীপ দ্রুত ল্যাপটপ টেনে নিয়ে সার্চ করতে শুরু করে। ব্যানার্জি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গোটা স্টুডিয়োটা ভালো করে ঘুরে দেখতে থাকেন। মোট চারটে রুম। একটা রিসেপশন কাম ওয়েটিং রুম। একটা রেকর্ডিং রুম আর দুটো ঘরে বড়ো মেশিনে মিক্সিং হয়। রেকর্ডিং রুমের দু-দিকের দেওয়ালে দুটো বড়ো কাচের জানলা। দুটো জানলা দিয়ে দুটো মিক্সিং রুমের ভিতর দেখা যায়। রেকর্ডিং রুমে শিল্পীকে হাতের ইশারায় কিছু সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয় জানলাগুলো। তবে মূলত মিক্সিং রুম থেকে কণ্ঠশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয় হেডফোনের মাধ্যমে।

ব্যানার্জি ফাঁকা রেকর্ডিং রুমের ভিতর ঢুকে এলেন। ঘরে দুটো চেয়ারের উপর দুটো হেডফোন রাখা। সেগুলোতে কান রাখলে মিক্সিং রুমগুলোর ভিতরের শব্দ শোনা যাবে।

ব্যানার্জি প্রথম হেডফোনটায় কান রাখতে রুমের স্পিকারে বাজতে-থাকা

বাউল গানের সুর শুনতে পেলেন। সেই সঙ্গে দু-জন মানুষের কথাবার্তা। গানে ঠিকঠাক সুর বসছে কি না সেই নিয়ে আলোচনা চলছে।

সরে এসে দ্বিতীয় হেডফোনটায় কান রাখলেন তিনি। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরটা অন্ধকার। অর্থাৎ কাজ হচ্ছে না সেখানে। অথচ একটা মিষ্টি সুর বেজে চলেছে হেডফোনে। সুরটা চালিয়ে রেখেই কি কেউ ঘর অন্ধকার করে চলে গিয়েছে?

হঠাৎ ব্যানার্জির মনে হল ঘরের ভিতরের অন্ধকারটা নিষ্প্রাণ নয়। কিছু একটা নড়াচড়া করছে সেখানে। হাত তুলে একটা ইশারা করলেন তিনি। মনে হল, ওদিকের মানুষটাও হাত তুলল। জানলার কাছে ডাকল কি?

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তিনি। ঘরের অন্ধকার আর-একটু গাঢ় হয়ে উঠল। জানলার কাচ ঘেঁষে চোখ নিয়ে যেতে ব্যানার্জির মনে হল, জানলার ঠিক ওপারেই একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে না। কারণ তার গোটা মুখটা চুল দিয়ে ঢাকা। সেই সুরটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে ফিশফিশ করে কী যেন বলে চলেছে মেয়েটা। মন্ত্র পড়ছে কি? ভারী গা ছমছম করে গলাটা শুনলে।

একটু আগেই দীপ্তাংশু বলে ছেলেটা বলছিল, এখানে সিনেমার কী সব কাজও হয়... তাহলে কোনও হরর মুভির এসএফএক্স-এর কাজ হচ্ছে এখন? কিন্তু কম্পিউটারগুলো চলছে না কেন?

কী মনে হতে জানলার কাচে কান রাখলেন ব্যানার্জি। মন্ত্রটা আরও জোরে শোনা যেতে লাগল। ভাষাটা পরিচিত নয়...

হঠাৎ থেমে গেল সব শব্দ। অখণ্ড নৈঃশব্দে ভরে উঠল জানলার কাচ। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন ব্যানার্জি। এক... দুই... তিন...

এক ঝটকায় জানলায় মুখ ফেরাতেই তার বুকের ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল। মেয়েটা আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছে। জানলার ওপারে একদম তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এখনও আগের মতোই চুল দিয়ে ঢাকা মুখটা। এবার তার নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু... একটা খটকা লাগল ব্যানার্জির। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে জানলার

ওপারে, অথচ ঠান্ডা নিঃশ্বাস এসে পড়ছে ব্যানার্জির ঘাড়ের পিছনে। এ কী করে হয়? কী করে...

আতঙ্কিত চোখে ব্যানার্জি খেয়াল করলেন— মেয়েটা জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে নেই। কাঁচের জানলার ওপাশে তার প্রতিচ্ছবিটা পড়েছে। অর্থাৎ সে দাঁড়িয়ে আছে এপারে...

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন ব্যানার্জি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে গেল। দীপ এসে ঢুকল ঘরে। ব্যানার্জি হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে তাকিয়ে দেখলেন জায়গাটা ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে...

— "স্যার..." ব্যানার্জির চিৎকারে একটু অবাক হয়েছে সে। একবার ঢোক গিলে বলল, — "রেকর্ডিংটা এসেছে স্যার। আমার মেইলে।"

— "গ্রেট, চলুন।" সামলে নিতে সময় লাগল ইন্সপেক্টরের। রিসেপশনের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

— "আচ্ছা, মিক্সিং রুম-বি-তে কোনও কাজ হচ্ছে আপনাদের?"

— "না। পুজো দেরি আছে, কাজের চাপ কম। ঘরটা এখন ফাঁকাই থাকে।"

দীপের ল্যাপটপে একটা হেডফোন গুঁজে রেকর্ডিংটা শুনতে লাগলেন ব্যানার্জি। রেকর্ডিং-এর কয়েক জায়গা মিউট হয়েছে। লিফ্টের ভিতরে নেটওয়ার্কের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ফলে কথাগুলোও স্পষ্ট নয় খুব একটা। ব্যানার্জি ভলিউম ফুল করে মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। বিনোদের গলায় উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট।

রেকর্ডিং-এর একটা জায়গায় আটকালেন ব্যানার্জি। দীপ এপার থেকে তৃষার নাম বলতে আচমকাই কথা থামিয়ে দিল বিনোদ। ধরা, আতঙ্কিত গলায় একটা প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

অর্থাৎ লিফটে কেউ ছিল ওর সঙ্গে? নাকি এটাও হ্যালুসিনেশনের অঙ্গ!

আবার প্লে করতে অন্য একটা জিনিস কানে এল ব্যানার্জির। একটা মিষ্টি সুর। বিনোদের ফোন তো এখনও ধরা আছে। তা ও সুর ভেসে আসছে কোথা থেকে? তার থেকেও বড়ো কথা—সুরটা ব্যানার্জির চেনা।

একটু আগেই মিক্সিং রুম-বি থেকে এই সুরটাই ভেসে আসছিল...

(তিন)

রিককে ঘুম পাড়িয়ে ক্রিবটাকে একবার দুলিয়ে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় ফিরে এল বিকাশ। ক্রিবের পাশেই রাখা দু-ইঞ্চি স্পিকারে রিমির গলায় রেকর্ড করা একটা লালাবাই চালিয়ে দিয়েছে। মায়ের গলা পেয়েই মনে হয় একটু শান্ত হয়েছে রিক। রাত হতে মা-কে দেখতে না পেয়ে পাড়া মাথায় করেছিল ছেলেটা। আপাতত ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় ফিরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে বিকাশ। আজ সারাদিন একটা বড় অডিয়ো প্রোজেক্টের রেকর্ডিং ছিল। টানা আট ঘণ্টা স্পিকারের অত্যাচার চলেছে কানের কাছে। কোনও যান্ত্রিক শব্দই আর এখন সহ্য হচ্ছে না। ফোনটাও সাইলেন্ট করা। কেবল লালাবাইটা কানে আসছে। ভারী মিষ্টি করে গান গাইতে পারে রিমি। শুনতে এতটুকু বিরক্ত লাগছে না।

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল সে। ওদের ফ্ল্যাটটা এগারোতলায়, ফলে আশপাশের ঘরবাড়ি প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। একটা অতিরিক্ত বেড়ে-ওঠা নারকেল গাছ রাতের হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে কিছু দূরে। তা ছাড়া জানলার গোটাটা জুড়েই কালচে লাল আকাশ।

নারকেল গাছটার মাথা দোলানো দেখতে দেখতে ঘুম পায় বিকাশের। এসি চলছে। চাদরটা গায়ের উপরে টেনে নেয়ে। বিকাশের শরীরটা লম্বা, ফলে পায়ের খানিকটা বেরিয়ে থাকে বিছানার বাইরে। সেখানে চাদর পৌঁছোয়নি।

ঘুমিয়েই পড়েছিল বিকাশ। হঠাৎ মনে হল, নরম ছোঁয়া লাগল ওর পায়ের বেরিয়ে-থাকা অংশে। মনের ভুল নয়, বিকাশ নিশ্চিত। কিন্তু কে স্পর্শ করবে ওকে? বাড়িতে তো রিক ছাড়া কেউ নেই...

মনের ভুল? নাকি কেউ ঢুকল ঘরে?

— "কে?" কেউ নেই বলেই ঘুম-জড়ানো গলায় প্রশ্নটা করল বিকাশ। কোনও উত্তর এল না।

সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা দেখল একবার। নাঃ, টাইট করে বন্ধ করা আছে সেটা। আবার বিছানায় ফিরে যাচ্ছিল, ক্রিবের

মধ্যে চোখ বাড়াল একবার। ছেলেটা ঘুমোনোর সময় মুখ দিয়ে শব্দ করে। এখন এত নিস্তব্ধ লাগছে কেন?

এতক্ষণে রিমির লালাবাই শেষ হয়ে গেছে। ক্রিবের পাশের ছোটো ফ্ল্যাশ ড্রাইভে পরের ফাইল প্লে করছে স্পিকারটা। কিছু একটা কারণে একটু অবাক হয় বিকাশ। এটা গান নয়, একটা মিষ্টি সুর। একটু আগেই সুরটা শুনছিল, ভারী মিষ্টি আদুরে সুর, সে বন্ধ করল না।

ক্রিবের পাশের নীল নাইটল্যাম্পটা জ্বেলে নিল বিকাশ। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। ঘুমের ঘোরে নিজের গায়ের জামাটা উপরে তুলে মাথা ঢেকে ফেলেছে রিক। আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

— "ওঃ গড!" মনে মনে কথাটা বলে জামাটা নামিয়ে দেয় বিকাশ। বাচ্চাটার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে। দম নিতে নিতে মুখ দিয়ে কিছু শব্দ করে রিক। কী ভেবে বিকাশ খুলে নেয় জামাটা। বাচ্চার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে ফিরে আসতে যাচ্ছিল বিছানায়। এমন সময় একটা জিনিস চোখে পড়তে সে থমকে যায়। ক্রিবের গদির উপর হাত দুটো দিয়ে বারবার আঁচড় কাটছে রিক। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে, একটানা। ওইটুকু বাচ্চার আঁচড়েও গর্ত হয়ে গেছে তোশকে।

দ্রুত পকেট থেকে ফোন বার করে করে রিমির নম্বরটা ডায়াল করে বিকাশ। কয়েকবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে গলা শোনা যায়,

— "বাঃ একদম ঠিক সময়ে ফোন করেছ। যেই ঘুমিয়েছিলাম অমনি..."

— "আসলে মনে পড়ছিল খুব তোমার কথা। কাল ভোরে ফিরছ তো?"

— "হ্যাঁ, আর সেইজন্যেই এখন ঘুমোতে হবে..."

— "আচ্ছা, শোনো-না।"

— "কী?"

বিকাশ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলে, "বলছি রিক বারবার দু-হাতে তোশক আঁচড়াচ্ছে। কখন এরকম করে বলোতো? খিদে পেয়েছে?"

এবার রাগত গলায় উত্তর দেয় রিমি, "তুমি আবার ওকে ভয় দেখিয়েছ!"

— "ভয়! মানে আমি..."

— "অপদার্থ কোথাকার! মনে নেই? সেই একবার ভয়ঙ্কর একটা মুখোশ পরে ওর সামনে গিয়ে জোকারপনা করেছিলে, তারপরেই ওরকম করেছিল। আবার যদি আমার ছেলেকে ভয় দেখিয়েছ তাহলে কাল ভয় কাকে বলে, আমি বোঝাব তোমাকে।"

— "ধুর, আমি ভয় দেখাব কেন! নিজে মরছি নিজের জ্বালায়..."

— "চুপ করো, তোমাকে চেনা আছে আমার..."

আর দু-চারটে বকাঝকা শুনিয়ে ফোন রেখে দেয় রিমি। বিকাশ ক্রিবের কাছে ফিরে এসে দ্যাখে আঁচড়ানো থামিয়ে দিয়েছে রিক। উলটে এখন অস্পষ্ট শব্দ করে হাসছে। কোনও কারণে ভারী খুশি হয়েছে।

— "কী রে? এত আনন্দের কী হয়েছে তোর?" ছেলের পেটে একটা আঙুল রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে বিকাশ। আনমনে হাসতে হাসতে একটা হাত ডান পাশে ছড়িয়ে দেয় রিক। হাতের তর্জনীটা সোজা হয়ে উঠে আছে। যেন কিছু দেখাতে চাইছে সে। বাচ্চারা অবশ্য এমন করেই থাকে। কী মনে হতে সেটা লক্ষ করে ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকায় বিকাশ। রিক জানলার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। একটা আট মাসের বাচ্চা জানলা দেখাবে কেন? নাঃ, এমনিই তুলেছে আঙুলটা।

বিকাশ ফিরে আসতে যাচ্ছিল বিছানার কাছে। এমন সময় একটা ব্যাপার খেয়াল করে। রিমির গলায় গান আবার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এবার আর স্পিকার থেকে নয়। গানটা ভেসে আসছে ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে থেকে। রিকের হাসির শব্দ বেড়ে ওঠে সেই সঙ্গে।

শ্বাস বন্ধ করে জানলার দিকে তাকায় বিকাশ। কাচের জানলার নীচ থেকে একটু একটু করে উপরে উঠে আসছে একটা মানুষের মাথা। চুল, চোখ, মুখ। এই মুখ বিকাশ চেনে— রিমি! কিন্তু এগারোতলার জানলায়...

বিকাশের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে গেয়ে চলেছে রিমি। মুখে মৃদু হাসি। ডান হাতটা উপরে তুলে হাতছানি দিল। জানলাটা খুলতে ইশারা করল।

বিকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গিয়ে খুলল জানলাটা।

— "তু... তুমি এখানে... আর এভাবে..."

— "তুমি তো বললে, দেখতে ইচ্ছা করছে আমাকে... বলোনি?"

— "হ্যাঁ... কিন্তু?" বিকাশের মনে হল, এবার ও জ্ঞান হারাবে। মাথার ভিতরেও একটা চাপা যন্ত্রণা সবকিছু গুলিয়ে দিচ্ছে বারবার।

— "বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব! ভিতরে আসতে বলবে না?"

জানলা থেকে সরে দাঁড়ায় বিকাশ। রিমি দু-হাতে জানলা ধরে ভিতরে ঢুকে আসে।

— "আমার খুব খিদে পেয়েছে, জানো..." কথাটা বলতে বলতে এগিয়ে যায় রিকের দিকে। রিকের হাসিটা এখন অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। একটা বাচ্চা এভাবে হাসতে পারে না।

— "আমারও খুব মনে পড়ছিল তোমার কথা, ভীষণ ভীষণ ভীষণ..."

আচমকা এক ঝটকায় বিকাশের সামনে চলে আসে রিমি, "এই তোমার মনে আছে? বিয়ের ঠিক পরপর আমরা মিউজিক চালিয়ে সালসা নাচতাম, এই ঘরেই তো?"

— "হ্যাঁ... মানে..."

— "লেট'স ডান্স..."

স্পিকারে এখন স্যাক্সোফোন বাজতে শুরু করেছে। কিন্তু তার সুরটা সেই আগের মিষ্টি সুরের মতো। এবার শুধু তার সঙ্গে মিশেছে একটা বাচ্চা ছেলের হাসি... রিকের হাসি...

বিকাশের কোমরে দুটো হাত রাখে রিমি। কিশোরী মেয়ের মতো উচ্ছল দেখায় তাকে। খলখলিয়ে হেসে ওঠে সে।

বিকাশের মনে হয়, তার কোমরে হাতের চাপ বাড়ছে। হাত নয়, যেন দুটো ধারালো ছুরির ফলা বসে যাচ্ছে কোমরে। তার শরীরটাকে ভাগ করে ফেলছে দু-ভাগে।

— "রিমি... তুমি..." মুখ তুলে রিমির চোখে তাকায় বিকাশ... রিমি আর নেই সেখানে। সে অন্য কিছুতে বদলে যাচ্ছে...

(চার)

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলেন নিরলস ব্যানার্জি। দরজার ওপাশে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে তিনি আগেও দেখেছেন। কিন্তু তার মুখ-চোখের অবস্থা যে এরকম হতে পারে তা তিনি আগে কল্পনা করেননি। ছেলেটার চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। সেই কোটরে রাতজাগা কালির ছাপ। মুখে না-কাটা গোঁফ-দাড়ির জঞ্জাল। জামার কলারটা কাঁধের দিকে ঢুকে আছে। বোঝা যায়, এই ক-দিনে কিছু একটা ভাবনা তাকে পাগল করে তুলেছে।

— "এ কী! আপনি এখানে?"

মুখ তুলে অস্পষ্ট গলায় দীপ বলে, "আ... আপনার ফোন নম্বরটা নেওয়া হয়নি, না হলে আগে ফোন করে আসতাম। আমার একটা স্বীকারোক্তি দেওয়ার আছে..."

— "ভিতরে আসুন। তারপর কথা বলছি।" দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন ব্যানার্জি। দীপ ভিতরে আসতে দরজাটা বন্ধ করে তাকে বসার ঘরে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। ধোয়া মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে দীপের সামনের চেয়ারে এসে বসে বললেন, "বলুন, কী বলার আছে..."

মুখ নামিয়ে নেয় দীপ। গলকণ্ঠটা একবার ওঠানামা করে। কপালে নুয়ে-পড়া উশকো খুশকো চুলগুলো চেপে ধরে বলে, "স্যার, বিনোদ আর বিকাশের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী..."

— "আপনার বক্তব্য রেকর্ড করতে পারি?"

দীপের ক্লান্ত মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে, "পারেন। কিন্তু সেই রেকর্ড কারও হাতে গেলে আমি জেলে যাব কি না জানি না, তবে অ্যাসাইলামের টিকিট নিশ্চিত।"

নিজের স্মার্টফোনে রেকর্ডিং বাটন অন করে টেবিলে রাখেন ব্যানার্জি, তারপর মুখ তুলে বলেন, "হোয়াটএভার। বলুন এবার।"

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলতে থাকে দীপ, "ছোটো থেকেই দেখেছি আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিউজিকের একটা বড়ো যোগাযোগ রয়েছে।

আমার দাদুর বাবা ছিলেন ভারতবিখ্যাত মিউজিশিয়ান। নাম বললে চিনতেও পারেন। শুধু তা-ই নয়, মিউজিকের খোঁজে দেশ-দেশান্তরে ঘুরেও বেড়াতেন। সংগ্রহ করে আনা শিট-মিউজিক একটা হলদে ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রায় দেড়শোরকম বাজনার কালেকশান ছিল তাঁর। কোন্ মিউজিকে কোন্ ইন্সট্রুমেন্টে বাজাতে হবে, সেটাও লেখা থাকত ডায়েরিতে।

যাই হোক, তাঁর মৃত্যুর পর আমার দাদুর কাছে আসে সেই ডায়েরি আর ইন্সট্রুমেন্টস। সেখান থেকে ইভেঞ্চুয়ালি আমার বাবার কাছে। বাবারও মিউজিকে আগ্রহ ছিল না তা নয়, কিন্তু অল্প বয়সে কাগজের ব্যাবসায় নেমে বিরাট টাকা লস খান তিনি। মার্কেটে ভয়ানক ধারবাকি পড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি দাদুর ইন্সট্রুমেন্টের কালেকশন থেকে কিছু ইন্সট্রুমেন্ট বেচে দেন।

আমার যখন পনেরো বছর বয়স তখন সেই ডায়েরিটা বাবার থেকে আমার হাতে আসে। বাবা ডায়েরিটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ দীপু, এ ডায়েরিটা আমাদের বংশের সম্পদ। পৃথিবীর প্রায় একশোটা দেশের এমন সব অজানা সুর এতে লেখা আছে, যা আজ পৃথিবী থেকেই হারিয়ে গেছে। এইসব সুর বাজাতে পারলে তোর ভিতরের সমস্ত সংকীর্ণতা, হিংসা, ঘৃণা মুছে যাবে। শুধু ডায়েরির একেবারে শেষ পাতায় একটা সুর লেখা আছে। ওইটা কোনওদিন বাজাতে যাস না। সর্বনাশ হবে...'

— "আপনি তো জানেন স্যার, যেটা বারণ করা হয়, সেটার প্রতিই আমাদের আগ্রহ জন্মায় বেশি। শেষ পাতার সুরটাই ডায়েরি খুলে প্রথম দেখি আমি। সে ভারী অদ্ভুত সুর, জানেন? আমরা পড়েছিলাম, ডায়াটোনিক স্কেলে একটা অক্টেভের মধ্যে একটাই ট্রাইটোন থাকতে পারে, অঙ্কের মতো মিউজিকের ক্ষেত্রে এ নিয়মটার নড়চড় হবার জো নেই। কিন্তু এই মিউজিকে এক অক্টেভে পাঁচটা থেকে ছ-টা ট্রাইটোন আছে। মানে সুরটা প্রকৃতির নিয়মের বাইরে। অশুভ।

তবে বাবা আমাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিয়ে সতর্ক করেননি, তার একটা কারণ হল এই যে, মিউজিকটা বাজাতে হবে ডুডুক দিয়ে। ডুডুক হল একটা

সুর
প্রাচীন আমেনিয়ান ইন্সট্রুমেন্ট। খানিকটা বাঁশির মতো। আমাদের কালেকশনে
ছিল, কিন্তু বাবা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ফলে আমার আগ্রহ থাকলেও
বাজাতে পারিনি।"

— "ডায়েরিটা আছে আপনার কাছে?" একমনে শুনছিলেন ইন্সপেক্টর।
এবার প্রশ্ন করেন তিনি।

— "এখন নেই, বাড়িতে আছে।"

— "আচ্ছা বেশ, সেটা নিয়ে আসবেন একটু। এখন বলতে থাকুন।"

জামার হাতায় কপালের ঘাম মোছে দীপ, "হ্যাঁ... এবার এখনের ঘটনায়
আসছি। আমি মেইনলি মিউজিক তৈরি করি ভিএস-টিতে... ভিএস-টি
মানে..."

— "জানি। বলতে থাকুন।"

— "কিছুদিন আগে ইন্টারনেট থেকে আমি একটা প্লাগ-ইন পারচেজ করি।
তাতে ডুডুক ছিল। অর্থাৎ সেটা ব্যবহার করে 'ডুডুক' যন্ত্রটা ছাড়াও আমি
ডুডুকের সুর তৈরি করতে পারব।"

— "আপনি সেটা দিয়ে ওই শিট-মিউজিক থেকে সুরটা তৈরি করেন।
তা-ই তো?"

উপরে-নীচে মাথা দোলায় দীপ। চোয়াল ঝুলে পড়ে তার।

— "সেদিন আপনার ফোনের রেকর্ডিং-এ লিফ্‌টে যে সুরটা বাজছিল..."

— "হ্যাঁ স্যার... ওটাই... ওই মিউজিকটা ভালো নয়, স্যার। যেভাবে
খুনগুলো হচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় মিউজিকটা বাজিয়ে অশুভ কিছুকে
জাগিয়ে তুলেছি আমি..."

— "হুম..." অন্য সময় হলে দীপকে কোনও সাইকিয়াটিস্ট রেকমেন্ড
করতেন নিরলস ব্যানার্জি। কিন্তু সেদিনের সেই চুলে-ঢাকা মুখটার কথা মনে
পড়ে গেল তাঁর। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "জাগিয়ে তুলেছেন বলতে
ডিমন জাতীয় কিছুর কথা বলছেন কি?"

— "হতে পারে। আমি জানি না, স্যার।"

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন ব্যানার্জি, তারপর বড়ো একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "এমন অলৌকিক খুন আমিও আগে দেখিনি দীপ্তাংশুবাবু। জীবনে ঢের ঢের কেস দেখেছি..." মাঝখানে কথা থামিয়ে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করেন তিনি, "আচ্ছা, ওই ডায়েরিটাতে মিউজিকটা কোথাকার বা কে তৈরি করেছে, সেই নিয়ে কিছু লেখা নেই?"

দীপ মাথা নাড়ায়, "না। মিউজিক আর ইন্সট্রুমেন্টের নাম ছাড়া অন্য কিছু নেই। তবে বিকাশ সুরটা দেখতে চেয়েছিল একবার। আমি ছবি তুলে পাঠিয়েছিলাম। সেটা ল্যাপটপে রয়ে গেছে।"

— "কই দেখি..."

পিঠের ব্যাগ থেকে নিজের ল্যাপটপটা বের করে আনে দীপ। তারপর সেটা অন করে একটা বিশেষ ছবি বের করে এগিয়ে দেয়। ডায়েরির একটা হলদে হয়ে যাওয়া পাতার ছবি। তার উপরে লাইন টেনে টেনে শিট মিউজিকের সিম্বল আঁকা আছে। এর মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন না ব্যানার্জি। কেবল একটা ব্যাপারে চোখ আটকায়। পাতার একেবারে উপরের প্রান্তে একটা মাঝারি সাইজের '#' চিহ্ন আঁকা আছে।

— "এটা কী বলুন তো?" ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করেন।

দীপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "শার্প সিম্বল। মিউজিকে ওটা দিয়ে হায়ার পিচ বোঝানো হয়। ওই একই চিহ্নকে অঙ্কের ভাষায় হ্যাশ বলে। আমরা ফেসবুকেও খানিকটা মিউজিকের নিয়মেই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করি। অন্য কথাগুলোর চেয়ে হ্যাশ চিহ্নের গায়ে লেগে-থাকা কথাগুলোর ভ্যালু হায়ার।"

— "হ্যাশট্যাগ!" ভুরু কোঁচকায় ব্যানার্জির, "সে তো ফেসবুকে ব্যবহার হয়। এখানে হয়েছে কেন?"

— "এখানে ওটা হায়ার পিচ বোঝাচ্ছে।"

— "উঁহুঁ..." মাথা নাড়েন ব্যানার্জি, "শিট-মিউজিক লেখা আছে পাতার মাঝামাঝি। তাহলে চিহ্নটা পাতার একেবারে উপরের দিকে এমন আলাদা করে লেখা কেন?"

দীপ একটু ধন্দে পড়ে, "তাহলে হয়তো মিউজিকটা লেখার আগে চিহ্নটা আঁকা প্র্যাকটিস করছিলেন আমার পিতামহ।"

সুর

খুব ধীর পায়ে ঘরের ফাঁকা অংশে পায়চারি করতে থাকেন ব্যানার্জি, "একটা লোক যে একটা ডায়েরি ভরতি শিটমিউজিক লিখেছে, তাকে একেবারে শেষ পাতায় পৌঁছে একটা সাধারণ চিহ্ন আঁকা প্র্যাকটিস করতে হল! না দীপবাবু। ওই চিহ্নটার একটা মানে আছে... কিন্তু..."

— "কিন্তু কী স্যার?"

পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়েন ব্যানার্জি, "আচ্ছা দীপবাবু। কবিতা যে পাতায় লেখা হয়, তার একেবারে উপরে কী লেখা থাকে?"

— "কবিতার নাম আর কবির নাম।"

— "সে তো এখন, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে যখন কবিরা রাজা-রাজড়ার সভায় ভাড়া খাটতেন তখন তাঁদের নাম লেখা হত কবিতার মধ্যে। কহেন কবি কালিদাস, পথে যেতে যেতে/ নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?"

— "তাহলে উপরে কী লেখা থাকত?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে দীপ।

— "যে রাজার উদ্দেশ্যে কবিতাটা উৎসর্গ করা হয়েছে, তাঁর নাম..."

— "রাজা! মানে এখানে..."

— "ডিমন।"

প্রায় ছিটকে সোফা থেকে সরে আসে দীপ, "স্যার! আমার খেয়ালই ছিল না। এই হ্যাশ চিহ্নটা এসেছে একটা পৌরাণিক ডিমনের থেকে। গ্রিকরা ওই ডিমনকে বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করত। বিলেথ! কথিত আছে, বিলেথ যেখানে যায়, সেখানেই বিশেষ কোনও সুর বাজতে থাকে। নোয়ার এক সন্তান হ্যাম প্রথম পৃথিবীতে নিয়ে আসে তাকে। পরে বিলেথের সাহায্য নিয়েই গণিতের উপর প্রথম বই লেখেন তিনি... অর্থাৎ..."

মুখে কিছু একটা বিড়বিড় করে চলেছেন ব্যানার্জি। স্থির চোখে স্ক্রিনের উপরের হ্যাশ চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে আছেন, দীপ কান পেতে তাঁর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করে, "দুটো মানুষ খুন হয়েছে। একজনকে লম্বালম্বি কাটা হয়েছে। অন্যজনকে আড়াআড়ি। হ্যাশ..."

— "না স্যার..." দীপ মাথা নেড়ে বলে, "সেটা তো যোগ চিহ্ন হচ্ছে।

হ্যাশ মানে তো...”

একটা কাগজ টেনে তার উপরে একটা যোগ চিহ্ন আঁকেন ব্যানার্জি। তারপর সেই চিহ্নটার ডানদিকের উপরের কোণে আর-একটা যোগ চিহ্ন। কাগজ জুড়ে একটা অতিকায় হ্যাশ ফুটে ওঠে।

— “মানে একইভাবে আরও দুটো খুন হতে চলেছে...”

(পাঁচ)

— “কী রে রেডি তো?”

হেডফোন থেকে ভেসে-আসা শব্দে মাইক্রোফোনের কাছে মুখ এনে তৃষা বলে, “আছি, তুমি কিউটা দাও।”

— “হ্যাঁ, দিচ্ছি। একবার শুনে নে আগে।” জয়ন্তর গলা মুছে গিয়ে হেডফোন থেকে প্রিরেকর্ডেড ভয়েজ ভেসে আসে, “আপনাদের সবার অনুরোধে এবার পুজোয় আসতে চলেছে...”

নিজের সামনে রাখা কাগজটায় তাকায় তৃষা, “সঞ্চারী মিত্রর নতুন গানের অ্যালবাম...”

আগের ভয়েসটুকুনি বিনোদের। গোটাটাই তার বলার কথা ছিল। বাড়ি যাওয়ার তাড়া থাকায় বাকিটা পরের দিন এসে করে দেবে বলে গিয়েছিল। সেদিনই লিফ্‌টে নৃশংসভাবে খুন হয় সে।

হেডফোনে তার গলাটা শুনে একটা অস্বস্তি শুরু হয় তৃষার। সেটা কাটানোর চেষ্টা করে। গলায় মধ্যে খুশি-খুশি ভাবটা ফিরিয়ে এনে রিহার্স করে নেয়, “সঞ্চারী মিত্রর নতুন গানের অ্যালবাম...”

— “ঠিক আছে... আবার দাও কিউটা। ফাইনাল।”

— “ওকে...” জয়ন্তর গলা শোনা যায় হেডফোনে, “লেভেলটা ম্যাচ করাতে হবে, ঠিক যেন পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস... ওকে, গো...”

কান পেতে রেডি হয়ে থাকে তৃষা। বিনোদের ভয়েস শেষ হলেই বলতে

সুর

হবে তাঁকে, — "আপনাদের সবার অনুরোধে এবার পুজোয় আসতে চলেছে..."

— "সঞ্চারী মিত্রর..." তৃষা থেমে যায়। হেডফোন থেকে ভেসে-আসা একটা গলা কানে এসেছে ওর। ওর নাম ধরে ডেকে উঠেছে কেউ। গলাটা বিনোদের।

— "আরে, থেমে গেলি কেন?" জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলে।

— "না মানে..." ইতস্তত করে তৃষা, "বিনোদদার রেকর্ডিংটা ওখানেই শেষ না আর কিছু বলা আছে?"

— "কই না তো।"

— "ঠিক আছে... আর-একবার দাও।"

— "রেডি... গো..."

কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত কাটে। তৃষা অপেক্ষা করতে থাকে। একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তৃষার বুকের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নামতে লাগল। বিনোদ কাঁদছে, খুব চাপা-স্বরে কিছু কথাও বলছে যেন সে। চোখ বন্ধ করে তৃষা দু-হাতে হেডফোন চেপে ধরে, "আমাকে এভাবে মেরে ফেললে তৃষা!"

কান থেকে হেডফোনটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চোখ খোলে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, গোটা ঘরের আলো নিবে গেছে। শুধু অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে আসছে কোনও একটা কোণ থেকে। যেন নিষ্প্রাণ মৃত একটা শরীরের থেকে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। যার শরীর, সে গুনগুনিয়ে একটা সুর ভাঁজছে। ভারী মিষ্টি একটা সুর।

শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে যায় তৃষা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে মনে হয়, একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে পিছন ফিরে। মানুষটাকে ও আগেও দেখেছে। গুনগুন সুরটা সে-ই ভাঁজছে।

— "বিনোদদা..." এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত রাখে তৃষা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। লোকটা ওর দিকে পিছন ফেরে। সত্যি বিনোদ দাঁড়িয়ে আছে। স্বাভাবিক গলায় বিনোদ বলে, "দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। চলুন,

বাকি রেকর্ডিংটা সেরে নিই...”

— “কিন্তু তুমি তো...” তৃষা অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে।

— “আমি তো কী? আরে, কালকের মধ্যে প্রোজেক্টটা নামাতে না পারলে...”

তৃষা লক্ষ করে বিনোদের কপাল থেকে গলা অবধি একটা লম্বা চেরা দাগ। থুতনির নীচে সেই দাগ থেকে বেরিয়ে-আসা একফোঁটা রক্ত জমে আছে।

— “বিনোদদা, তোমার তো রক্ত বেরোচ্ছে...”

— “রক্ত!” হাত দিয়ে রক্তটা মুছে নিয়ে বিনোদ হো হো করে হেসে বলে, “কী করব বল, এমন করে কেটেছিস আমার শরীরটাকে...”

— “আমি! এসব কী বলছ তুমি?”

— “হ্যাঁ। তুই, মনে নেই? না?” একটু কি রাগের ছোঁয়া বিনোদের গলায়?

তৃষার অস্থির চোখ কিছু একটা খুঁজতে থাকে বিনোদের মুখে। আবার ঘরের আলো নিবে আসে। কেবল বিনোদের শরীরটাকে একটা সাদা স্পটলাইট ঘিরে থাকে যেন।

বিনোদের পরের কথাগুলো পাথরের পাঁজর থেকে উঠে আসে, ঠান্ডা একটা বাতাস ঘিরে ধরে তৃষাকে।

— “তোর জন্যই সব শেষ হয়ে গেল আমার। আমার শরীরটাকে কেটে দু-ভাগ করে ফেললি তুই... তৃষা...”

বিনোদের সাদা শার্টের পেটের কাছটা রক্তে লাল হয়ে যায়। তারপর বুক, তারপর গলা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে বিনোদ। তৃষা দু-হাতে মুখ ঢেকে ফ্যালে।

— “আপনাদের সবার অনুরোধে এবার পুজোয় আসতে চলেছে...”

— “আপনাদের সবার অনুরোধে এবার পুজোয় আসতে চলেছে...”

বারবার বেজে চলেছে ভয়েসটা। তৃষা হাঁপাতে হাঁপাতে চারপাশে তাকায়। স্টুডিয়োর রেকর্ডিং রুম! স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে ও। হেডফোনে আবার জয়ন্তর গলা শোনা যায়, — “তুই ছেড়ে দে আজ। কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে তোর...”

পাশের ছোটো টুল থেকে বোতল নিয়ে একঢোঁক জল গলায় ঢালে তৃষা।

নিঃশ্বাসের গতি কম হয়ে আসে তার। দু-হাতে মুখের উপর নেমে-আসা চুল সরিয়ে ফ্যালে।

— "মাইকটা অফলাইন করে দাও জয়ন্তদা, আমি ও ঘরে যাচ্ছি।" মুখ মুছতে মুছতে বলে তৃষা।

— "হ্যাঁ, দিচ্ছি।"

তৃষা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল করে, একটু আগে "হ্যাঁ, দিচ্ছি" কথাটা জয়ন্তর নয়, বিনোদের গলা থেকে এসেছে।

এগিয়ে এসে দুটো রুমের মাঝের জানলায় চোখ রাখে তৃষা। একটা আতঙ্কের ঢেউ তার শরীরটাকে ছিটকে দেয় জানলা থেকে।

মিক্সার মেশিনের সামনের গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছে জয়ন্ত। তার শরীরটা কোমর থেকে দু-আধখানা করে কাটা। মেঝেতে যত দূর রক্ত গড়িয়েছে, তাতে বোঝা যায়, অন্তত মিনিট দশেক আগে তাকে খুন করে গিয়েছে কেউ।

(ছয়)

— "এই মুহূর্তে কে কে আছে আপনাদের স্টুডিয়োতে?"

একটু ভাবতে হয় দীপকে, "জানি না। এখন নতুন কোনও প্রোজেক্ট হাতে নিচ্ছি না আমরা। তবে আগের কয়েকটা পেন্ডিং পড়ে আছে, ওগুলো..."

— "ওগুলো কী?"

— "জয়ন্ত বলছিল, তৃষাকে দিয়ে ওগুলো কমপ্লিট করিয়ে নেবে।"

— "কখন?"

— "জানি না। ওদের কাছে আলাদা চাবি থাকে। আমার কাছে এই ক-দিন ফোন নেই বলে..."

ব্যানার্জির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, "পরের টার্গেট কে, আমরা জানি না, কিন্তু আপনাদের স্টুডিয়োর কেউ নিরাপদ নয়।" পকেট থেকে

মোবাইল ফোন বের করে জয়ন্তর নম্বরটা ডায়াল করে ব্যানার্জি। ওপাশে বেশ কয়েকবার রিং হয়ে কেটে যায়। তৃষার নম্বর সুইচড অফ।

দীপ মুখ তুলে বলে, "স্টুডিয়োতে থাকলে আমরা ফোন সাইলেন্ট করে রাখি। তাই হয়তো..."

ফিরে এসে আবার উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়েন ব্যানার্জি, কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "এই যে ডিমনের নাম বললেন। একে যেমন নিয়ে আসা যায়, তেমনি ফেরত পাঠানোরও তো রাস্তা আছে কিছু।"

— "তেমন কিছু তো..." হঠাৎ থেমে যায় দীপ। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "মনে হয় একটা উপায় আছে স্যার।"

— "কী উপায়?"

— "এই শিটমিউজিকটা যে পাতায় লেখা ছিল, তার ঠিক পিছনেই গ্রিক ভাষায় কিছু লেখা ছিল। চার-পাঁচ লাইনের বেশি নয়। এই দেখুন..."

ল্যাপটপে ছবিটা খুলে দেখায় দীপ। খুব ভালো করে তাকালে বোঝা যায় পিছনের পাতায় কালি দিয়ে লেখা কিছু অক্ষরের ছাপ এই পাতার স্পষ্ট অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে উঠেছে।

— "এই পাতাটা আমাদের লাগবে। কুইক... আপনার বাড়িতে কাউকে বললে ছবি পাঠিয়ে দিতে পারবে না?"

— "বাড়িতে আমি একা থাকি স্যার। একটু পোষা কুকুর আছে শুধু।"

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ব্যানার্জি, এমন সময় তাঁর ফোনটা বেজে উঠল, "তৃষা গাঙ্গুলি..." বিড়বিড় করে বললেন ইন্সপেক্টর। তারপর রিসিভ করে কানে লাগালেন ফোনটা। ওপাশ থেকে একটা কান্না-মেশানো গলা শোনা গেল, "স্যার... আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন, এখানে চলে আসুন... স্যার..."

— "আপনি শান্ত হোন। বলুন, কী হয়েছে।"

— "জয়ন্ত... জয়ন্ত ইজ ডেড। কেউ খুন করেছে ওকে।"

— "আপনি স্টুডিয়োতে?"

চাপা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে ওপাশ থেকে। আর কিছু শোনা যায় না, ব্যানার্জি চিৎকার করে বলেন, "আপনি স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে

সুর

লোকজনের মাঝে কোথাও দাঁড়ান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি...”

ফোনটা ওপাশ থেকে কেটে যায়। ব্যানার্জি দ্রুতপায়ে বেডরুমের দিকে এগোতে এগোতে বলেন, “মিস গাঙ্গুলিকে বাঁচানো দরকার। আগে আপনার স্টুডিয়ো, তারপর বাড়ি।”

মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়িতে স্টার্ট দেন ব্যানার্জি। দীপ উঠে বসে তার পাশের সিটে। এতক্ষণে সন্ধে নামতে শুরু করেছে ব্যস্ত কলকাতার বুকে। জনবহুল রাস্তার বুক চিরে দৌড়োতে থাকে গাড়িটা।

স্টুডিয়ো বিল্ডিং-এর সামনে পৌঁছেই তৃষাকে দেখতে পায় ওরা। রাস্তার একধারে একটা আলোকোজ্জ্বল শপিং মলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। গাড়িটাকে থামতে দেখে একবার ভিতরে তাকিয়ে দীপকে দেখে ছুটে গাড়িটার কাছে চলে আসে সে। তার চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। গালের উপরে কান্নার দাগ। কাজল লেপটে আছে। বুকটা এখনও উত্তেজনায় ওঠানামা করছে বারবার।

— “গেট ইন...” দীপ গাড়ি থেকে নেমে তাকে পিছনের সিটে বসিয়ে দেয়। তার মুখে কোনও কথা ফুটছে না। শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার।

— “জয়ন্ত...” কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল দীপ। ব্যানার্জি হাত দেখিয়ে থামিয়ে দেন তাকে, “উনি উত্তর দেওয়ার অবস্থায় নেই, দীপবাবু। আমি থানায় ফোন করে দিয়েছি। ওরা জিপ নিয়ে আসছে।”

— “আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার, ওরা ভাববে...”

— “না, ভাববে না। একটা গোটা মানুষকে দু-আধখানা করে ফেলার শক্তি মিস গাঙ্গুলির গায়ে নেই। সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স কিছুই মিলবে না। বাট শি নিডস টু কাম আপ উইথ আ স্টোরি...”

গুগল ম্যাপে দীপের বাড়ির লোকেশন দেখে ড্রাইভ করতে থাকেন ব্যানার্জি। দীপ রিয়ার ভিউ মিররে দ্যাখে, বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে তৃষা। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসে তার। এই সব কিছুর জন্যে সে একা দায়ী। ওই সুরটা না বাজালেই...

দীপের ফ্ল্যাটের সামনে এসে গাড়িটা যখন দাঁড়ায় তখন ঘড়িতে সন্ধে সাড়ে সাতটা। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় দু-জনে। দীপ পিছনের সিটটা দেখিয়ে বলে, "ওকে এখানে রেখে যাবেন?"

— "না। আমাদের কারও একা থাকা উচিত হবে না। আমি ক্যারি করছি ওকে।"

দু'হাতে তৃষার অচৈতন্য দেহটা তুলে কাঁধে ফেলেন ব্যানার্জি। দীপ ভিতরে ঢুকে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যায়, "আমার ফ্ল্যাটটা ফোর্থ ফ্লোর।"

পাঁচতলায় উঠে প্যাসেজ বেয়ে প্রায় দৌড়ে আসে দু-জনে। দীপ চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফ্যালে। একটা মিশকালো দেহ ভিতরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপরে।

একটা জার্মান শেফার্ড। সারাদিন ঘরে বন্ধ থাকে কুকুরটা। দরজার কাছেই বসে মনিবের জন্য অপেক্ষা করে হয়তো। দীপ মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শান্ত হয় সে। ল্যাজ নাড়াতে থাকে খুশি হয়ে। ব্যানার্জি সোফার উপরে শুইয়ে দেন তৃষাকে।

— "কোথায় আছে ডায়েরিটা?"

— "ভিতরের ঘরে। আসুন আমার সঙ্গে।"

ডাইনিং রুম পেরিয়ে ছুটে যায় ওরা। কুকুরটাও দীপের পিছন পিছন আসে। ছোটো একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে আসে দীপ। এ ঘর ভরতি শুধু বই। তিনদিকের দেওয়ালে থরে থরে সাজানো বই। তার কয়েকটা খসে এসে পড়েছে মেঝেতে। একদিকের মেঝেতে শোয়ানো আছে একটা গিটার, একটা ভায়োলিন, তার পাশেই কয়েকটা পুরোনো খাতা। বিছানার উপর একটা গীতবিতান খুলে রাখা আছে।

— "ডায়েরিটা..." ঘরের বইয়ের পাহাড় আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে দীপ।

— "আপনার মনে নেই কোথায় রেখেছেন?"

দীপকে অস্থির দেখায়, "এত বই আসলে আমার।" শেলফ থেকে একটা বই টেনে নেয় দীপ। সেটা ব্যানার্জির সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে, "এই বইটা

সুর নিয়ে পড়া আমার প্রথম বই, জানেন? দশ বছর বয়সে পড়েছিলাম মিউজিক নিয়ে পড়া আমার প্রথম বই, জানেন? দশ বছর বয়সে পড়েছিলাম প্রথম। তখনই মিউজিকের প্রতি এমন একটা ভালোবাসা জন্মেছিল...”

— “আপনি...”

— “এ ঘরে যত বই দেখছেন, সব বই শুধু সুর নিয়ে, আমার সব মুখস্থ ওই গিটারটা... ওটা বাজাতে গিয়ে কতবার হাত কেটে গেছে...”

— “আপনি প্লিজ ডায়েরিটা খুঁজুন...”

— “ছোটো থেকে নামকরা মিউজিশিয়ান হওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু হতে পারিনি কিছুতেই। ওই যে একটা এক্স-ফ্যাক্টর লাগে... দীপ্তাংশু মিত্রর ছিল না, তা-ই না স্যার?”

— “হতে পারে। কিন্তু এখন সময় নষ্ট না করে...”

— “না, আছে। এক্স-ফ্যাক্টর আছে।” নিজের মনেই কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় দীপ, “ওঃ, মনে পড়েছে স্যার। ডায়েরিটা এখানে নেই।”

— “এখানে নেই! তাহলে কোথায় আছে?” চিৎকার করে ওঠেন ব্যানার্জি।

— “গঙ্গায়। সাত দিন আগে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।”

— “হোয়াট! এসব কী বলছেন আপনি!”

অদ্ভুত একটা হাসি হেসে ওঠে দীপ। বিছানার উপরে বসে পড়ে। পাশে বসে-থাকা কুকুরটার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, — “বুঝলেন না? আরে, ওই দুটো পাতাই তো আমার এক্স-ফ্যাক্টর। আর নিজের এক্স-ফ্যাক্টার কি অন্য কাউকে দিতে আছে স্যার?”

ব্যানার্জি এগিয়ে যান দীপের দিকে। কিন্তু তার আগেই কুকুরটা রুখে দাঁড়ায়। মুখ দিয়ে হিংস্র গড়গড় শব্দ বেরিয়ে আসে তার।

— “এই... আপনি একটু ঘরের বাইরে যান তো... যান যান...”

কুকুরটা এগোতে থাকে ব্যানার্জির দিকে। ব্যানার্জি পিছিয়ে এসে দরজার বাইরে চলে আসেন। দীপ ঘরের ছিটকিনি তুলে দেয়। তারপর জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, “বাকি কথা এই জানলা দিয়ে বলুন না হয়, এখনও খানিকটা সময় আছে।”

ঘড়ির দিকে তাকায় দীপ। তারপর পিছিয়ে গিয়ে আবার বিছানায় বসে পড়ে, "সময়, মিউজিকের জন্য ভারী ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, টেম্পো বোঝেন তো? জানেন, এক সেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো বার অফ নোটস যাবে, সেটা বুঝতে হয় ভালো করে..."

— "আপনি প্লিজ এসব পাগলামি ছাড়ুন। ভুলে যাবেন না, ওই স্টুডিয়োতে আপনিও কাজ করেন..."

হো হো করে হেসে ওঠে দীপ, "জিন কি কখনও আলাদিনকে খুন করে ব্যানার্জিবাবু?"

ব্যানার্জি জানলার গ্রিল চেপে ধরেন, "মানে আপনি ইচ্ছা করে..."

— "আরে না না, ইচ্ছা করে নয়। বলতে পারেন একরকম তালেগোলে..." বইয়ের শেলফের সামনে পড়ে-থাকা একটা ছোটো তিন-ইঞ্চি ছুরি হাতে তুলে নেয় দীপ। সেটার প্রান্ত বরাবর হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "আগেই বলেছি স্যার মিউজিক নিয়ে আমার বিস্তর পড়াশোনা থাকলেও ওই এক্স-ফ্যাক্টরটি ছিল না। নিষিদ্ধ শিট-মিউজিকটা বাজানোর ইচ্ছা ছোটো থেকে। জানতাম, ওটা বাজালে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। যুক্তিটা খুব সহজ, আপনিও একটু ভাবলেই ধরতে পারতেন। বেলেথকে প্রথম জাগায় হ্যাম। এবং তার সাহায্যেই সে বই লেখে। মানে আলাদিনের উপর জিন সদয় হন। কিন্তু আমার ভয় ছিল অন্য কারও ক্ষতি হতে পারে। তো এই অবস্থায় আমার স্টুডিয়োর এক এমপ্লয়ির উপর আমার বিশ্রী রকমের ভালোবাসা জন্মায়। ওই যাকে আপনি কাঁধে করে নিয়ে এলেন, তার কথাই বলছি। কিন্তু সে আমাকে পাত্তাই দেয় না। উলটে তার দৃষ্টি পড়ে আমারই অফিসের আর-এক এমপ্লয়ি বিনোদের উপরে। আমার একদিন ভারী রাগ হল, জানেন। ভাবলাম, মিউজিকে ঠিক কী হয়, সেটা বিনোদকে দিয়েই পরীক্ষা করে দেখা যাক না হয়। তো মিউজিকটা বানিয়ে বিনোদকে শোনালাম। মানে হোয়াটস্যাপে পাঠালাম আর কী... আমরা মিউজিশিয়ানরা আনপাবলিশড মিউজিক জেনারেলি কাউকে শুনতে দিই না। ফলে বিনোদের কাছ থেকে ওটা অন্য কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।"

সুর

বিনোদ মিউজিকটা শুনে-টুনে অফিস থেকে বের হয়ে গেল। তখনও বুঝতে পারিনি, ঠিক কী হবে। পরে যখন খবরটা পেলাম...”

—“আপনি একটা পিশাচ, স্কাউন্ড্রেল... আই উইল কিল ইউ লাইক আ পিগ...”

ব্যানার্জির কথাটা কানেই গেল না দীপের, সে আগের মতোই বলে চলল, “এই বিনোদকে খুন করার পর থেকে আমার একটা অদ্ভুত নেশা ধরে গেল, জানেন? ভাবুন, ছোটো থেকে আমার মিউজিককে কেউ পাত্তা দেয়নি, আমার ভিতরে এত শিক্ষা, অধ্যবসায়, আমার ডায়েরিতে ইতিহাস পালটে দেওয়ার মতো একটা সুর ধরা আছে অথচ আমি একটা মাঝারি মাপের স্টুডিয়োতে আলফাল গায়কদের জন্যে ট্র্যাক বানাই... আমার ভিতরের শিল্পীটা জেগে উঠল। একটা আস্ত মানুষকে মেরে ফেললাম, অথচ কেউ জানতে পারল না, কেউ সন্দেহ করতে পারল না, কে বলেছে আমার সুরে জাদু নেই? কে বলেছে আমার মধ্যে এক্স-ফ্যাক্টর নেই?

ঠিক করলাম, আরও খুন করব। আরও ছড়িয়ে দেব আমার সুর। জানেনই তো, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, আমার তো হোমে কেউ নেই। অতএব স্টুডিয়ো। বিকাশের হোয়াটস্যাপে পাঠিয়ে দিলাম সুরটা। বললাম নতুন বানিয়েছি, শুনে দেখ...” পরদিন সকালে শুনলাম বিকাশ খতম। আমার নেশা আরও বেড়ে উঠল। ভাবলাম প্রাথমিক টেস্টিং শেষ। এবার জিনিসটা ভাইরাল করা যাক। তার আগে শেষ একবার পরীক্ষা। ইয়েস... জয়ন্ত... ভালো কথা!”

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল দীপ। জার্মান শেফার্ডটা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মনিবের এমন অদ্ভুত আচরণে কিছুটা অবাক হয়েছে সে। সে হাতের ছুরিটা পাশে রেখে দীপ বলল, “আমার ম্যাগনাম ওপাসটা তো শোনানোই হয়নি আপনাকে। সেদিন শুনেছিলেন বটে। কিন্তু পুরোটা শোনেননি। পুরোটা না শুনলে কাজ করে না আমার সুর...” আরে না না, পালানোর চেষ্টা করবেন না। দরজা এখন পাস-কি ছাড়া খুলবে না। আর ওটা শুধু আমি জানি...”

পকেটে হাত চালান ব্যানার্জি। তাড়াহুড়োতে অস্ত্রটা আনতে ভুলে গেছেন,

"আপনি আমাদের খুন করে বাঁচতে পারবেন না। এটা আপনার বাড়ি, আপনি আমাদের এখানে এনেছেন..."

— "আজ্ঞে না, পুলিশ কিচ্ছু ভাববে না। একটা গোটা মানুষকে দু-আধখানা করে ফেলার শক্তি মিস্টার মিত্রর নেই। সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স কিছুই মিলবে না। বাট আই নিড টু কাম আপ উইথ আ স্টোরি..."

একটা রিমোট কনট্রোল জাতীয় যন্ত্র হাতে তুলে নেয় দীপ। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ফ্ল্যাট জুড়ে লুকোনো কোনও স্পিকার থেকে বিশেষ সুর গমগমিয়ে বেজে ওঠে। প্রাচীন আর্মেনিয়ান-বাঁশি ডুডুক বাজছে। ভারী মায়াবী একটা সুর। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করে বেজে চলেছে সেটা।

— "আপনাকে খুন করার ইচ্ছা ছিল না, জানেন। আপনি মানুষটা খারাপ নন। কিন্তু ওই যে সেদিন রেকর্ডিং-এ শুনে ফেলেছিলেন মিউজিকটা। একটু খোঁজাখুঁজি করলেই দেখতেন, মৃতদের সবার হোয়াটস্যাপেই ওই মিউজিক ফাইলটা আমি পাঠিয়েছি। কীভাবে খুনটা হয়েছে সেটা বুঝতে না পারলেও সন্দেহ তো নিশ্চয়ই করতেন... আমার হাতে যখন অস্ত্র আছে, লাইসেন্স আছে, তখন চালাব না কেন বলুন তো?"

— "আর মিস গাঙ্গুলি? তাকে তো তুমি নাকি ভালোবাসতে..."

একটা শয়তানি হাসি খেলে যায় দীপের মুখে, "প্রকৃত শিল্পী কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসে শুধু তার আর্টকে। আর তা ছাড়া..." এগিয়ে আসে দীপ, "ওর মৃত্যু-পরোয়ানাতে তো আপনি সই করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে, ওকে গাড়িতেই রেখে যাব কি না..."

ব্যানার্জি বুঝতে পারেন, পালানোর সব পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। মিষ্টি সুরটা ভয়াবহ কোনও অতিপ্রাকৃত ছন্দে বেজে চলেছে এখন।

শয়তানি হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে দীপের মুখে, "এখনও বলবেন দীপ্তাংশু মিত্রর কোনও এক্স-ফ্যাক্টর নেই? এখনও বলবেন আমি জাত মিউজিশিয়ান নই? হ্যাঁ?"

দীপের হাসির তেজ বাড়তে থাকে। ব্যানার্জির মনে হয়, সেই স্টুডিয়োতে দেখা মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ঠিক পিছনে। তিনি চোখ বন্ধ করে নেন।

সুর

কোমরের কাছে একটা স্পর্শ অনুভব করেন।

এমন সময় সুরটা ছাপিয়ে অন্য একটা শব্দ শোনা যায়। কুকুরের ডাক, খুব চাপা, কুঁইকুঁই স্বরে আওয়াজ করছে কুকুরটা। মনে হচ্ছে যেন কাঁদছে সে। শরীরটাকে মাটির কাছে এনে বারবার আছড়ে ফেলছে নিজের চোয়ালটা। কুকুরটা বুঝতে পেরেছে, যে সুরটা ফ্ল্যাটময় বেজে চলেছে, সেটা অশুভ। সেটা মানুষের ক্ষতি করে। কুকুর মানুষের ভাষা বুঝতে না পারলেও সুরের ভাষা বুঝতে পারে। নিজের মনিবকে এভাবে পালটে যেতে দেখে, অন্যের ক্ষতি করতে দেখেই হয়তো কাঁদছে সে।

– "তোর আবার কী হল রে?" দীপ নীচু হয়ে তার মাথায় হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় একটা কাণ্ড ঘটে যায়। কুকুরটা এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে দীপের টুঁটি কামড়ে ধরে। ব্যাপারটা ঘটবে, দীপ আশা করেনি। সে এক পলকের জন্য থতোমতো খেয়ে যায়। তারপর দু'হাতে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করে প্রাণীটাকে। না পেরে আছড়ে পড়ে বিছানার উপর। এমনভাবে টুঁটিটা কামড়ে ধরেছে যে তার গলা থেকে একটা গোঙানি আর রক্ত ছাড়া কিছুই বেরোচ্ছে না।

দীপ হাত চালিয়ে একটু আগের ছুরিটা খুঁজে পায় কোনওরকমে। মুহূর্তে সেটা চালিয়ে দেয় কুকুরের পেট লক্ষ্য করে। একবার, দু-বার, তিনবার... বারবার চালাতে থাকে ছুরিটা... কুকুরটার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কিন্তু মনিবের টুঁটি সে ছাড়ে না... সে বুঝতে পেরেছে তার মৃত্যু আসন্ন, তবে মরার আগে তার মনিবের ভিতরে বাসা-বাঁধা এই অশুভ শয়তানকে ছিঁড়ে ফেলতে চায় সে।

ব্যানার্জি খেয়াল করেন, তাঁর কোমর থেকে সেই চাপটা এবার ধীরে ধীরে কমে আসছে। মিনিটখানেক পরে সুরটা শেষ হবার আগেই মিলিয়ে আসে। সেই সঙ্গে দীপ আর কুকুরটার রক্তাক্ত নিথর দেহ বিছানা থেকে খসে মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়ে। কুকুরটা কুঁইকুঁই করে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে কয়েকবার। চোখ দুটো রক্তে ভিজে গেছে তার। শরীরময় অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। একটু পরে তার দেহ স্তব্ধ হয়ে যায়...

ব্যানার্জির মনে হয়, তিনি পায়ে বল পাচ্ছেন না। সুরটা বন্ধ হয়ে যেতে চারদিক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ লাগে তার। চোখ বন্ধ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কোনওরকমে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা নম্বর ডায়াল করেন—

ফোনটা রিসিভ হতে কোনও রেসপন্সের অপেক্ষা করেন না তিনি, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে উচ্চারণ করেন, "সেন্ড হেল্প...!" হাত থেকে খসে পড়ে ফোনটা।

(সাত)

জ্ঞান ফিরতে তৃষা দ্যাখে, একটা গাড়ির ব্যাক-সিটে শুয়ে রয়েছে সে। গাড়িটা ধাবমান।

উঠে বসে সামনের সিটে ব্যানার্জিকে দেখতে পায়। মনটাকে একটু শান্ত করে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

— "আগে তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করব, তারপর একটু থানায় যাব। দরকার আছে।" ব্যানার্জির গলা অবসন্ন শোনায়।

— "আর দীপ? ও কোথায় গেল?"

ব্যানার্জি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। কলকাতার রাস্তায় এখন গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কমে এসেছে। তৃষা বুঝতে পারে, তার বাড়ির পথেই চলেছে গাড়িটা।

— "দীপের বাড়িতে কী হল বলুন তো? আর জয়ন্ত! ওঃ গড..."

— "সেসব পরে হবে না হয়। ইউ লুক ডিভাস্টেটেড। একটা গান শুনবেন? একটু চিয়ার আপ হবে?"

তৃষা কিছু উত্তর দেয় না। ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে কার রেডিয়োটা অন করে দেন। কয়েক সেকেন্ড কোনও শব্দ শোনা যায় না, তারপর মিষ্টি গানের সুর ভেসে আসে...

মায়া বৃক্ষ

"So
comes
snow after
fire– and even
dragons have their endings."
– J.R.R. Tolkien (The Hobbit)



(শূন্য)

জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার ঘনিয়েছে। একটা আকাশ-ছোঁয়া পপলার গাছের

সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা বছর দশেকের বাচ্চা মেয়ে। দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো। অস্ফুটস্বরে কিছু উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে।

জঙ্গলের ভিতর কোনও শব্দ নেই। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত কী এক আশঙ্কায় স্থির হয়ে আছে। একটা মন্ত্র পড়তে চাইছে মেয়েটা, অজানা কোনও মন্ত্র।

আচমকা সেই অস্ফুট শব্দ ছাপিয়ে অন্য একটা শব্দ শোনা যায়। অজানা ভাষায় সুরেলা গান গাইছে কেউ। যে গাছটার সামনে মেয়েটা বসে ছিল, তার কান্ডটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দু-পাশে। কান্ডের ভিতর থেকে অন্ধকার মেখে বেরিয়ে আসছে কেউ। কয়েক লক্ষ বছর কান্ডের ভিতরেই ঘুমিয়ে ছিল সে। মানুষের মতো দেহ। নারীদেহ।

ভারী মিষ্টি গানটা। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মেয়েটার ঘুম পায়, চোখ বুজে আসে। পরক্ষণে চোখ খুলেই ছিটকে সরে আসে। ওর মুখের ঠিক সামনেই দুটো বিরাট হলদে চোখ জ্বলজ্বল করছে।

মেয়েটা কথা বলতে চায়, কিন্তু তার গলা বুজে গেছে এতক্ষণে। সেই মানুষের মতো প্রাণীটা ঝুঁকে পড়েছে ওর মুখের উপরে। হলদে জলন্ত চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে গান গেয়ে চলেছে ক্রমাগত।

এ গান অন্য কোনও জগতের, স্বর্গের কিংবা অজ্ঞাত কোনও নরকের।

(এক)

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই একটা চেনা গন্ধ নাকে এল অনীশের। মিষ্টি ফুলের গন্ধ। ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। কাচের জানালা ভেদ করে মিহি শীতের রোদ চাদরের মতো এসে পড়ছে ঘরের ভিতর। সেই আলোতেই সবার আগে অনীশের চোখ পড়ল বিছানার উপর শুয়ে থাকা একটা বছর দশেকের বাচ্চা মেয়ের উপর। বুক অবধি চাদর টানা। মাথার পাশেই পড়ে আছে একটা গোলাপি রঙের খাতা।

শর্মিলা এগিয়ে গিয়ে বসে মেয়েটার মাথার কাছে। মৃদু ঠেলা দেয়, "বীণা, এই বীণা, ওঠ্!"

চোখের উপর হাত ঘষতে ঘষতে উঠে বসে মেয়েটা। আধো-চোখে একবার মায়ের দিকে, একবার অনীশের দিকে তাকায়। অনীশ জানে বীণা কথা বলতে পারে না। তবে শুনতে পায়।

— "এখন থেকে অনিদাদা থাকবে আমাদের সঙ্গে, দেখ।" আঙুল তুলে অনীশকে দেখিয়ে দেয় শর্মিলা, "ওকে তোর আঁকাগুলো দেখা তো!"

বীণাকে খুব একটা উৎসাহিত দেখায় না। শর্মিলাই আগ বাড়িয়ে কাছে ডেকে নেয় অনীশকে, "লজ্জা কীসের? আয়,"

অনীশ কথা না বাড়িয়ে এসে বসে বিছানার উপরে। বাচ্চা মেয়েটা চোখ দিয়ে তাকে আর একবার জরিপ করে আঁকার খাতাটা তুলে দেয় হাতে, "খুলে দ্যাখ্, কী সুন্দর আঁকতে পারে ও, তোকেও শিখিয়ে দেবে। কী রে, শেখাবি তো?"

মেয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে শর্মিলা। বীণা একপাশে ঘাড় নেড়ে দেয়। অনীশ আঁকার খাতাটা উলটে দেখতে থাকে। এইটুকু মেয়ের ভারী চমৎকার আঁকার হাত! তবে মানুষজন খুব একটা বেশি আঁকেনি। বেশিরভাগই রূপকথার চরিত্র। লম্বাটে ধরনের চেহারা, ডাগর চোখ, ফিনফিনে লম্বা হাত এবং সমস্ত চরিত্রই মেয়ে।

আর কয়েকটা পাতা উলটে অনীশ দেখল, কিছু অদ্ভুতুড়ে গাছপালার ছবিও আঁকা আছে তাতে। কোনও রূপকথার বই দেখে এঁকেছে কি? ডায়েরিটা বন্ধ করে আগের জায়গাতেই রেখে দিল, চাপা গলায় বলল, "বাঃ। খুব সুন্দর।"

— "তুমি একটু এখানে বসো। আমি জগদীশের সঙ্গে কথা বলে আসি, কেমন?" কথাটা বলে উঠে চলে গেল শর্মিলা। অনীশ চেয়ে দেখল বীণা এখনও অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

— "কী?" ধরা গলাতেই প্রশ্ন করল অনীশ। এক মুহূর্তের জন্যে যেন থতোমতো খেয়ে গেল মেয়েটা। তারপর আঁকার খাতাটা বুকে চেপে ধরে

শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।

অনীশের বয়স সতেরো বছর ছ-মাস আঠেরো দিন। তবে এক ঝলক দেখলে স্বাভাবিকের থেকে বেশ খানিকটা বাচ্চা দেখায়। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। টিকালো নাক। ছিপছিপে চেহারা। কুচকুচে কালো মাথার চুল ভ্রু স্পর্শ করে থাকে সবসময়।

মেয়েটা পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে অনীশ বিছানা থেকে উঠে কাচের জানলার দিকে এগিয়ে যায়। এ জানালা দিয়ে তাকালে ঘন পাইন গাছের আকাশছোঁয়া জঙ্গল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কোথায় গিয়ে জঙ্গল শেষ হয়েছে কে জানে! বেশিক্ষণ একটানা সেই জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকলে বুকের ভিতরটা কেমন ছমছম করে ওঠে। মনে হয় এই বুঝি দুটো চিরপাইন গাছের পিলারের ফাঁক দিয়ে কিছু একটা ছুটে বেরিয়ে আসবে।

একটা অন্ধকার ফাঁকে চোখ রাখে অনীশ। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে সেইদিকে। তবে চোখ ফেরানোর আগেই দৃষ্টি থেমে যায়। বাইরে নয়, ভিতরে। কাচের আধ-টানা জানলাটায় ঘরের ভিতরের দিকের প্রতিচ্ছবি পড়েছে। সেই প্রতিচ্ছবিতে অনীশ দেখে বীণা সাপের মতো মাথা তুলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। কোনও কারণে ওর জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকাটা কৌতূহলী করে তুলেছে বীণাকে। ব্যাপার কী?

(দুই)

টেবিলের উপর রাখা গ্লাস থেকে খানিকটা জল খেয়ে চেয়ারের উপরে এসে বসে একটা কুশন কোলের উপরে টেনে নেয় শর্মিলা। জগদীশ এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসে ছিল। শর্মিলার ছোটো ভাই জগদীশ। অনীশকে সে-ই এনেছে এখানে। শর্মিলাকে দেখে সোজা হয়ে বসে জগদীশ, "কেমন দেখলে ওকে?"

— "খুব একটা ট্রমাটাইজড আছে বলে তো মনে হল না। কথা বলছে।"

ঠোঁটের নীচে করুণ হাসল জগদীশ, "ওকে দেখে ওরকম মনে হয়। ভিতরে ভিতরে ভেঙে গিয়েছে অনেকটা, এইটুকু বয়সের একটা ছেলে।"

শর্মিলার মাথাও নেমে আসে নীচের দিকে, "দিদি যে কেন এরকম করল, আমি আজও কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। ছেলেটার বাকি জীবনটা নষ্ট করে দিয়ে গেল।"

— "ডাক্তারবাবু বলেছেন, অনিকে ওর মা-বাবার ব্যাপারে কিছু না বলতে। নতুন করে জীবনটা শুরু করুক এখানে। আপাতত যা ভালো লাগছে তাই করুক, তাছাড়া কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছেন। খুব বেশি ছটফট করলে..."

কথাগুলো কানে ঢুকছিল না শর্মিলার। রুমেলার মুখটা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে তার। বিয়ের পর থেকেই একটু একটু করে দিদিকে চোখের সামনে পালটে যেতে দেখেছিল। সমৃদ্ধর অত্যাধিক মাতলামো, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন কোনওদিন মানিয়ে নিতে পারেনি সে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন। মানসিক অবসাদের জন্য কিছুদিন ধরেই সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হচ্ছিল। সেই অবসাদ থেকেই হয়তো গাড়ি নিয়ে খাদে ঝাঁপ দিয়ে...

পরদিন কাগজে খবরটা দেখে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শর্মিলা। সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল, সমৃদ্ধকে লেখা, 'ভালো থেকো নিজেকে নিয়ে। ছেলেটাকে মানুষ করার ক্ষমতা তোমার নেই জানি। ওকে পারলে ওর মাসির কাছে রেখে এসো।'

খাদের প্রায় কয়েক'শো মিটার নীচে গিয়ে পড়েছিল গাড়িটা। সেটাকে আর উদ্ধার করা যায়নি। প্রাথমিক শোকটা কেটে যেতে, শর্মিলার মনে পড়েছিল অনীশের কথা। মাতাল বাবার কাছে আর যা-ই হোক মানুষ তো হতে পারবে না, ঠিক করে নিজের কাছে এনে রাখবে। বীণা এখানে সারাদিন খেলার সঙ্গী পায় না। যদিও অনীশ ওর থেকে প্রায় বছর সাতেকের বড়, তাও ভাব হয়ে গেলে বীণার মনটাও খুশি হবে অন্তত।

জগদীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বলে, "ইয়ে, সুজয়দাকে দেখছি না, গিয়েছেন কোথাও?"

— "আর বলিস না, আবার সেই মিসিং কেস।"

— "মিসিং?" অবাক হয় জগদীশ, "এইটুকু হিল স্টেশনেও ক্রাইম-টাইম হয়?"

— "অন্য কিছু হয় না তেমন। তবে এই ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। এই শীতের সময়টা প্রতি বছরই দু-একজন করে লোক মিসিং হয়ে যায়। বডি পাওয়া যায় না। কী হয়, কোথায় যায়, কেউ জানে না।"

— "প্রতি বছর?"

— "ইচ এন্ড এভ্রি ইয়ার। এখানে লোকজন মেরে-কেটে হাজারখানেকের বেশি হবে না। বেশিরভাগই কাঠুরে, জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায় একদম।"

— "স্ট্রেঞ্জ!"

ভুরু দুটো কোঁচকায় জগদীশের। খাজিয়ারে আগেও বহুবার এসেছে। জঙ্গলে ঘেরা একটা ছোট্ট হিলস্টেশান। সারাবছর আকাশ পরিষ্কার থাকে। মাঝে মধ্যেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে। খোলা মাঠের উপরে গিয়ে বসলে দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লুকোচুরি খেলে চারপাশে। মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে পাহাড়ের টানেল চিরে-আসা রেলগাড়ির আওয়াজ খেলনার মতো কানে আসে। এই শহরের লাগোয়া জঙ্গলেই রেঞ্জারের কাজ করে সুজয়। জগদীশ সুজয়ের মুখেই শুনেছে, এই জঙ্গলকে ঘিরে এখানকার পাহাড়ি বাসিন্দাদের মধ্যে বিচিত্র সব উপকথা চালু আছে। তারা বিশ্বাস করে এই জঙ্গলের কথা নাকি বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গ্রন্থেও লেখা আছে। জঙ্গলের গভীরে এমন আশ্চর্য সব প্রাণী আছে যা আজ অবধি মানুষের চোখে ধরা দেয়নি।

ট্রেনে আসতে আসতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলে, সেই সব লোককথা অকারণেই জগদীশের মনের ভিতরে ছোটাছুটি করতে থাকে। সত্যি ভীষণ ঘন জঙ্গল। সারাক্ষণ কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে ভিতরটা। সেখানে অজ্ঞাত কোনও প্রাণী যদি থেকেও থাকে, তাকে দ্যাখে কার সাধ্যি?

বেরোনোর আগে একবার ভেতরের ঘরে ঢুকে আসে জগদীশ। দরজা খুলতেই দেখে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে চেয়ে আছে অনীশ। তার পিঠে হাত রেখে শান্ত গলায় বলে, "তোকে কী বলেছিলাম মনে আছে

তো? এখানে বাড়ির ভেতরে যত খুশি ঘোর। যেখানে খুশি যা। শুধু একা একা জঙ্গলের দিকে ভুলেও নয়।"

— "কেন? কী আছে জঙ্গলে?"

ভেবে দেখে জগদীশ। একটা সতেরো বছরের ছেলেকে ভয় দেখিয়ে আটকে রাখা যাবে না। তাতে কৌতূহল আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাথা নামিয়ে এনে বলে, "কী আর থাকবে? সাপ, পোকা-মাকড় আছে। এসব বুনো পোকা-মাকড় একবার কামড়ে দিলে, এসব জায়গায় আর রক্ষা থাকবে না।"

— "আচ্ছা যাব না।"

হঠাৎ জগদীশের জামাটা ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে অনীশ বলে, "এই মেয়েটা এমন অদ্ভুত কেন বলো তো? কী হয়েছে ওর?"

জগদীশের মাথা হেট হয়ে আসে। ফিসফিসে গলায় বলে, "ইনোপেরাবল ব্রেন টিউমার। পারলে ওর সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করে নিস।"

অনীশের মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। বীণার দিকে ঘুরে তাকায় সে। আঁকার খাতাটা বুকের কাছে ধরে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। মুখ ফিরিয়ে আবার জঙ্গলের দিকে চায় অনীশ। একটু আগেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল, জঙ্গলের গাছের ফাঁক থেকে কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কাউকে দেখতে পায়নি, অথচ মন বলছিল একজোড়া চোখ একদৃষ্টে লক্ষ করে চলেছে ওকে। কী আছে জঙ্গলে?

(তিন)

চোখ খুলতেই একটা হালকা নীলচে রেখা এসে লাগল অনীশের চোখে। অনেকটা ভোরের প্রথম আলোর মতো। সে মনে করে দেখার চেষ্টা করল, কাল রাতে তো রোজকার মতো দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অথচ এখন দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গল থেকে দূরে শুকনো মাটির উপর।

পায়ের থেকে মিটার দশেক দূরেই একটা খাদ শুরু হয়েছে। খাদের ভিতর থেকে কালচে ধোঁয়া উঠে আসছে উপরে।

তবে কি রাতে ঘুমের ঘোরেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে? চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করল সে। কুয়াশায় কিছু স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। চোখে পড়ল, খাদের একেবারে ধারে এক মাঝবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার সারা শরীর কালচে কাপড়ে ঢাকা। যেন মমি করার জন্য কাপড়ে জড়িয়ে রাখা একটা দেহকে খাদের ধারে পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে গিয়েছে কেউ।

মানুষটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে খাদের অতল গভীরে। পিছন থেকে মহিলাকে চেনা লাগল অনীশের। আর কিছু না ভেবে সেদিকে এগিয়ে গেল।

একটা মিহি রিনরিনে শব্দ ভেসে আসছে খাদের অতল থেকে। যেন অনেক অদৃশ্য মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। সুরেলা গলায় সমবেত-স্বরে একটা গান গাইছে তারা। সেই সুর খাদের দেওয়াল বেয়ে কুয়াশার মতো উঠে আসছে উপরে।

কিছুটা কাছে আসতেই পিছন থেকে মহিলাকে চিনতে পারল অনীশ – মা। খাদের একেবারে ধারে দাঁড়িয়ে ভেতরে কী যেন দেখছে। আর এক ইঞ্চি সামনে এগোলেই গিয়ে পড়বে খাদের ভিতর।

অনীশ আতঙ্কিত-স্বরে চিৎকার করে উঠল, "মা! মা আর এগিও না..."

কোনও হেলদোল নেই। ছুটে গিয়ে মায়ের পিঠে হাত রাখল অনীশ। চাপা গলায় ডাকল, "মা, তুমি তো..."

মহিলার নিথর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। কোথা থেকে পোড়া গন্ধ আসছে, ডিজেল পোড়া গন্ধ। ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল মানুষটা। অনীশের মনটা নেচে উঠল। মনে হল বহু বছর হয়ে গেছে মায়ের মুখটা দেখেনি। কিন্তু সেই মুখের দিকে চেয়ে বুকের ভিতর হিমেল পরশ বয়ে গেল অনীশের। মহিলার মুখের চামড়া আর মানুষের মতো নেই। ঠিক যেন একটা গাছের বাকল-ওঠা কাণ্ডের উপর মানুষের মুখ খোদাই করে বসাতে চেয়েছে কেউ। ঠোঁটের ফাঁকে জিবটা উধাও, চোখের মণির জায়গায় দুটো অন্ধকার

কোটর। হাতগুলো ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে গাছের শুকনো ডালপালায়। খাদের নীচ থেকে শুনতে পাওয়া সেই শব্দটা মায়ের জিববিহীন মুখের থেকে তীব্রস্বরে বেরিয়ে এল।

ছিটকে পিছিয়ে এল অনীশ। মনে হল, খাদের ধারের রাস্তা দিয়ে সজোরে একটা গাড়ি আসছে। উচ্চস্বরে হর্ন বাজাচ্ছে গাড়িটা। শেষ চিৎকার করে এসে পড়েছে ওর গায়ের উপর।

চিৎকার করে উঠল অনীশ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিল? এই ডিসেম্বরের ঠান্ডাতেও শরীর ঘামে ভিজে গেছে ওর। পায়ের দিকে বারান্দার জানালাটা খোলা। সেখান দিয়ে জঙ্গলের বুনো হাওয়া ভেসে আসছে ক্রমাগত। পর্দাটা এলোপাথারি উড়ছে।

এখানে এসে থেকে দুটো দিন কেটেছে অনীশের। মানিয়ে নিতে তেমন অসুবিধা হয়নি। তবে সারাক্ষণই একটা চাপা অস্বস্তি যেন ঘিরে থাকে ওকে। জঙ্গলের দিকে চোখ চলে যায় বার-বার। মনে হয়, ওর ভিতর থেকে কে যেন ক্রমাগত তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রাতে শুতে গিয়ে চারিদিকের সব শব্দ কমে এলে বাতাসে মৃদু গুনগুন শুনতে পায়।

প্রথমদিন রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, কে যেন ঘরের ভিতরে ছিল এতক্ষণ। ও জেগে উঠতেই সে লুকিয়ে পড়েছে। ঘরের চারদিকটা খুঁজেও দেখেছিল অনীশ। কেউ নেই।

কত রাতে হবে? দেওয়ালে ঝুলন্ত ঘড়ির দিকে তাকায় অনীশ। তিনটে বাজছে। সেভাবেই শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মানে কী স্বপ্নটার? ডাক্তারবাবু বলেছেন মায়ের কথা বেশি না ভাবতে। অনীশ তো তেমন একটা ভাবেও না। তবু মা যেন বার-বার ফিরে আসতে চাইছে ওর কাছে।

মনে পড়ে যায়, একদিন রাতে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসেছিল অনীশ। মা ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল, "আচ্ছা অনি, তোর কখনও আফশোশ হয় না?"

— "কীসের আফশোশ?"

— "এই যে তুই আমার ছেলে হয়ে জন্মেছিস, তোর বাবার ছেলে হয়ে

জন্মেছিস। অন্য মা-বাবা পেলে তোর জীবনটা আর একটু সহজ হত। না রে?”

অনীশ তখন অতশত বুঝত না। সে ঠোঁট উলটে বলেছিল, “পাইনি যখন, তখন আর ভেবে কী হবে? এই দিয়েই চালিয়ে নেব।”

মা অল্প হেসে ওকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলেছিল, “দেখিস, যা-ই হয়ে যাক, তোর বাবা যত খারাপই হোক, আমি সবসময় তোর কাছে থাকব।”

মা কথা রাখেনি। অনীশ এতদিনে বুঝেছে, মায়ের জীবনে নানান সমস্যা চলছিল। বাবার দিক থেকে, অফিস-কাছারির দিক থেকে, সবরকমভাবে অত্যাচারিত হতে হতে একসময় আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি।

আচ্ছা, খাদে ঝাঁপ মারার আগেও একবার অনীশের কথা কি মনে হয়নি মায়ের? মায়ের মুখটা এখন খুব মনে পড়ে অনীশের। একমাস আগেও বিছানায় পাশ ফিরলে দেখতে পেত মা-কে।

পাশের টেবিলে রাখা ছিল গ্লাসটা। ঠোঁটের কাছে এনে সবে চুমুক দিতে যাবে, তার আগেই থমকে গেল। এই ঘরের লাগোয়া একটা ছোটো বারান্দা আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে জঙ্গল থেকে বয়ে আসা হাওয়া গায়ে লাগে। আপাতত বারান্দার আলো নেভানো।

এইমাত্র সেখান থেকে মৃদু একটা শব্দ এসেছে। যেন ধাতব কিছু একটা বারান্দার রেলিংয়ে ঠোকা লেগে ‘ঠং’ করে শব্দ হয়েছে। সোজা হয়ে বসল অনীশ। সে খুব-একটা ভীতু নয়, তাও জঙ্গল থেকে ভেসে আসা হাওয়ায় কীসের জন্য একটা গন্ধ লেগে আছে, সেই গন্ধটাই বারবার সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে। বারান্দার দিকে চেয়ে নীচু গলায় ডাক দিল, “কে ওখানে?”

কোনও উত্তর এল না। কেবল আগের মতোই বুনো হাওয়া ঢিমে তালে বয়ে যেতে লাগল। একটা ভাবনা এসে চেপে ধরল ওকে। মনে হল, জানালার অন্ধকার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এতদিন জঙ্গলের গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল, এখন বারান্দার অন্ধকার ঢেকে রেখেছে তাকে।

আবার শুতে গিয়েও পারল না। অস্বস্তিটা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জঙ্গলের

গাছপালার দুলুনিতে হাওয়ার সঙ্গে একটা সুরেলা শব্দ ভেসে আসছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা। আর কোনও জীবিত প্রাণীর শব্দ নেই।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে এল অনীশ। এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল প্রশ্নটা, "কে আছে ওখানে?"

ওপাশ থেকে কোনও উত্তর এল না। জঙ্গলের ভেতর থেকে কোনও অজানা প্রাণী শিষ দেওয়ার মতো শব্দে ডেকে উঠল।

দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অনীশ। অন্ধকারে ঢেকে চারপাশ কিছুই দেখা যায় না। তাও অবচেতন মন বলে দিল, এই বারান্দায় ও একা নয়। উলটোদিকে রেলিং ধরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। খুব মৃদু শব্দে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। আগন্তুক রোগা এবং খুব মৃদু কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর।

অনীশের মনে হল, ওর কাছে যদি টর্চ থাকতো তাহলেও জ্বালানোর মতো সাহস পেত না। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

কয়েক সেকেন্ড উত্তর এল না। তারপর আচমকাই নৈঃশব্দ ভেঙে একটা মৃদু নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "আমি,"

— "নিজের কাছে তো সবাই আমি। তুমি কে?"

আবার সেই থেমে থেমে উত্তর, যেন প্রত্যেকটা শব্দ মেপে মেপে উচ্চারণ করছে মানুষটা, "আ... আমার নাম ইভা। এই জঙ্গলেই থাকি।"

— "জঙ্গলে মানুষ থাকে নাকি?" অনীশ সন্দেহের গলায় বলল।

— "না। মানুষ থাকে না, আমি থাকি।"

ধোঁয়ার মতো একটা ভয় চেপে ধরল অনীশকে। পিছনের রেলিং-এ সেঁটে দাঁড়াল সে। ইভার করুণ গলা কানে এল তার, "আ... আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিও না প্লিজ! আমার খুব বিপদ, ওরা আমাকে ধরতে পারলে..."

অনীশ এবার বাধা দেয়, "ওরা মানে? ওরা কারা?"

— "ওই জঙ্গলের ভিতরে যারা থাকে,"

— "সে কী! এই তো বললে তুমিই জঙ্গলের ভিতরে থাকো।"

— "শুধু আমি থাকি না।"

এতক্ষণে ব্যাপার কিছুটা বুঝতে পারে অনীশ। তবে সমস্তটা তার বিশ্বাস

হয় না। ইভা কোনওভাবে কার্নিশ বেয়ে বারান্দায় এসে উঠেছে। রোজই এই বারান্দায় এসে বসে থাকে? গেস্ট কেউ না এলে ঘরটা তো ফাঁকাই থাকে। তার মানে, একটা কথা অনীশের মাথায় গেঁথে গিয়েছে। উলটো দিকের মানুষটা ওকে ভয় দেখাতে আসেনি। সে নিজেই কাউকে একটা ভয় পাচ্ছে।

— "ঠিক আছে। থাকো বসে।"

ফিরতে যাচ্ছিল অনীশ, ইভা পিছু ডেকে বলে, "বলছি তুমিও একটু বসো-না এখানে।"

— "কেন?"

— "এমনি, আসলে জঙ্গলে কথা বলার লোক নেই তো!"

এতক্ষণে কিছুটা সাহস পেয়েছে অনীশ, বাঁকা সুরে বলে, "হুহ, কথা না ছাই। ভিতরে গিয়ে কাউকে যাতে না ডাকি সেইজন্য বসিয়ে রাখছ, আমি কিছু বুঝি না নাকি?" গলা একটু নরম করে অনীশ বলে, "তোমার ভয়ের কিছু নেই। খামোখা তাড়াতে যাব কেন? তাছাড়া বাড়িটা আমার নয়, আমিও এখানে থাকতে এসেছি।"

— "কেন? তোমার নিজের বাড়ি নেই?"

— "ছিল। এখন আর নেই।"

— "কেন?"

ইভার অতিরিক্ত আগ্রহে অনীশ প্রথমে খানিকটা রেগে যায়। তারপর অবাক হয়ে বলে, "আরে অদ্ভুত তো! বাড়ি কি মানুষের চিরকাল থেকে যায় নাকি? তাছাড়া তুমিই বা নিজের বাড়ি ছেড়ে এত রাতে এখানে কী করছ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে ইভা, "আমার বাড়ি নেই।"

— "সে কী! তাহলে থাকো কোথায়?"

— "কোথাও থাকি না," আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ইভা, চুপ করে গেল, "এত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। ভয় লাগছে বলে একটু লুকিয়েছি এখানে, ভয় কেটে গেলে চলে যাব, ব্যাস।"

অনীশ ঠায় বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "আমার মা বলত, কারও সঙ্গে কথা বললে ভয় কেটে যায়। তুমি চাও তো

আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো।"

— "বলতো মানে? মা নেই নাকি?"

অনীশ চোখ না সরিয়েই ঘাড় নাড়ায়, "তোমার যেমন বাড়ি নেই, আমার তেমন মা নেই। বাড়ির মতো মা-ও সবসময় থাকে না।"

— "কোথায় গিয়েছে?"

অনীশ চাপা হাসি হাসে, "সুইসাইড করেছে। সুইসাইড মানে..."

— "জানি।"

ঠান্ডাটা বেড়ে উঠেছে এতক্ষণে। কনকনে হাওয়ার ধাক্কা এসে লাগল ওদের মুখে। ভয় কাটানোর উপায়টা নিয়েই যেন এতক্ষণ ভাবছিল ইভা, গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, "আচ্ছা, তুমি ঘুমোওনি কেন আজ?"

— "ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল।"

— "কী স্বপ্ন?"

— "তেমন কিছু না। মায়ের জন্য মনখারাপ করছিল। ডাক্তারবাবু মায়ের কথা ভাবতে বারণ করেছেন। আচ্ছা তুমিই বলো, বারণ করলেই ভাবা বন্ধ হয়ে যায়?"

সময় নিয়ে কী যেন ভাবে ইভা, বলে, "চাইলে আমাকে বলতে পারো। আমি কাউকে বলব না।"

অনীশ অবজ্ঞার হাসি হাসে, "ধুর, অচেনা লোককে এসব কথা বলা যায় নাকি? তোমাকে দেখতে কেমন তাই জানি না।"

— "দেখতে চাইলেই দেখাতে পারি।"

অনীশের কৌতূহল বেড়ে ওঠে। ইভার গলার স্বর অস্বাভাবিকরকম মিষ্টি। অনীশ বলে, "দাঁড়াও আলো জ্বালছি।"

— "উঁহুঁ, আলো লাগবে না।"

কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত কেটে যায়। রাতের হাওয়া এখন জোরে বইতে শুরু করেছে। শিরশিরানি ভাব মিশে আছে তাতে। জঙ্গলের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে একটা হাওয়ার স্রোত সমুদ্রের অতিকায় ঢেউয়ের মতো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে যাচ্ছে। গাছগুলো সেই ঢেউয়ে মিশে দুই দিগন্ত স্পর্শ

করতে চাইছে।

হঠাৎ শনশন শব্দের মধ্যে অনীশ শুনতে পায়, তার ঠিক পাশ থেকে একটা সুরেলা স্বর ভেসে আসছে। মৃদুকণ্ঠে একটা গান গাইছে মেয়েটা। অপার্থিব কোনও গান। অনীশের মনে হল, একমাত্র স্বর্গের অপ্সরা ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন গান গাওয়া সম্ভব নয়। বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল সে।

গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা আলোর বৃত্ত ফুটতে শুরু করেছে মানুষটার আঙুলের ডগায়। যেন একটা জোনাকি পোকা একটু একটু করে আকারে বড় হচ্ছে। সবজে রঙের একটা আভা বেড়ে উঠছে সেই সঙ্গে। অনীশ সম্মোহিতের মতো সে-দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই আলোর আভা গিয়ে পড়েছে একটা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের উপর। হ্যাঁ, মানুষই বটে। একটা মেয়ে। বয়সে অনীশের মতোই হবে। কিন্তু মুখের দিকে একবার তাকালে বোঝা যায়, স্বাভাবিক মানুষ সে নয়।

বীণার খাতায় আঁকা সেই সবজে রূপকথার মানুষ যেন অবিকল। একে দেখেই কি ছবিগুলো এঁকেছে বীণা?

মেয়েটার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়। ঘন নীল চোখের মণির উপর সবজে আভা জ্বলজ্বলে পাথরের মতো ঠিকরে বেরোচ্ছে। টিকালো নাক, কুচকুচে কালো একমাথা চুল। চামড়া এত মসৃণ যে সবুজ আলো পিছলে যাচ্ছে তার উপরে পড়ে। সরু কোমরের পাশে একটা ধারালো ছুরি গাঁথা আছে। কিচেন নাইফ। চুরি করা নাকি?

এমন অদ্ভুত সুন্দর অথচ অলৌকিক চেহারা কোনও মানুষের হতে পারে না। এখনও উঁচুস্বরে গানটা গেয়ে চলেছে মেয়েটা। যেন ওই গান গেয়েই আঙুলের ডগায় আলোটা জ্বেলে রেখেছে।

দু-জনেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে মেয়েটার সবুজে ভরা চোখ দু-টোর দিকে চেয়ে রইল অনীশ। ইভা কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। একটা নাচের ছন্দে অজান্তেই যেন একটু একটু দুলে চলেছে সে।

অনীশের মনে হল, ইভার গলার স্বর আর চোখ দুটো যেন সম্মোহিত করে ফেলছে তাকে। নিজের অজান্তেই কয়েক পা এগিয়ে গেল অনীশ। কাঁপাকাঁপা

ঠোঁটে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

— "আমি ইভা। আমি..."

মেয়েটাও এক পা এগিয়ে এসেছে ওর দিকে, তার অস্থির চোখের মণিটা অনীশের মুখের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইভা একটা হাত ওর কাঁধের উপর রাখল। কী মসৃণ স্পর্শ মেয়েটার! যেন ঠান্ডা মোম গলে পড়েছে ওর কাঁধে, "কে তুমি? বলো?" অনীশ অজান্তেই উচ্চারণ করল প্রশ্নটা।

— "আমি... আমি..." কী একটা কথা বলতে গিয়েও সে পারল না। ভেতর থেকে দরজা ধাক্কা দেওয়ার একটা শব্দ ভেসে এসেছে।

— "অনীশ, তুই চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন?"

মাসি। অনীশ গলা তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটা হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর মুখ চেপে ধরল, মোমের মতো হাতের স্পর্শটা ওর মুখটাকে বন্ধ করে দিয়েছে, "চুপ। একটাও শব্দ করবি না।"

বাইরে থেকে আরও দু-তিন বার ডাকল মাসি। তারপর পায়ের আওয়াজ দূরে চলে গেল। অনীশের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে মেয়েটা বলল, "তুই ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি এখানে বসে থাকব।"

— "কেন? আমি শুয়ে পড়ব কেন?"

— "আঃ, যা বলছি তাই কর।" হঠাৎ করেই মেয়েটার অসহায় ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে একটা রুক্ষতা বেরিয়ে এসেছে। তুমিটা তুইতে নেমে এসেছে। চোখ দু-টোয় এখন একটা লালচে রং মিশতে শুরু করেছে।

ভয় লাগল অনীশের। তাও কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, মাসি বলছিল, এখান থেকে নাকি মাঝে মাঝে কিছু লোক গায়েব হয়ে যায়। কারা ধরে নিয়ে যায় তুই জানিস?"

ইভা মাথা নাড়ে, "জানি। ওদের থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি।"

— "কেমন দেখতে ওদের?"

ইভা উত্তর দিল না। তার হাতের আলোটা নিবে আসছে। জঙ্গলের দিকে চোখ হারিয়ে গেছে তার। অনীশ অন্ধকারের বুক চিরে ফিসফিসে গলা শুনতে

পেল, "আমি রোজ রাতে আসি এখানে। তুই চাইলে যা খুশি মন খুলে বলতে পারিস আমাকে। শুধু আমি যে রাতে এখানে এসে লুকিয়ে থাকি, সে কথা তুই কাউকে বলতে পারবি না। মনে থাকবে?"

— "থাকবে। আচ্ছা মন খুলে একটা প্রশ্ন করি তাহলে?"

— "কী?"

— "তুই এত ভালো গান শিখলি কী করে?"

অন্ধকারেও অনীশ বুঝতে পারে ইভা হাসছে। হাসিটা গলায় মেখেই সে উত্তর দেয়, "পরে একদিন বলে দেব। আজ যা, ঘুমিয়ে পড়।"

অনীশ আর কথা বাড়ায় না। আজ রাতে যা ঘটল তাতে মনে হচ্ছে একটু আগের স্বপ্নটা এখনও শেষ হয়নি। হয়তো এক্ষুনি চোখ খুলে দেখবে শোবার ঘরের বিছানাতে শুয়ে। ইভাকে সে স্বপ্নে কল্পনা করেছে মাত্র। গায়ে একটা চিমটি কাটল অনীশ। মেয়েটার গানের মধ্যে কী যেন একটা ছিল, মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।

— "আচ্ছা বেশ। আমি যাচ্ছি।"

বিছানায় শুয়ে অনীশের মনে পরপর প্রশ্ন ভেসে আসতে লাগল। ইভা মেয়েটা কে? উদ্দেশ্য কী তার? রোজ এখানে এসে বসে থাকে? তাহলে বীণা ছাড়া কেউ জানতে পারেনি কেন এতদিন? আর বীণাই বা জানল কেমন করে? কার হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটা? জঙ্গলে সে ছাড়া আর কে থাকে? এরা এখানে এলোই বা কী করে?

এতগুলো প্রশ্ন সতেরো বছরের অপরিণত মাথাটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। ঘুমের মধ্যে অনীশের অবচেতন মন বলল, ইভা বাইরের বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওর দিকে আগের মতোই তাকিয়ে আছে। কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে তার। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে, মেয়েটার সঙ্গে কি কোনও যোগ আছে অনীশের?

উত্তেজনা আর ভয় কেটে গিয়ে একটা শান্তি আর নিরাপত্তার আরাম আঁকড়ে ধরে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওকে।

(চার)

খাজিয়ারে পরের তিনটে দিন খারাপ কাটল না অনীশের। সারাদিন অন্য কোনও কাজ নেই। বীণার সঙ্গে এই ক-দিনে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ওকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শেখায় বাচ্চা মেয়েটা। মানুষ আঁকার আগ্রহ একেবারেই নেই তার। বারবার ওই একই মুখ – ইভা।

অনীশ নিজেও এখন ইভার মুখ আঁকতে পারে। প্রথম দিন তাকে ইভার গলা আর হাত আঁকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বীণা। অনীশ তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়েছিল। তবে জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি অনেক চেষ্টা করেও পায়নি অনীশ।

এই তিন দিন ইভাও রোজ রাতে এসে বসেছে বাইরের বারান্দায়। কোনও কোনও দিন অনীশের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। ইভা কখনও ঘুমায় না, সর্বক্ষণ সজাগ হয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। অনীশের ইদানীং মনে হয় পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া আরও কোনও উদ্দেশ্য আছে ইভার, সেটা কাউকে খুলে বলে না।

দু-দিন মাঝরাতে আবার সেই স্বপ্নটা দেখে উঠে বসেছে অনীশ। দ্যাখে, ইভা ওর মুখের উপরে ঝুঁকে চেয়ে আছে, "আবার স্বপ্ন দেখছিলি?"

— "আমার ভয় লাগে খুব,"

— "কীসের ভয়?"

— "ওই যে জঙ্গলে যে-সব লোকগুলো হারিয়ে যায়, আমাকেও যদি..."

— "ভয়ের কিছু নেই," অভয় দিয়ে অনীশের হাতের উপরে হাত রাখে ইভা, "ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি।"

— "আর যদি..."

— "চুপ, ঘুমোনোর চেষ্টা কর। আমি জেগে আছি।" কথাটা বলে কোমরের ছুরিটা খুলে অনীশের বালিশের পাশে রাখে ইভা।

কী একটা আছে ইভার গলার স্বরে। মানুষ নয় বলেই হয়তো... চাইলেই সে স্বর মানুষের মনকে শান্ত করে দিতে পারে, ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে।

পঞ্চম দিন বুকের কাছে বালিশের মতো কিছুর চাপ লাগতে ঘুম ভাঙল অনীশের। ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। রাতের জমাট অন্ধকার এখনও শুয়ে রয়েছে ঘরের মেঝেতে।

অনীশ অনুভব করল, কেউ একটা এসে শুয়েছে ওর বুকের কাছে, ও একটু পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

উত্তর এল না। মানুষটার মুখের উপর হাত রেখে অনীশ বুঝতে পারল উত্তর আসার কথাও নয়। বীণা এসে শুয়েছে ওর কাছে। ছোটো নাইট-ল্যাম্পের আলো ওর মুখের উপরে এসে পড়েছে। মুখ দেখে বোঝা যায়, কোনও কারণে ভয় পেয়েছে সে। কাঁচুমাচু মুখে চেয়ে আছে অনীশের দিকে।

— "ভয় পেয়েছিস, না রে? কিছু দেখেছিস জঙ্গলে?"

উপরে নীচে মাথা নাড়ায় বীণা। অনীশ তার গায়ের উপরে একটা হাত রাখে। মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নেয়। সম্ভবত বারান্দা ফাঁকা। ভোর হওয়ার আগেই চলে যায় ইভা।

— "ভয় পেলে জানবি দাদা কাছে-পিঠেই কোথাও আছে। বুঝলি?"

বীণা আবার উপর-নীচে মাথা নাড়ে। তারপর চোখ বুজে দাদার আরও কাছে ঘেঁষে আসে।

— "ভয় পাস না, আমার মা বলতো ভয় পেলে..." কথাটা শেষ করতে পারে না অনীশ। ভয় কাটানোর এই উপায়টা কাজে লাগবে না বীণার।

হঠাৎ কী মনে হতে পকেট থেকে একটা সবুজ চাকতি বের করে বীণার হাতে দেয় অনীশ, "এইটা তুই রাখ। এটা কাছে থাকলে আর ভয় করবে না।"

জিনিসটা হাতে নিয়ে বীণা দ্যাখে সেটা একটা ক্যারাম বোর্ডের স্ট্রাইকার। সে অস্ফুট শব্দ করে ইশারায় জিজ্ঞেস করে সেটা কী। অনীশ সোজা হয়ে শুতে শুতে বলে, "আমার মা ছোটোবেলায় ক্যারাম কিনে দিয়েছিল আমাকে। জানিস তো ক্যারাম বোর্ডে স্ট্রাইকার সব থেকে শক্তিশালী। তোর ভয়গুলো হল সাদাকালো গুটি, এদিকে তোর হাতে রয়েছে স্ট্রাইকার। এটা দিয়ে সব ভয়কে দূরে সরিয়ে দিতে পারবি তুই।"

কী যেন ভেবে আবার বলে অনীশ, "ডাক্তারবাবু বলেছেন, মায়ের সব চিহ্ন ফেলে দিতে। শুধু এইটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কেউ বুঝতেও পারেনি ওটা মায়ের চিহ্ন, তুই রেখে দে বরং। আর ভয় করবে না।"

সবুজ স্ট্রাইকারটা নিয়ে হাসিমুখে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে বীণা। অনীশ হাতটা ওর গা থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। এবার ও নিজেই দাদাকে এক হাতে জড়িয়ে মাথা গুজে শুয়ে পড়ে।

সকালে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসতেই অনীশ দেখল বীণা ওকে ডাকছে। পায়ের কাছের জানলা দিয়ে বাইরে দেখে সবে ভোরের আলো ফুটেছে। কাল অনীশের কাছেই শুয়েছিল বীণা। কিন্তু এই সময়েই কি উঠে পড়ে? তা ছাড়া ওকে ডাকছেই বা কেন?

বীণার চোখে-মুখে চাপা সতর্কতা খেলা করছে। অনীশের জামার একটা প্রান্ত ধরে টানছে। সে বুঝল, ওকে কোথাও একটা নিয়ে যেতে চায় বীণা।

— "কী রে? কোথায় যাবি এত সকালে? মাসি বলেছে..."

মুখ থেকে চাপা শব্দ বের হল একটা। অনীশের মনে হল কাল রাতে ওর ভয় কমিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে কিছু একটা উপহার দিতে চায় বীণা। সম্ভবত কিছু একটা দেখাতে চায়।

ঠোঁটের উপরে আঙুল রেখে ওকে চুপ করতে বলল বীণা, তারপর জামার ভিতর থেকে সেই ছোটো আঁকার খাতাটা বের করে তার বিশেষ একটা পাতা খুলে মেলে ধরল ওর চোখের সামনে।

অনীশ সেদিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। নতুন একটা গাছের ছবি একেছে বীণা। তবে সাধারণ গাছ নয়। গাছের কান্ডটাই যেন বিরাট একটা গুহার প্রবেশপথ। মাথাটা গিয়ে মিশেছে আকাশের বুকে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গাছের ডাল-পালার মধ্যে চুল বেঁধে ঝুলে আছে কিছু মানুষ। যেন ফলের বদলে জীবন্ত মানুষ জন্ম দেয় গাছটা।

— "কী এঁকেছিস এটা?" স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করে অনীশ। এইটুকু বয়সের একটা মেয়ের মাথায় এমন কিম্ভুত ভাবনা-চিন্তার উদয় হওয়া সহজ কথা নয়। উত্তর না দিয়ে আবার অনীশের জামায় টান দিল বীণা। সে কথা

বলে বোঝাতে পারবে না। তবে কিছু একটা দেখাতে চায়।

অনীশ আর আপত্তি করল না। এগিয়ে গেল ঘরের দরজার দিকে। প্রথম দিন ইভাকে দেখার পর দম বন্ধ করা রহস্যের ভাবটা আবার ওর মনের ভিতর ফিরে এসেছে।

দোতলা থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় চলে এল বীণা। এখানে বড়ো প্যাসেজটা পেরিয়ে গেলেই বিরাট লাইব্রেরির দরজাটা চোখে পড়ে। দু-জনে কাঠের দরজা ঠেলে তার ভিতরে ঢুকে এল।

মোট দু-টো ঘর নিয়ে লাইব্রেরি। তার তিন দিকের দেওয়াল জুড়ে জানালা। সেখান থেকে আলো ঢুকে ভরিয়ে রেখেছে দেওয়াল ভর্তি বইয়ের তাকগুলো। অনীশ একসঙ্গে এত বই আগে কখনও দেখেনি। নতুন, ঝকঝকে মলাট থেকে শুরু করে আদ্যিকালের একেবারে পুঁথি হয়ে যাওয়া বই অবধি সব আছে এখানে।

জামার নীচের দিকে আবার টান পড়তে চটক ভাঙল অনীশের, একটা বিশেষ তাকের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বীণা। অনীশ সে-দিকে এগিয়ে যেতে তাকটার একেবারের উপরের র‍্যাকে একটা নতুন গোছের মোটা বই দেখিয়ে সেটা নামাতে ইশারা করল বীণা।

র‍্যাকটা অনীশের হাতের নাগালেরও বাইরে। কোনওরকমে ল্যাং বাড়িয়ে নীচে নামিয়ে আনল বইটা। গল্পের বই বলেই মনে হচ্ছে। অনীশ সেটা উলটে-পালটে দেখতে যাচ্ছিল, তার আগেই বীনা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল তার হাত থেকে।

বইটা খুলতেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল অনীশ। উপরের বইটা নকল। একটা পিচবোর্ডের বাক্সের ভিতরে ছোটো একটা ফাঁক। তার ভিতরে অন্য একটা বই রাখা আছে। সেই বইটা একেবারে শতছিন্ন। পাতাগুলো হলদে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। দ্রুত পাতাগুলো উলটে একটা জায়গায় থেমে গেল বীণা। তারপর সেটা তুলে দিল অনীশের হাতে। ইশারায় তাকে পড়তে বলল জায়গাটা।

অনীশ তাকিয়ে দেখল, ভিতরের লেখাগুলো বাংলায়। তবে, সেকেলে

গ্রাতের বাংলোয়। কাছেই একটা টেবিল খুঁজে নিয়ে পড়তে শুরু করল সে। বীণা আঁকার খাতাটা সামনে রেখে একমনে তাকিয়ে রইল।

বৌদ্ধ পুরাণের এক গাছের ব্যাপারে লেখা আছে সেখানে। এই গাছকে ঘিরে জড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য গল্প। পুরাকালে দেবতা ইন্দ্র তার স্ত্রী বেসান্তরার জন্য এক মায়াবি জঙ্গল আর জঙ্গলের লাগোয়া কুটির তৈরি করেন। বেসান্তরা তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই কুটিরে সুখে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু একদিন এক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। বেসান্তরা জঙ্গলে ফল তুলতে গেলে, জঙ্গলে বসবাসকারী কিছু সাধু তাকে আক্রমণ করে। বেসান্তরা কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন। ইন্দ্র বুঝতে পারেন, জঙ্গলের সাধুদের আটকানোর জন্য কিছু ব্যাবস্থা করতে হবে তাঁকে।

ভেবে-চিন্তে ইন্দ্রের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। তিনি যাদুবলে নারিফোন নামে একধরনের অলৌকিক গাছ সৃষ্টি করেন জঙ্গলে। এ গাছের শাখাপ্রশাখা থেকে ফুল-ফলের বদলে জন্মায় মানুষ। সতেরো কিংবা আঠেরো বছর বয়সী কিশোরীর দল। গাছমানুষ। স্বর্গের অপ্সরাদের মতো অপরূপ সৌন্দর্য তাদের।

জন্মানোর পর থেকে গাছেই থাকে তারা। মিহি মন-ভোলানো সুরে গাইতে আর নাচতে পারে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সাধুসন্তদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করাই এদের কাজ।

কিছুদিন পর বেসন্তরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যান। কিন্তু গাছ আর গাছ থেকে জন্মানো মেয়েরা থেকে যায়। তবে কিছু একটা কারণে দেবতারা মন্ত্রবলে ঘুম পাড়িয়ে দেন নারিফোন গাছকে। সেই অলৌকিক গাছ জঙ্গলেরই কোথাও ঘুমন্ত অবস্থায় রয়ে যায়।

বইটার সঙ্গে লাগোয়া নারিফোনের একটা ছবিও দেওয়া আছে। পরের পাতা ওলটাতে গিয়েই থেমে গেল অনীশ। বইটা এই পাতাতেই শেষ। এরপরেও বেশ কিছু পাতা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলো কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে।

মুখ তুলে কিছুক্ষণ থম মেরে থাকে অনীশ। বইয়ে লেখা গাছ-মানুষের বিবরণের সঙ্গে ইভার আশ্চর্য মিল। যদি ইভা গাছ-মানুষ হয়ে থাকে তাহলে এই জঙ্গলেরই কোথাও আছে সেই আশ্চর্য গাছ।

অনীশের বুকের ভিতরে এতক্ষণে একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বইতে শুরু করেছে। মেয়েটা গাছ-মানুষ হলে কার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে? সেই সাধুসন্তদের কেউ? কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে সন্ন্যাসীর দল থাকে বলে তো শোনেনি সে। কে তাড়া করছে তাকে? আর সব থেকে বড় কথা অনীশের সঙ্গে কী দরকার মেয়েটার?

বীণার হাত থেকে আঁকার খাতাটা নিয়ে দ্রুত উলটে দেখতে থাকে অনীশ, আর কিছু চোখে পড়ে না তার, "এই গাছ তুই দেখেছিস?"

মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে অনীশ। বীণা কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তার মুখে ভাষা ফোটে না।

দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ শুনে তাকায় অনীশ। মেসোমশাই এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। হাতে ছোটো শটগানজাতীয় বন্দুক, অনীশের হাতের বইটার দিকে একবার চেয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি, এগিয়ে এসে বললেন, "বাঃ বইপত্রে আগ্রহ আছে দেখছি, বেশ বেশ!"

— "আচ্ছা মেসো, জঙ্গলের সব জায়গা তুমি চেনো?"

— "ধুর পাগল, এত বড় জঙ্গল, তার সব জায়গা চেনা যায় নাকি?"

বইতে দেখা মোটা কান্ডের নারিফোন গাছটার কথা মনে পড়ে যায় অনীশের, মুখ তুলে বলে, "আচ্ছা মেসো, এ জঙ্গলে বড়ো গাছ আছে?"

— "সে কী রে! এ জঙ্গলে ছোটো গাছই তো নেই বরঞ্চ।"

— "না না। ওসব না, যেখানে..." একটা বাকা হাসি খেলে যায় মুখে, বীণার আঁকার খাতাটা দেখিয়ে বলে, কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারে না।

— "এর মধ্যেই তোর মাথাটা খেয়েছে মনে হচ্ছে। ওরকম গাছ এ জঙ্গলে কোথাও একটা আছে শুনেছি। কিন্তু আমি নিজে চোখে দেখিনি, দ্যাখার কথাও নয়।"

— "কেন?"

— "কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় সে গাছ দেখতে আলাদা কিছু নয়। কেবল গুঁড়িটা অন্য গাছের থেকে আকারে একটু বড়ো। কেও গাছকে জাগিয়ে তুললে তখন তার আসল রূপ দেখা যায়।"

— "জাগিয়ে তুলেলে মানে?"

সুজয় হাসে, অনীশের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "এসব জায়গায় ওরকম অনেক ফোকলোর থাকে। তবে লোকে বলে, দেবতারা কোনও গোপন মন্ত্রে সে গাছকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। সেই মন্ত্র আবার যতক্ষণ না উচ্চারণ হচ্ছে ততক্ষণ সে গাছ আর জাগবে না। জঙ্গলের ভিতরে স্বাভাবিক চিরজীবী গাছ হয়েই থেকে যাবে। তাতে ফলও ধরবে না।"

— "আর একবার জেগে গেলে আর ঘুম পাড়ানো যাবে না তাকে?"

— "যাবে, গাছকে মন্ত্র পড়ে যে জাগিয়েছে, সে যদি কোনওভাবে মারা যায়, তাহলে গাছ আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।" নীচু হয়ে শটগানটা অনীশের হাতে তুলে দেয় সুজয়, ফিসফিস করে বলে, "যাবি নাকি একবার নারিফোন খুঁজতে?"

আনন্দের মাঝেও একটা কথা খেয়াল হয় অনীশের। এটুকু সে বুঝতে পারে, এ শহরে বীণা আর সে নিজে ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না ইভাকে। তবে কি বীণাই মন্ত্র পড়ে জাগিয়েছে নারিফোনকে? কিন্তু বীণা সে মন্ত্র জানল কোথা থেকে?

উত্তরটা খেলে যায় অনীশের মাথায়। বইয়ের শেষ ক-টা পাতা ছেঁড়া ছিল, সেখানেই হয়তো লেখা ছিল মন্ত্রটা। বীণা নিজেই নারিফোনকে জাগানোর পরে ছিঁড়ে নিয়েছে পাতা ক-টা। কিন্তু রেখেছে কোথায়?

— "যাব," খুশি হয়ে বলে অনীশ, "বোনও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

— "কী রে, তুই যাবি নাকি?"

বীণা খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর ঠিক আগে, একবার জঙ্গলের দিকে তাকায় অনীশ। আবার সেই পুরোনো অনুভূতিটা ফিরে আসে ওর বুকের ভিতরে। কিন্তু কৌতূহলের বদলে একটা ভয় এসে চেপে ধরে ওকে। যেন আগের চোখ দু-টো নয়, অন্য দু-টো নতুন চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে এবং সে চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব।

(পাঁচ)

বীণার হাতটা ধরে ছিল অনীশ। তবে বীণা মাঝে মাঝেই হাত ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে। অনীশের উপর কড়া নির্দেশ। যাই হয়ে যাক না কেন, সুজয়ের দৃষ্টির বাইরে যেন না যায় ওরা।

অনীশের ভিতরে ভিতরে খানিকটা ভয়ই করছে। মনের ভিতরে কে যেন বলে চলেছে, সবুজ পাতার আড়াল থেকে কেউ একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওদের দিকে। মাঝে মধ্যেই ফিরে তাকাচ্ছে, গাছের মাথা, কান্ডের ফাঁক দিয়ে গিয়ে আটকে যাচ্ছে ওর চোখ। নাঃ, কেউ নেই।

— "এই জঙ্গলের একটা মজা কী জানিস? সারাবছর জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যায়, মানুষের গলার স্বরের মতো। তবে বিকট, ভয়ংকর আওয়াজ। দূর থেকে সে ক্ষীণ আওয়াজ শুনেই লোকের পিলে চমকে যায়।"

— "কারা করে আওয়াজ?" অনীশ জিজ্ঞেস করে। সুজয় হেসে বলে,

— "কারা আর করবে, কোনও গাছের কান্ড হয়ত এমন ভাবে তৈরি হয়েছে, যে হাওয়া দিলে সেখান থেকে ওরকম ভূতুড়ে আওয়াজ ওঠে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল..." সামনে থেকে একটা গাছের ডাল সরাতে সরাতে সুজয় বলে, "শীতকালে ব্যাপারটা পালটে যায়। ডিসেম্বর মাসেও জঙ্গল থেকে একটা আওয়াজ আসে, সেটাও গানের সুরের মতো, কিন্তু মিষ্টি। যেন জঙ্গলের ভিতরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মজলিস বসেছে। তবে গলার আওয়াজটা মেয়েলি। কেন যে হয়!"

— "আর ওই সময়েই লোকে উধাও হয়ে যায় জঙ্গলে ঢুকে?"

একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বীণার হাতটা ধরে সুজয়, তারপর কী যেন ভেবে বলে, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, এ জঙ্গলে প্রায় সারাবছরই দু-একজন করে লোক উধাও হতে থাকে। তবে ওই ডিসেম্বর নাগাদ যারা উধাও হয় তাদের আর বডি পাওয়া যায় না। জঙ্গলের ভিতর থেকে যেন উবে যায় তারা।"

— "আর বাকিদের?"

সুজয় উত্তর দেয় না। তার একটা কারণও আছে অবশ্য। জঙ্গলের ভিতরের দিক থেকে একটা চাপা শব্দ শোনা গেছে। শব্দটা ভারী। কিন্তু পায়ের আওয়াজ নয়, বোঝা যায় সেটা আসছে কোন জীবিত প্রাণীর স্বরযন্ত্র থেকে। ক্ষীণ, তাও যেন একটা অশুভ সংকেত আছে তাতে।

বীণা কান খাড়া করে তাকিয়েছে সেদিকে। শটগান সামনে তুলে ধরে বীণাকে আড়াল করে সেদিকে এগিয়ে যায় সুজয়। অপরিচিত শব্দের তীব্রতা বেড়ে ওঠে। খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

একটা বছর কুড়ির মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ভিতরে। সমস্ত শরীরে সূক্ষ্ম পাতার মতো পোশাক। নাচের ভঙ্গী ছড়িয়ে পড়ছে অঙ্গে অঙ্গে। গুনগুন করে সুরেলা গানটা গাইতে গাইতে নাচছে সে। মেয়েটাকে চিনতে পারল অনীশ — ইভা। তাকে ডাকতে গিয়েও থেমে যায় অনীশ।

হঠাৎ পায়ের শব্দে সুজয়কে দেখতে পেয়ে, গান থামিয়ে তার দিকে অবাক হয়ে চাইল ইভা। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে হাতছানি দিয়ে ডাকল কাছে। অনীশ চেয়ে দেখল সুজয়ের চোখের মণির রঙ বদলে গেছে। এই অপ্সরার ঢলঢলে রূপ আর মায়াময় কণ্ঠের যাদু যেন সম্মোহিত করেছে তাকে। সে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় মেয়েটার দিকে।

অনীশের মন বলে ওঠে, ইভা নিজের মধ্যে নেই। কিছু একটা বদলে গেছে ওর মধ্যে। অশুভ কোনও ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে শরীরের মুর্ছনায়।

— "মেসো যেও না ওদিকে।" চিৎকার করে ওঠে অনীশ। কিন্তু সে শব্দ কানে যায় না সুজয়ের। তার কানে কেবল ধ্বনিত হচ্ছে ওই অপরূপ কিশোরীর মৃত্যুময় সঙ্গীতের আস্‌কারা।

— "মেসো তোমাকে ও..."

কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল সুজয়। একটু যেন চেতনা ফিরেছে তার। পিছন ফিরতে যায় সে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তিলোত্তমা কিশোরীর মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে জিবটা, নিকশ কালো শুঁড়ের মতো একটা জিভ। প্রায় পাঁচ মিটার দূরে ছিটকে বেরিয়ে এসে সুজয়ের গলা বুক ঘাড়ে স্পর্শ

করতে থাকে সেটা। অনীশ ভয়ার্ত চোখে চেয়ে দেখে ইভার চোখ দুটো ঘন হলুদ হয়ে গেছে। তার মসৃণ চামড়া ভেদ করে শরীরে সমস্ত শিরা-উপশিরা বীভৎসভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যেন শিরা নয়, গাছের মোটা শিকড় দিয়ে তৈরি হয়েছে তার শরীর।

সুজয় আরও এগিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে। বীণা ছুটে গিয়ে তার জামার পেছন দিকটা খামচে ধরল। ইভার হলদে চোখ নেমে এল বীণার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের রাইফেলের বাট দিয়ে মেয়ের মাথায় সজোরে একটা বাড়ি মারল সুজয়, "আহ! বিরক্ত করিস না আমাকে। দেখছিস না? ও ডাকছে আমাকে?"

চাপা শব্দ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল বীণা। মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল তার, অনীশের দিকে চেয়েই পিছু হাঁটতে শুরু করেছে সুজয়। তার নিজের চোখেও ঘন হলদে রং ফুটতে শুরু করেছে, ঠোঁটের কোণে চাপা পৈশাচিক হাসি খেলা করছে, অনীশের দিকে চেয়ে সে বলল, "তোরা বাড়ি যা, আমার একটু দেরি হবে।"

পিছোতে গিয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল সুজয়। ইভার গান এতক্ষণে থেমে গিয়েছে। বুকে হেঁটে সুজয়ের দিকে এগিয়ে এল সে। কীসের একটা লোভ চিকচিক করছে তার সমস্ত শরীর জুড়ে। সুজয়ের গলার কাছে এসে একবার তার মুখের উপরে হাত বুলিয়ে নিল।

তারপর সে যা করল তাতে অনীশের বুকের ভিতরের সমস্ত রক্ত গলে জল হয়ে গেল। দু-হাতে নিজের মাথার চুল দু-দিক থেকে চেপে ধরে টানতে লাগল ইভা। সেই টানে তার মাথার দু-দিক থেকে মুখমণ্ডল দু-ফাঁক হয়ে সরে গেল। ঠিক যেন একটা কাপড়ের মুখোশ পরে ছিল সে এতক্ষণ। সেই মুখোশ দু-দিকে খশে পড়ে এখন হিলহিলে সাপের মতো বিকটা আকৃতির একটা মুখ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। দুটো প্রায় অদৃশ্য কিন্তু হলদে চোখ আছে সেখানে। মুখের ভিতর থেকে জিবটা বেরিয়ে এল কিছুটা, ক্রমশ এগিয়ে গেল সুজয়ের মুখের কাছে।

— "ইভা!" চিৎকার করে উঠল অনীশ। প্রাণীটা ফিরেও তাকাল না ওর

দিকে। কিন্তু থেমে গেল জিবটা। আরও একটা শব্দ ভেসে আসছে। অনীশ চেয়ে দেখল মাটিতে পড়ে থাকা বীণার একটা হাত উঠে এসেছে উপরে। কপাল থেকে নামা রক্ত মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে তার। কিন্তু তার মধ্যেও উঠে আসা হাতটা ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করেছে। একটা বিশেষ ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছে বীণার হাতটা। মিষ্টি গানের সুর...

মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে তীব্র হিসহিসে একটা শব্দ করে উঠল প্রাণীটা। তারপর মাটির উপর দিয়ে কালো সর্পিল বিদ্যুৎরেখার মতো হারিয়ে গেল জঙ্গলের ভিতরে।

এতক্ষণ সুজয়ের চোখ খোলাই ছিল। প্রাণীটা মিলিয়ে যেতেই তার চোখে আবার রং ফিরে এল। হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল সে।

— "বীণা!" এক দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে গেল অনীশ। জঙ্গলের একটা গাছের গুড়ির উপরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে মেয়েটা। বুকের স্পন্দন হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

(ছয়)

বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল অনীশ। ঘুম আসছে না কিছুতেই। মাথার ভেতর হাজারও চিন্তা জড়ো হয়ে আসছে। কাল থেকে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে বীণা। ডাক্তার বলেছেন, যে কোনও সময় খারাপ খবরের জন্য তৈরি থাকতে। মাসি, মেসো দু-জনেই হাসপাতালে। এত বড় বাড়িটায় অনীশ একা।

কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে শেষে উলটো হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করতেই মনে হল, ওর ডানদিকের দেয়ালের গায়ে কিছু একটা নড়ে উঠছে। মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করতেই দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠল অনীশ। ইভা। ব্যাপারটা বুঝতে কিন্তু আর ভয় পেল না অনীশ, বরঞ্চ অদম্য রাগে তার কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করে উঠল, "তুই? তোর

জন্য বীণা...”

— “কী করেছি আমি?”

— “তুই মিথ্যেবাদী। এই জঙ্গলে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। তুই মেসোকে ওইভাবে...” ছুটে গিয়ে ইভাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে অনীশ। কিন্তু পারে না। মনে হয় ওর শরীরটা অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে। মেয়েটা চাইলেই অনীশের শরীর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, “উঠিস না এখন। অদ্ভুত একটা রাত আজ তাই না রে?”

ইভার গলা উদাস শোনায়। বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে সে। অনীশ আবার উঠতে যায় বিছানা থেকে। ব্যর্থ হয়।

— “কী চাস তুই? এই মানুষগুলো কী ক্ষতি করেছে তোর?”

ইভা উত্তর দেয় না। তার মায়াময় কণ্ঠ যেন অন্য কোন জগত থেকে ভেসে আসছে, “একদিন বলছিলি মনে আছে, তোর কোনওদিন কোন বন্ধু ছিল না...”

অনীশ আস্ফালনের চেষ্টা করতে থাকে। ইভা বলেই চলে, “আমার ছিল, একটাই বন্ধু। রোজ বিকেল হলে সবাইকে লুকিয়ে আমার কাছে চলে আসত ও। দু-জনে খেলতাম সন্ধে পর্যন্ত। আমার এই পৃথিবীতে ও ছাড়া আর কেউ ছিল না।”

— “আর আজ তোর জন্য সে মরতে বসেছে।”

হুট করেই অনীশের মুখের সামনে চলে আসে সে, “এখন আমার একটা নতুন বন্ধু হয়েছে।”

— “আমি? আমি ঘৃণা করি তোকে।”

আনমনেই একটা গান গেয়ে চলেছে ইভা। সুরটা চেনা লাগে না অনীশের। ইভার একটা আঙুল তার কপাল আর মুখের উপরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যেন মুখের উপরে হাত বুলিয়ে তাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছে। সবজে চোখের মনি জ্বলে উঠছে বারবার। অনীশ অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে।

— “চল্ ঘুরে আসি একটু, জঙ্গল জেগে উঠেছে আজ।”

অনীশের হাত ধরে একটা টান দেয় ইভা। অনীশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়।

— "ছেড়ে দে আমাকে।"

— "তোর খুব জঙ্গল দেখতে ইচ্ছা করে, না রে? চল্, একটা জায়গা দেখিয়ে আনি তোকে।"

হাত ধরে টেনে বারান্দার রেলিং-এর কাছে এনে দাঁড় করায় তাকে ইভা। দমকা হাওয়ার স্রোত ওদের ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে এখন। হঠাৎই হেসে ফেলে অনীশ, একটা ভাবনা মাথায় আসতে মনটা হালকা হয়ে গেছে তার, ইভা অবাক হয়ে তার দিকে চায়।

— "এই তুই হাসছিস কেন?"

— "বীণা ছাড়া কেউ তোকে দেখতে পায়নি। মানে বীণাই নারিফোনকে জাগিয়েছে। এখন বীণা যদি মরে যায় তাহলে তুইও থাকবি না।"

অপ্রত্যাশিত বাঁকা হাসি হাসে ইভা, "তোর কষ্ট হবে না?"

— "কষ্ট! আনন্দ হবে আমার," হো হো করে হেসে ওঠে অনীশ।

— "বেশ, আমারও আজ একটু আনন্দ হোক।" ইভার মুখ লাল হয়ে ওঠে। বড় করে একটা নিশ্বাস নেয় সে। তারপর আচমকাই সজোরে ধাক্কা মারে অনীশের পিঠে। অনীশ টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গ্রিলের ওপারে। ইভার হাতের চাপে বারান্দা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে আসে সে। উপর থেকে ইভার সুরেলা গলা শুনতে পায়, "আজ আমার শেষ আনন্দের দিন"

কানের পাশ দিয়ে শনশন করে হাওয়া বইছে। কিন্তু মুখ থেকে চেষ্টা করে কোনও শব্দ বের করতে পারে না। অনীশ বুঝতে পারে, শরীরটা মাটির দিকে নেমে আসছে। আর কয়েক মিটার নীচে নামলেই... চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।

হাওয়াতেই এক সেকেন্ডের জন্য থেমে যায় অনীশের শরীরটা। পিঠে আবার সেই মোমের মতো হাতটা এসে পড়েছে। মাটি ছেড়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ওর শরীর। ওর ঠিক পাশেই ওর মতোই হাওয়ায় ভেসে

রয়েছে ইভা। তার আঙুলের ডগায় সবজে আলোটা আবার জ্বলতে শুরু করেছে। হাওয়ার উন্মাদ বেগের শব্দ ছাপিয়ে আবার গানের সুর কানে আসে।

অবাক হয়ে যায় অনীশ, "কী চাস তুই?"

মোহময় হাসি ছড়িয়ে পড়ে ইভার মুখে, "বলেছিলাম না একটা জায়গা দেখাব তোকে, বলেছিলাম না আজ একটা সুন্দর মায়াবী রাত?"

এখন আর নীচের দিকে নয়, মাটি থেকে মিটার পঞ্চাশেক উঁচুতে শূন্যে ভাসতে ভাসতে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। ওদের ঘিরে রেখেছে সেই সবজে আলোর আবছা বৃত্ত।

জঙ্গলের মাথার উপর বিরাট গোল চাঁদ উঠেছে আজ। গাছপালার স্রোতের মধ্যে দিয়ে সেদিকেই যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওকে ইভা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই অনীশ দেখল, এক অদ্ভুত নৈসর্গিক দৃশ্য ফুটে উঠেছে ওর পায়ের তলায়। ঘন অন্ধকারে ঢাকা মহীরুহের জঙ্গল যেন লম্বা লম্বা পাতা আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বারবার স্পর্শ করতে চাইছে ওর পা। অন্ধকারের ভিতরেও জঙ্গলের ঢাকা পড়া মাটির উপর থেকে রাশি রাশি জংলি জানোয়ার যেন হাঁ করে উপরে তাকিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

চাঁদের পাশ দিয়ে কয়েকটা বাদুর উড়ে গেল। জঙ্গলের গভীরতম প্রান্ত থেকে অচেনা কোনও প্রাণী আকাশ বিদীর্ণ করে শিস দিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য রোজ রাতের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, আত্মহত্যা, নারিফোন গাছ, মা, বীণার রক্তাক্ত মুখের কথা ভুলে গেল অনীশ। এক অপার্থিব স্বপ্ন যেন কোনও রূপকথার দেশে বয়ে এনেছে ওকে। গুনগুন গানের সুর এখন আরও সুরেলা হয়েছে। মনে হল, এভাবে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ঘুমিয়ে পড়বে।

পাশ ফিরে তাকাতে সে দেখল, ইভা এখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ও অবাক হয়ে সম্মোহিতের মতো জিজ্ঞেস করল, "কী চাস তুই? কী চাস আমার থেকে?"

ইভা বিরক্ত হয়। ওর চোখে চোখ রেখে বলে, "জানিস, সব প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন করে পাওয়া যায় না?"

— "তাহলে?"

দুটো ভাসমান শরীর ধীরে ধীরে একটা জেগে থাকা উঁচু সিডার মাথার ওপরে নেমে আসে। অন্য গাছগুলোকে ছাড়িয়ে এই গাছের ডাল খানিকটা যেন আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়েছে।

একটা মোটা ডালের উপরে বসে পড়ে দু-জনে। এখানে হওয়ার স্রোত কিছুটা কমে গেলেও কনকনে ঠান্ডা অনীশের হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হাওয়ার স্রোতে ইভার চুলগুলো উড়তে শুরু করেছে। সমস্ত শরীর থেকে একটা সবুজ আভা বেরিয়ে আলোর আবছা বৃত্ত রচনা করে রেখেছে ওদের চারপাশে।

গাছের ডালটা শক্ত করে ধরে অনীশ, এখান থেকে পড়ে গেলে বাঁচার আশা নেই। নাকি মেয়েটা বাঁচিয়ে নেবে ওকে?

ইভা গাছের একটা ডালে হেলান দিয়ে বসে। গুনগুন স্বরটা থেমেছে এতক্ষণে, "আমরা এখানে এসে বসতাম একসময়, জানিস? মগডালে। আমি আর... এখান থেকে গোটা জঙ্গল দেখা যায়।"

দূরে বৃক্ষরাজির উপর এসে পড়া জ্যোৎস্নার চাদরের দিকে চেয়ে বলে ইভা,

— "আজও রোজ রাত হলে এখানে এসে বসি আমি, মনে হয় একটু পরেই নীচে খসখস আওয়াজ হবে, ও এসে আমাকে ডাকবে, 'ইভা, ইভা'!"

— "কে?"

অনীশের দিকে চোখ ফিরিয়ে মিষ্টি করে হাসে ইভা, "কেন তুই ডাকবি না? তুই আমার বন্ধু নোস?"

অনীশ কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, থেমে যায়, নীচের দিকে তাকিয়ে বলে,

— "আমার এখনও বিশ্বাস হয় না তুই মেসোকে ওইভাবে..."

— "আজ থেকে দশ দিন আগে আমার মতো কেউ থাকতে পারে বলেই বিশ্বাস হত না তোর।"

— "তুই সত্যি করে বল, জঙ্গলের মধ্যে ওটা তুই ছিলি না? তুই বীণার কোনও ক্ষতি করিসনি?"

ডালের উপরেই কিছুটা সরে আসে ইভা, "করেছি। এই জঙ্গলে যতগুলো মানুষ মারা গিয়েছে, তাদের সবাইকে আমি একা মেরে ফেলেছি।" বড়ো করে নিঃশ্বাস নেয় ইভা, "চিন্তা করিস না, আমি চলে যাব এখান থেকে।"

আর কোনও উত্তর দেয় না অনীশ। সে-ও ডালের একটা দিকে হেলান দিয়ে বসে। চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে নামে তার। থুতনিটা ভিজে যায়। অল্প চাঁদের আলোতেও সেটা দেখতে পায় ইভা, ওর দিকে সরে এসে কাঁধে একটা হাত রাখে, "মায়ের জন্য কষ্ট হয়, তাই না?"

কাধ ঝাঁকায় অনীশ, "মায়ের সুইসাইড নোটটা বাবাকে লেখা ছিল। আমাকে কিছু বলে যায়নি।"

— "কেন? তুই কী শুনতে চাইছিলি?"

— "আমার মা খুব সাহসী ছিল, লড়াই করতে পারত, একা। কোনওদিন কোনও সমস্যাকে ভয় পায়নি। শেষে ঠিক কোন্ কারণে..."

— "লড়াই করতে পারি বলেই কি লড়াই করে যেতে হয় সবসময়? যে লড়াই লড়তে গিয়ে আরও কয়েকটা মানুষের ক্ষতি হয় সেটা করে লাভ কী?"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অনীশ, ইভার উলটোদিকে চেয়ে মুখ আড়াল করে বলে, "সবাই চলে যায় কেন বলত? মা, তুই, বীণা যাদের আমি ভালোবাসি।"

অনীশের থুতনি থেকে জলটা মুছে দেয় ইভা, "মানুষ তো কোথাও যেতে পারে না রে। আমাদের মতো, মানুষকে তো কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় না। আকাশের বুকে ছেঁড়া মেঘের মতো ঘুরে বেড়ায়। তবে হ্যাঁ..."

হাতের চাপে অনীশকে আর একটু কাছে টেনে নেয় ইভা, "মাঝে মাঝে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় বটে, তবে চিহ্ন রেখে যায়। মানুষ চিহ্ন না রেখে কোথাও যেতে পারে না।"

অনীশ কাধ ঝাঁকায়, "ধুর ডাক্তারবাবু বলেছে মায়ের কোনও চিহ্ন আমার আশপাশে না রাখতে।"

অনীশের মুখটা তুলে ধরে ইভা, "তা কী করে হয়? তোর মায়ের সব থেকে বড়ো চিহ্ন তুই নিজে।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকে অনীশ, তারপর ভেজা গলায় বলে, "ধুর, এসব ভালো লাগছে না আমার।"

— "তাহলে?"

আচমকাই সরে এসে ইভার কাঁধে মাথা রাখে অনীশ। প্রথম হকচকিয়ে যায় ইভা। তারপর হেসে ফেলে। চাপাস্বরে বলে, "আচ্ছা শোন্, কাল বেলা ঠিক এগারোটার সময় খুব মন দিয়ে কান পাতলে জঙ্গল থেকে একটা শব্দ শুনতে পাবি। অনেকটা গানের মতো। সেটা খেয়াল করে জঙ্গলের ভিতরে চলে আসবি।"

— "তুই থাকবি তো?" চোখ বন্ধ করেই জিজ্ঞেস করে অনীশ।

— "থাকব, চিন্তা করিস না।"

— "করব না, একটা গান শোনা।"

কয়েক পলক চুপ করে থাকে ইভা। ওদের ঘিরে হাওয়ার চলাচল আগের থেকে কমে এসেছে। জঙ্গলের বুক থেকে ভেসে আসা রাতচরা প্রাণীদের শব্দ এক নৈসর্গিক তান তুলেছে। তাতে গলা মিলিয়েই একটা অচেনা সুরে গান ধরে ইভা।

অদ্ভুত একটা ম্যাজিক ঘটে তাতে। আলো জ্বলে না, হাওয়ার বেগ পালটায় না। কেবল চোখে জলের বাস্প নিয়ে অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে অনীশ।

(সাত)

তীব্র শব্দেই ঘুম ভাঙে অনীশের। তবে জঙ্গল থেকে ভেসে আসা নয়। একতলা থেকে। একরাশ লোক সেখান জড়ো হয়েছে কোনও কারণে। কান্নার শব্দ আসছে। মাসির বিলাপ শুনতে পায় অনীশ।

মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে আসে। সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমেই সে থমকে যায়। একটা সাদা গদির উপরে শুয়ে আছে বীণা। বারবার মেয়ের মৃতদেহের উপরে আছড়ে পড়ছে শর্মিলা। কখনও তেজ হারিয়ে তার শরীরটাও নিথর হয়ে যাচ্ছে।

অনীশকে দেখতে পেয়ে জগদীশ এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল,

— "বীণা তোকে..."

কথাটা শোনে না অনীশ। জগদীশের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে সে চলে গেল অনেকটা দূরে।

— "কোথায় যাচ্ছিস তুই? জঙ্গলের দিকে যাস না,"

কিন্তু ওকে বাধা দেওয়ার কারও কোনও গরজ নেই আর। জগদীশ হাল ছেড়ে দেয়।

সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে অনীশের। বীণা মারা গিয়েছে। মানে ইভাও আর নেই কোথাও। অনীশের মনে হল আর কিছুর পরোয়া করে না ও। আজ যে-ভাবেই হোক ওকে জানতে হবে কেন মরতে হল বীণাকে। কেন ইভা সেদিন জঙ্গলের ভিতরে ওভাবে...

জঙ্গলে পা রাখার আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে অনীশ। একটা গানের সুর। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সেটা লক্ষ করেই জঙ্গলের ভিতরের দিকে ছুটতে থাকে। পিছনে বীণার মৃতদেহকে ঘিরে বিলাপের শব্দ কমে আসছে।

খানিক দূর আসতেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেল অনীশ। ওর সামনেই একটা গাছের গোড়ায় লম্বাটে কিছু পড়ে আছে। মানুষের শরীর কি?

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অনীশ। জিনিসটার কাছাকাছি পৌঁছেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। মানুষ নয়, মানুষের খোলস। একটা কিশোরী মেয়ের দেহের খোলস। সে খোলসটা এতক্ষণ যে পরে ছিল, তার গলা গাছের ফাঁক থেকেই গানের সুরের মতো শোনা যাচ্ছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। জঙ্গলের একটা বিশেষ জায়গায় কয়েকটা গাছের পাতা জমাট বেঁধে কী যেন আড়াল করে রেখেছে। একটা পাতা সরিয়ে সেখানে চোখ রাখতেই তার পা কেঁপে যায়। ওর সামনেই একটা কয়েক গজের উন্মুক্ত জায়গা। তার একদিকের কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই বিকটাকার খয়েরি সাপের মতো স্যাঁতস্যাঁতে একটা প্রাণী। সরীসৃপ হলেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে।

অনীশের পা কেঁপে যাওয়ায় একটা আওয়াজ হয়েছিল। মুহূর্তে প্রাণীটা ফিরে তাকাল ওর দিকে। অনীশ অবাক হয়ে দেখল প্রাণীটার খুদে প্রায় অদৃশ্য

সাপের মতো চোখ দুটো পালটে গেল কিশোরীর মোহময় চোখে। যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভুলে গিয়েছে, মানুষের খোলসটা গায়ে নেই।

পরমুহূর্তে সেটা খেয়াল হতেই তীব্র শিষ-ধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। এক অপার্থিব সুরেলা অথচ ভয়ংকর শব্দ করে প্রাণীটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর চোখের সামনে।

উন্মাদের মতো জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে দৌড়োতে শুরু করল অনীশ। ওর পিছনে সেই ভয়াবহ ডাকটা বেড়ে উঠেছে। মনে হল, একটু একটু করে নিজের মাথার উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাবে ও। সমস্ত চেতনা অন্য কারও দখলে চলে যাবে। জঙ্গলের গাছগুলো আরও বেশি করে ঘেঁষে এল ওর দিকে। মাটির উপরে আছড়ে পড়ল অনীশ। মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল জঙ্গলের মাটিতে।

চোখ তুলে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল, সেই কুৎসিত প্রাণীটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তার অন্ধকার মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ আরও তীব্র হয়েছে, আরও। অনীশ বুঝল, মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ঠিক এই সময়ে একটা ঝোড়ো হাওয়ার দাপট আচমকাই যেন উড়িয়ে নিল অনীশের শরীরটাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে শুনতে পেল, শনশনে হাওয়া ওর কানের পাশ দিয়ে বইছে, সেই সঙ্গে ওই বিকট শব্দটা ঢেকে দিয়ে বেজে চলেছে একটা চেনা গান।

চোখ খুলতেই চেনা মুখ দেখতে পেল অনীশ। ইভার সবুজ চোখের মণিদুটো ওর মুখের উপরে স্থির হয়ে আছে।

— "তুই! কিন্তু তুই তো..."

উত্তর না দিয়ে শূন্যে ভেসে একটা গাছের ভাঁজ হওয়া মোটা ডালের উপরে ওকে শুইয়ে দিল ইভা। সতর্ক চোখে দেখে নিল চারপাশ। নাঃ, বিপদ আপাতত কেটে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "চুপ, কোনও কথা নয়, ওরা আশেপাশেই আছে।"

কথাটা অনীশের কানে যায় না, সে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বলে,

— "কিন্তু বীণা তো মারা গিয়েছে। ও যদি নারিফোনকে জাগিয়ে থাকে তাহলে তুই বেঁচে আছিস কী করে?"

ডালের উপরে বসেই নিজের বুকের কাছটা চেপে ধরে ইভা, সেই জায়গাটা লাল হয়ে আছে, দম নিতে নিতে বলে, "আছি, কারণ বীণা নারিফোনকে জাগায়নি।"

— "তাহলে কে জাগিয়েছিল?"

— "তোর মা। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে।"

উত্তরটা মাথায় ঢুকতে কিছুটা সময় নেয় অনীশের, প্রায় কয়েক মিনিট পরে প্রশ্ন করে সে, "কিন্তু বীণার যদি কোনও ক্ষমতা না থাকে তাহলে ও মেসোমশাইকে বাঁচাল কী করে?"

— "বীণা বাঁচায়নি।" ইভার বুকের যন্ত্রণাটা বেড়ে ওঠে, একটু আগেই অনীশকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণীটা আক্রমণ করেছিল তাকে। গলার স্বর আরও ক্ষীণ হয়ে আসে ইভার, "নিক্ষ যাকে আক্রমণ করে তার মাথার উপরে আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না কারও। ফলে ঘটনার কথা সে কিছু মনেও থাকে না। কিন্তু যে তাকে বাঁচাচ্ছে তার কথা মনে রাখতে পারে। আমি চাইনি আমার কথা তোরা দু-জন ছাড়া কেউ জেনে যাক, তাই গাছের আড়াল থেকে ওর শরীরটা ব্যবহার করেছিলাম আমি।"

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নেয় অনীশ, ইভা যে মানুষের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার প্রমাণ ও আগেও পেয়েছে।

— "মানে সেদিন যে গানটা মেসোকে বাঁচিয়েছিল সেটা তুই গাইছিলিস?" উত্তরের আশা না করে আবার প্রশ্ন করে অনীশ, "কিন্তু মা-ও তো মারা গিয়েছে।"

হঠাৎ করেই তার মুখের কাছে মুখ আনে ইভা, তারপর চাপা ফিসফিসে গলায় বলে, "যা বলছি মন দিয়ে শোন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একটা পুরোনো ডায়েরি খুঁজে পায় তোর মা, সেই ডায়েরির পিছনের পাতায় জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের হদিস আর একটা মন্ত্র লেখা ছিল।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছ খুঁজে বের করে বাচ্চা মেয়েটা। খেলার

ছলে মন্ত্রটা পড়ে গাছটাকে জাগিয়ে তোলে সে। তবে রুমি একটা কথা জানত না— গাছকে একবার জাগিয়ে তুললে প্রতিবছর শীতের সময় একবার করে ফল দেয় সে। সেই ফল মানুষে পরিণত হয় বটে, কিন্তু গাছের বন্ধন ছেড়ে বেরোতে পারে না। তার জন্য দরকার হয় আর একটা জীবিত মানুষের। জঙ্গলের ভিতরে কাঠ কাটতে আসা কাঠুরেদের গান গেয়ে টেনে আনে সে। তারপর কাছে এলে সেই কাঠুরেকে টেনে নিয়ে যায় গাছের কাণ্ডের ভিতরে। কাঠুরে কিন্তু মরে না। তার হৃদপিণ্ড, শরীর জেগে থাকে। সেই জীবন্ত শরীরের প্রাণশক্তিটুকু ব্যবহার করে নিম্ফরা।”

— “নিম্ফ মানে?”

— “আমরা, নারিফোন গাছ থেকে যারা জন্মায়। কিন্তু শুধু গাছের বন্ধন ছেড়ে বেরোলেই হবে না। নিম্ফরা বুঝতে পারে যত বেশি মানুষকে তারা বশ করতে পারবে তত বেশি জীবনশক্তি পাবে। একটার পর একটা মানুষকে বশ করতে শুরু করে ওরা। নরলোভী হিংস্র হয়ে ওঠে। আজ তুই যাকে দেখলি সেও আমার মতোই নিম্ফ, কেবল ওদের ভিতরটাও বদলে গিয়েছে। লোভে হিংস্র হয়ে গেছে ওরা।”

— “তাহলে তুই বদলাসনি কেন?”

ইভা হাসে। গাছের পাতা বেয়ে নেমে আসা একটা জোনাকির উপরে স্থির হয়ে যায় ওর চোখ, “কারণ তোর মা। রুমি। এ পৃথিবীতে চোখ মেলার পর আমি কাউকে চিনতাম না। গোটা জঙ্গলটাকে কেবল ভয় পেতাম। তোর মা ছাড়া আর কোনও বন্ধু ছিল না আমার। আমাকে জঙ্গল চেনায় রুমি। রোজ বিকেলে পায়ে হেঁটে এই গাছটার কাছে চলে আসত। সন্ধে অবধি আমরা দু-জনে খেলা করতাম। তারপর ও বাড়ি ফিরে গেলে আমি সারারাত জঙ্গল থেকে তাকিয়ে থাকতাম ওর ঘরের দিকে, ও মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়াত। আমার আর কোনও বন্ধু ছিল না।”

স্থির দৃষ্টিতে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অনীশ। একটা পুরোনো প্রশ্ন ফুটে ওঠে ওর মাথার ভিতরে, “কিন্তু আমার মা-ও তো মারা গিয়েছে, তাহলে...”

অনীশের দুই কাঁধে দুটো হাত রাখে ইভা, কঠিন গলায় বলে, “তোকে

একটা কাজ করতে হবে। কঠিন, ভীষণ কঠিন কাজ। পারবি তো?"

— "কী?"

ইভা কিছু বলার আগেই দুলে ওঠে গাছটা। আবার সেই চেনা শিষের শব্দ ভেসে আসে কাছ থেকে। গাছের দুলুনিতে দু-জনেই নেমে আসে মাটির উপর। অনীশ অনুভব করে ইভার মোমের মতো হাতটা কোথায় যেন টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। পিছনের বিকট শব্দের থেকে দূরে। কিন্তু যে কোনও দিকে নয়, যেন একটা নির্দিষ্ট দিকে ছুটে চলেছে ওকে নিয়ে। জঙ্গলের বুনো গন্ধ অনীশের মাথায় ভিতরে ঝিমঝিমে ব্যথা ধরিয়ে দেয়। নিজেকে হালকা মনে হয়, কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে ইভা?

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জানে না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল কি? চোখ খুলে অনীশ দেখে ওর ঠিক পাশেই বসে আছে ইভা। বারবার ঠেলা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছে ওকে। খুব ক্ষীণ, তাও অনীশের কানে আসে। ওদের চারদিক থেকে গোল করে ঘিরে সেই শিষের শব্দ এগিয়ে আসছে, ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে নিস্ফরা।

— "ওরা..." আতঙ্কের স্রোত অনীশের পা চেপে ধরে।

— "উঁহু, ভয়ের কিছু নেই। আয়, একটা জিনিস দেখাই।" অনীশের হাত ধরে টান দেয় ইভা।

অনীশ উঠে পড়ে। আর কিছুক্ষণ পরেই ওদের গোল করে ঘিরে ধরবে নিস্ফরা, এদের আটকানোর কোনও উপায় নেই? অনীশ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, নারিফোনকে যেমন জাগানো যায়, তেমন ঘুম পাড়ানো যায় না কোনওভাবে?"

— "যায়।"

— "কীভাবে?"

— "যে মন্ত্রটা পড়ে জাগাতে হয়, সেটা দিয়ে।"

মনে মনে একটা হিসেব করতে চায় অনীশ, কিন্তু মেলে না, "কিন্তু সেই মন্ত্রটা তো হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, মা ডায়েরির শেষ পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলল কেন? ওখানেই তো লেখা ছিল মন্ত্রটা।"

— "রুমি ছেঁড়েনি ওগুলো।"

— "তাহলে?"

— "আমি ছিঁড়েছিলাম।"

— "কিন্তু কেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অনীশ।

নরম হাসি ফোটে ইভার মুখে, "নারিফোন ঘুমিয়ে পড়লে আবার সব নিস্ফরা ঘুমিয়ে পড়বে। সেইসঙ্গে, আমিও।"

সামনের দিকে এগোতে এগোতে বলে ইভা, "রুমিকে আমি কোনওদিন জানতে দিইনি বাকি নিস্ফদের ব্যাপারে। ওর বয়স একটু বাড়তে ও চলে গেল এখান থেকে। এই জেগে থাকার নেশাটাও পেয়ে বসল আমাকে। বলেছিলাম না এতগুলো মানুষের মৃত্যু শুধু..."

ওদের ঘিরে শিষের শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা মোটা কান্ডের লম্বাটে গাছের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ইভা। দুটো হাত মাটির উপরে রেখে, অজ্ঞাত কোনও রীতিতে প্রণাম করে গাছটাকে।

অনীশ তাকিয়ে দেখে সেই সরু গাছের কান্ডটা দু-দিকে খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যেন কান্ডটা দরজার মতো খুলে দিচ্ছে অন্য কোনও জগতের প্রবেশ পথ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনীশ স্তম্ভিত চোখে চেয়ে দেখল ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট গাছের কান্ড। আদিম বিলুপ্ত কোন দৈত্যাকৃতি বৃক্ষ যেন মহাপ্রলয়ের পর মাটি ফুঁড়ে আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীর বুকে। উপরে তাকিয়ে সে দেখল গাছের মাথাটা গিয়ে মিশেছে আকাশের গায়ে। বিস্তৃত ডালপালার গোপন শিরা দিয়ে স্বর্গ থেকেই জীবন-রস শোষণ করে নিচ্ছে সে। একটা মিহি সাদাটে কুয়াশা প্রদক্ষিণ করছে গাছটাকে। গাছের ডালে মাঝে মধ্যে আলোর বিন্দু ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাটি থেকে উঠে গাছের কান্ডের উপর একটা হাত রাখল ইভা। সঙ্গে সঙ্গে কান্ডর একটা দিক পাথরের স্ল্যাবের মতো সরে গিয়ে অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সংকীর্ণ একটা গুহামুখ উন্মুক্ত করে দিল। কুয়াশাটা সেই জায়গাতে কিছুটা ঘন হয়েছে। ভিতর থেক একটা সবুজ আভা বেরিয়ে আসছে।

অনীশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল সেইদিকে। কয়েক-পা হেঁটে কুয়াশাটা পেরিয়ে যেতেই মনে হল, এক অদ্ভুত দৃশ্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

গুহার ভিতরে একরাশ বটের ঝুরির মতো শাখা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে গিয়েছে উপর থেকে নীচ অবধি। সেই ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে একদলা মাংসপিণ্ড। ভালো করে তাকিয়ে অনীশ বুঝতে পারল — মানুষের হৃদপিণ্ড। এই হতভাগ্য মানুষগুলোর শরীর থেকে প্রাণ শোষণ করে নিয়েই বেঁচে থাকে নিম্ফরা। ওই হৃৎপিণ্ডই এদের জীবনীশক্তি।

আর একটু এগিয়ে আসতেই থমকে যায় অনীশ। হাত দিয়ে আবার একটা ইশারা করেছে ইভা। সেই ইশারাতেই ধীরে ধীরে দু-পাশে ফাঁক হয়ে যায় ঝুরিগুলো। গাছের কাণ্ডের একটা ফাঁকা অংশ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে তাতে।

কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে অনীশের। সেই পাথরের মতো ফাঁকা জায়গাটায় কিছু মিশে আছে যেন। খেয়াল করলে বোঝা যায়, একটা আস্ত মানুষের শরীর, শ্যাওলার স্তর এসে গাছের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে মানুষটাকে। শরীরের কয়েকটা জায়গা ক্ষয়ে গিয়েছে যেন মানবদেহটাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে গাছটা। কেবল তার হৃদপিণ্ডটা বারবার নড়ে উঠছে। সে জীবন্ত।

— "রুমি আত্মহত্যা করেনি।" পিছন থেকে ঠান্ডা গলার আওয়াজ শুনতে পায় অনীশ, "তবে ওর একটা রোগ ধরা পরে, মারণরোগ। ওর জীবন আর বেশিদিনের ছিল না, সেটা বুঝতে পেরেই আবার নারিফোনের কাছে ফিরে আসে ও।"

— "কিন্তু কেন?" পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করে অনীশ।

— "রুমি জানতো, নিজের ছেলের কাছে সারাজীবন থাকতে পারবে না। কিন্তু ছোটোবেলার সেই ফেলে যাওয়া বন্ধুটাকে তো বাঁচাতে পারবে, তারও আর কোথাও কেউ নেই। এত বছর একা এই গহীন জঙ্গলের মধ্যে নারিফোনের শরীরে মিশে থাকলে রোগ ওর শরীরকে ক্ষয় করতে পারবে না, আমিও বেঁচে থাকব বহুকাল।"

— "মা!" অনীশের মুখ দিয়ে অন্য কোনও শব্দ বেরোয় না। সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে অর্ধেক উদ্ভিদে পরিণত হওয়া মানুষটার মৃত মুখের দিকে। সেই স্বপ্নটা, অবিকল সেই স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে মুখটা। তবে আর সেটাকে ভয় লাগছে না অনীশের।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। পিছন থেকে একটা হাত পিঠে এসে পড়ায় হুশ ফেরে অনীশের, কোমর থেকে বের করে ছুরিটা ওর দিকে এগিয়ে দেয় ইভা, "তুই জানিস কী করতে হবে।"

পিছিয়ে আসে অনীশ, "কিন্তু আমি মাকে..."

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে প্রাণীগুলো। শিষের শব্দে ভরে উঠেছে জঙ্গলের চারপাশ।

— "সময় নেই, তাড়াতাড়ি কর।"

— "কিন্তু মায়ের মতো তুইও হারিয়ে যাবি তাহলে। তুই তো সাহসী, তুই লড়াই করতে পারিস। আমার মতো দুর্বল নোস। তুই..." অনীশের গলার স্বরে বাষ্প মিশে গেছে।

এগিয়ে এসে সজোরে তাকে জড়িয়ে ধরে ইভা, "লড়াই করতে পারি বলেই কি লড়াই করতে হয় সবসময়? আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি রে, এতগুলো মৃত্যুর দায় বইতে বইতে, এতগুলো বছর ধরে লড়াই করতে করতে, আমার ঘুম দরকার এখন। ভীষণ লম্বা একটা ঘুম।"

— "আর ফিরে আসবি না কোনওদিন?" ছলছলে চোখে ইভার দিকে তাকায় অনীশ। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৈত্যাকৃতি সাপের দল এসে পড়বে ওদের উপরে।

— "আসব, আবার কয়েক লক্ষ বছর পর মন্ত্রটা কারও হাতে পড়লে সবার আগে আমিই জেগে উঠব।"

— "কিন্তু ততদিন তো আমি থাকব না।"

— "মানুষ কোথাও চলে যায় না অনীশ। ওই ক্ষমতা মানুষের নেই।"

আচমকা কুয়াশা ভেদ করে আসা কালচে ফনার ছোবলে ছিটকে পড়ে ইভা। একটা সাপ ছিটকে এগিয়ে আসে অনীশের দিকে, কিন্তু ছোবল মারার আগেই ধাক্কা লাগে তার মুখে। ইভা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর গায়ের উপর। চোখের উপরে আঘাত করে চলেছে ক্রমাগত। মুখ থেকে চাপা চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

অনীশ বুঝতে পারে, ইভা নিস্ফদের মনোযোগ নিজের দিকে টেনে আনতে চাইছে। আর বেশি সময় নেই। সাপগুলো মাটির উপরে আছড়ে ফেলেছে

ইভাকে। পরপর ছোবল পড়তে শুরু করেছে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরের উপরে। তা-ও মুখ থেকে হুংকার বেরিয়ে আসছে তার। সে চিৎকারের তীব্রতা কমে আসছে প্রতি ছোবলের সঙ্গে। তার মৃতপ্রায় মুখের দিকে শেষ একবার চেয়ে নেয় অনীশ।

আর দেরি করে না। শিষের শব্দ তার সমস্ত চেতনাকে ঢেকে ফেলেছিল এতক্ষণ। ইভার শেষ চিৎকারটা ওর হুশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েকটা প্রাণী এগিয়ে আসে ওর দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফনা পিছিয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হয়।

শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে কয়েক-পা দৌড়ে আসে অনীশ। তারপর জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছুরিটা আমূলে বসিয়ে দেয়। একটা ধাতব তরঙ্গ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিশালাকার ধারণ করে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গল জুড়ে, তীব্র শিষের আর্তনাদ।

ছিটকে মাটিতে এসে পড়েছিল অনীশ। চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু কানে জঙ্গলের পাখির ডাক, আর হাওয়ার শন্‌শন্ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ আসে না।

জঙ্গলের নরম মাটির উপরেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সে। অর্ধনিমিলিত চোখে চেয়ে দেখে আকাশের বুকে সাদা মেঘের দল ঝুলে রয়েছে। সেগুলোকে মাথার বালিশ করেই যেন দাঁড়িয়ে আছে একঝাক সরু সরু পপলার আর পাইন গাছের সারি। ওর চারপাশটা খাঁ খাঁ করছে।

অনীশের শরীর ঝিমিয়ে আসে, জ্ঞান হারায় সে।

(আট)

এরপর দিন সাতেক কেটে গিয়েছে। বীণা কথা বলতে পারত না। এ বাড়ির কোথাও বাচ্চা মেয়েটার গলার আওয়াজ শোনা যেত না। আজও শোনা যায় না। তাও কী যেন একটা পালটে গিয়েছে এ বাড়ির পরিবেশে।

শর্মিলা এখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়।

রোজ দু-বেলা ডাক্তার এসে দেখে যায় তাকে।

অনীশ ঘর থেকে বেরোয় না। জঙ্গলের প্রতি আর বিশেষ টান নেই তার। কেবল রাতের দিকটা রোজ বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে বসে থাকে সে। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ বিকেলের দিকে ঘরের দরজায় পায়ের আওয়াজ শুনে ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল সে। জগদীশ এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। বীণার মৃত্যুর পর থেকে অনীশের সঙ্গে ভালো করে কথা হয়নি জগদীশের।

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে অনীশের দিকে এগিয়ে আসে জগদীশ,

— "কেমন আছিস এখন?"

— "ভালো?" মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয় অনীশ।

বিছানায় তার পাশে এসে বসে পড়ে জগদীশ। নরম গলায় বলে, "এভাবে একা একা থাকলে কি ঠিক হবে কিছু? মেসো-মাসির এমনিতেই এই অবস্থা তার উপরে তুই যদি এরকম একঘরে হয়ে থাকিস..."

— "ঠিক হয়ে যাবে।" প্রসঙ্গটা পালটাতে চায় অনীশ, "আমি পরে কথা বলব এখন ভালো লাগছে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগদীশ, "আচ্ছা বেশ, ভালো কথা। সেদিন তোকে বলতে যাচ্ছিলাম, তুই তো জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেলি। বীণা তোর জন্য একটা জিনিস দিয়ে গিয়েছে আমাকে।"

কথাটা বলে পকেট থেকে চৌকো মতো কিছু বের করে আনে জগদীশ, তারপর বলে, "ওর পেনসিল-বক্স। ও তোকে আঁকা শিখিয়েছিল। তাই তোকে দিয়ে গিয়েছে এটা।"

মোমরঙের ছোপ লাগা পেনসিল-বক্সটা অনীশের সামনে রেখে উঠে পড়ে জগদীশ। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাক্সটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ডুকরে কেঁদে ফেলে অনীশ। দু-হাতে আঁকড়ে ধরে জিনিসটা। কয়েকবার হাত বোলায় তার উপরে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতেই খুলে ফেলে ডালাটা। সেই সবুজ স্ট্রাইকারটা রাখা আছে তার ভিতরে। মায়ের শেষ চিহ্ন অনীশকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে

বীণা। অনীশ বাক্সটা সজোরে ছুঁড়ে মারে উলটো দিকের দেওয়ালে।

মাটিতে পড়ে বাক্সের ডালাটা খুলে যায়। সেদিকে একবার চেয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে থেমে যায় অনীশ। বাক্সের ভিতরে রং-পেনসিল ছাড়াও কিছু একটা আছে। কয়েকটা পুরোনো কাগজ।

দ্রুত বিছানা থেকে উঠে গিয়ে কাগজগুলো হাতে তুলে নেয় অনীশ। অজান্তেই তার চোখ থেকে জলের বিন্দুগুলো মিলিয়ে আসতে থাকে।

(নয়)

জঙ্গলের একটা লম্বাটে গাছের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছে একটা বছর সতেরোর ছেলে। হাঁটুর ফাঁকে পড়ে আছে কয়েকটা হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ। মাঝে মাঝে সেটা দেখেই বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে।

হাওয়ার বেগ থমকে আছে জঙ্গলের এই জায়গাটায়। গাছের পাতাগুলো স্থির। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ঘিরে রেখেছে চতুর্দিক। সন্ধে হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তাও পোকা-মাকড়ের ঐকতান শোনা যাচ্ছে না এখনও।

একসময় বিড়বিড় থামিয়ে সামনে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। ওর সামনের লম্বাটে গাছটার শরীর এতক্ষণে পালটে গিয়েছে। অন্ধকারের ভিতরে গাছের কান্ডের দিক থেকে সড়সড় শব্দ ভেসে এসেছে। দুটো হলদে চোখ জেগে উঠেছে সেই অন্ধকারের ভিতর।

আর একটা গান, একটা মিষ্টি সুরের গান।

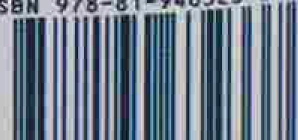
"Faithless is he that says farewell when the road darkens."
– J.R.R. Tolkien (The Fellowship of the Ring)



'বাংলা সাহিত্যের কিছু রোমাঞ্চকর গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স...' — এই লাইনটার সাথে পরিচিত নন এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। রোববার দুপুরে কব্জি ডুবিয়ে খাসির মাংস আর বিছানায় আয়েশে আধশোয়া হয়ে সানডে সাসপেন্স শোনা— এই হল অধিকাংশ সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির আল্টিমেট বিলাসিতা। সেই সানডে সাসপেন্স-এ প্রকাশিত সায়ক আমানের লেখা আটটি গল্প এবং একটি নভেলা বন্দি রয়েছে এই দুই মলাটের মাঝে। এই বই কখনও আপনাকে নিয়ে যাবে কোনও অচেনা হাইওয়ের ধারে গা ছমছমে আলো আঁধারিতে, কখনও বা আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে মায়াবী 'কুয়ো'র অতল গভীরে। কখনও 'উইন্ডচাইম'-এর টুং টাং আওয়াজে আপনার বুকের ভিতর অনুভব করবেন মৃদু কম্পন, আবার কখনও হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দেবে কোনও ভয়াল 'সুর'। আর সবশেষে থাকবে একটি নভেলা। বাংলায় লেখা প্রথম হার্ডকোর ফ্যান্টাসি থ্রিলার। সেই ফ্যান্টাসির মায়ায় বুঁদ হয়ে কখন যে আপনার অবচেতন মন ভেসে যাবে সেই গহীন অরণ্যের আবছায়ায়, তা যতক্ষণে উপলব্ধি করবেন ততক্ষণে দেখবেন বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। অলৌকিক, রহস্য, থ্রিলার, ফ্যান্টাসি, ভয় সবের মিশেলে এই বই নিজেই এক স্বতন্ত্র জগৎ। আসুন তাহলে ডুব দিই সেই মায়াবী জগতের গহীনে।



BIVA
CLASSICS


ISBN 978-81-946323-3-7